মায়ের মূর্তি

মহাশ্বেতা দেবী

সমকাল প্রকাশনী
৮/২ ব গোয়ালটুলি লেন
। কলকাতা-১৩।

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর : ১৯৬২
অগ্রহায়ণ : ১৩৬৯

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়াবাগান লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
মা শীতলা প্রেস
৭০, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী রোড,
কলকাতা—৭০০০০৬

সূচীপত্র

আমার মা

ধরিত্রী দেবীকে

মায়ের মূর্তি

এক

সকালটাই ছিল অন্যরকম। জগাই মণ্ডলের রাতগুলি মাঝে মাঝে, কিছুকাল বাদে বাদে কৌশল্যা নিয়ে নেয়। কৌশল্যা ওর মা। কয়েক বছর বাদে বাদে জগাই মণ্ডলের মাথার ভেতর সব আউরি-বাউরি হয়ে যেতে থাকে। মাঝে মাঝেই আসে এমন সময়। সেই আউরিবাউরি ঘুরঘূর্ণীর সময়ে জগাইয়ের রাতগুলি কৌশল্যা নিয়ে নেয়। এক সময়ে দিন থেকে রাত, রাত থেকে দিন সব নিয়ে নিত মা। তারপর নিয়েছিল প্রত্যেকটি রাত। এখন নেয় কয়েক বছর বাদে বাদে রাতগুলি। কৌশল্যা এক ভয়ংকর একচেটিয়া মালিকানার জোতদার। ছেলে জগাইয়ের মনের জমিনের দখল সে তেত্রিশ বছরেও ছেড়ে যায়নি। তেত্রিশ বছর আগে স্বাধীনতার বছরেই মা মরে যায়। জগাইয়ের ঘোর সন্দেহ মা মরেনি। তেত্রিশ বছর আগেই মা জীবন-মৃত্যুর বেড়াটেড়া টপকে ঝাঁপ দিয়ে এই আবাদে-ধানে-জগাইয়ের জীবনে মিশেটিশে একাক্কার হয়ে যায়। নইলে রাতে কেন মাকে সে দেখে জাজ্বল্যমান?

ছেলে বলে, ও সব সপন, বুঝলে?

সপন।

নয়তো কি?

তারপর বলে, আমি আর ঠাগমার বেত্তান্ত শুনতি পারিনি? কৌশল্যার নাতি, কৌশল্যার ছেলে ওঃ। আমরা ঝ্যানো অক্কেমাংসে মনিষ্যা নি ঝ্যানো চিড়িয়াখানার জন্তু। ঝার যকোন মনে হবে, এগবার এসি দাঁইড়ে গলায় চিনি ঢেলি জিগ্যেস করবে, কৌশল্যার ছেলে? কৌশল্যার নাতি? মিঠেকতায় মেরে দে চলে ঝাবে আর

আমরা ঝ্যা... ...মন আমড়াআঁটি চুষতেছি, তেমন চুষতে থাকব। ওঃ, উনি ঠাগমারে দেকতে...চ্ছ।

সত্যি রে, স্পষ্ট তোর ঠাগমা।

তবে পিসি দেকে না, কাকা দেকে না কেন? তাদেরও তো মা হত তিনি, না কি বল?

জগাই ধীরে বলে, ই কেন বেবুঝ কতা হয়ে ঝায় রে লখা। পিসি তকোন এতটনি, আর কাকা তো ছয় বছ্‌রে। ওরা ঝেত তার সাতে? থাকতো তোর মেজকা, সে নিঘঘাত বলে দিত। মরে গেল ঝে!

তাতে তুমি দেক?

হ্যাঁ রে, স্পষ্ট।

কি দেক?

এত সব দোকানপাট নি, কিচচু নি, মায়ের পেট অক্তে ঝোঝাতেছে, গুলি লেগেচে তো, আর সঙিন দে পেট চিরি দেছে, মা এক হাতে পেট চেপে আর হাতে কাস্তে নে ছুটে আসতেছে ঝ্যামন। চরাচর স—ব ঝ্যানো আঁধারে ঢাকা মায়ের অক্তমাখা চুল উড়তেছে কি। মা বলতেছে, নে গেল, নে গেল, জগাই রে— সব নে গেল।

উটি লিজাস কতা। সব নে গেল।

জগাই এখন দেখতে পায় চরাচরব্যাপী গাঢ় অন্ধকারে সুন্দরবনের ও কাকদ্বীপের সকল গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র দস্যুর হাত থেকে বাঁচাতে কৌশল্যার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি, আকাশ ঢাকা তার রক্তমাখা এলো চুল, এক হাতে রক্তাক্ত ও বুলেট-বেয়নেটে দীর্ণ পূর্ণগর্ভ চেপে অন্য হাতে কাস্তে তুলে মায়ের ছুটে আসা। শুকনো গলায় বলে, জয়চাঁদ কমরেডরে নে যাচ্ছিল গুর্খা মেলেটারি। জয়চাঁদ বলিছিল, মরি বাঁচি কৌশল্যা বুন, লাশ দিওনি দুশমনেরে। তাতেই—

ছাই বুজোচো। তা বলেনি ঠাগমা। তিনি বীর ছিল, স্পষ্ট দেকিছিল ঠাকুন্দা আর তোমারে তিন বিঘে নাবাল থে উচ্ছেদ করবে সাঁপুইবাবুরা, বর্গা করে মরবে, নাম রেকর্ড করবে না কেউ, মজুর খাটতি নেবে না। তাতেই তিনি বলে, সব নে গেল, সব নে গেল।

জয়চাঁদ দাসের তরে বলবে কেন ? জয়চাঁদনগর হয়েনে ? তার নাম জাজ্যোলো করে নে ? ঠাগমার নাম নে খালি ঢ্যামনাপন। আর মাজাকি।

কি বললি ?

মাজাকি।

উ কি ?

আমাদের লবজো। ঠাগমার নাম নে মাজাকি করে মোল সব। ঠাগমার ছেলে ঝে রূপোসে মরে, তারে এক বিঘে জমি দে থিতু করেচে কেউ ? কেউ এট্টা চাগবি দেয় আমাকে ? সব শালা চেনা আচে।

লখিন্দর এ সব কথা বললে জগাইয়ের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। বউ এ সময়ে সাঁপুইদের বাড়ী ধানপাট করে ফিরে আসে আগুন হয়ে। বলে, ভিকিরি পেয়েচ, ভিকিরি! খামার নিকোবো, পাট করব, তুমি হিসেবের কড়ি আটাশ দেবে, আধ কাঠা চাল। তাতে বলে, জ্যামাই এয়েচে, মাচ কুটে বেচে দে ঝা, মাচের তেল পোটাগুনো নে ঝাস। আমি বন্নু, নথা আচে, নথার বাপ আচে, গাং রইতে মাচের ক্যাঙাল নথার মা নয়কো। জ্যামাইটা ঢাকামুখো, তাকে মেয়েটা ঢলানি করে আমারে দেকাচ্চে, দেক দেক, তেভাগার কৌশল্যার বেটার বউকে দেক।

মা, তুই কি বললি ?

আমি বন্নু, হ্যাঁ, চোক মেলি দেকে নাও গো। কৌশল্যার নাম নে তো কম কেত্তন গাও না, তা দেক, ঝাণ্ডা পার্টি হয়ে গদী বাইগে পঞ্চায়েত বাইগে শহীদ কৌশল্যার বউরে কত সুকে রেকেছে তোমার শউড়-শাউড়ি। সত্যি, ক্ষ্যামতা থাকলি মানুষের মুকে ঝ্যাটা মেরে অন্য কোতা ঝেতাম। ধানজুড়িতে থাকতাম না।

এ পর্যন্তও সব ভাল থাকে। তারপরেই বউ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, বলি, বসে বসে শুনচো ঝে ? অমের্তর জোগাড়ে ঝাবেনে ?

'অমের্তো' বা অমৃতটি হল মাইলো গুঁড়োর জাউ, স্যাকারিন সহযোগে। বহু প্রকল্প ভোটযুদ্ধ, ব্যাঘ্র প্রকল্প, চোরাচালানী কারবার।

জোত ও ভেড়ি মালিকের সুখস্বর্গ, বামফ্রন্টের জোরদার ঘাঁটি সুন্দর বনে যদি বেকার লোক থাকে চোদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশো তেত্রিশ, খেতমজুর থাকে দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুশো ছাপ্পান্ন, মোট চাষ জমি হয় সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আটশো একাত্তর একর— তা হলে মানুষ চাল ও তরকারি কিনতে পারবে না, জানা কথা। চাল চালান দেয় সেই জমিমালিক, যার অনেক আছে, অনেক থাকে। তাই জগাইদের ভরসা মাইলোর গুড়ো, ভুট্টার ছাতু, আটা। খানিক কেনো, অসাগর জলে সিদ্ধ কর। স্যাকারিনের বড়ি ফেলে দিয়ে তাকে মিঠা করে অমের্তো খাও।

অমের্তোর জোগাড়ে যায় জগাই। বাজারও সাঁপুইবাবুদের। তেত্রিশ বছরে বাবুদের রমরমা বেড়েছে বই কমেনি। মেজ ছেলে ললিতকে দিয়ে অমের্তোর জোগাড় পাঠিয়ে দিয়ে জগাই যায় সুবলসখার বাড়ি। সুবলসখার বয়স, তা চৌষট্টি হবে। ১৯৪৭ সালে ধানজুড়িতে পুলিশ-মিলিটারির দুই পথপ্রদর্শক, সাঁপুইদের কাছারির নায়েক ভক্তচরণ আর কংগ্রেসের কণ্ঠিপরা নেতা অভয়কে যারা মারে ও লাশ নদীতে ফেলে, তাদের মধ্যে যে সুবলসখা এক পাণ্ডা ছিল, তা আর আজকে বোঝার উপায় নেই। কাজ পেলে খাটে, না পেলে হাটেগঞ্জে গিয়ে মোটমাটরা বয়। সুবলের ছেলে প্রথমে হোমগার্ড, পরে পুলিশ হয়েছে।

সুবল ছেলের অন্ন খায় না, ছেলের মুখ দেখে না। বলে, চেরকাল ঝানলাম পুলিশ আমার শত্তুর, স্বচক্ষে দেকলাম পুলিশ আমার শত্তুর। পুলিশের কোঁৎকা খেয়ে পাঁজরা ভেঙে হাসপাতালে ঝেয়ে মরলাম, জেলের ভাত খেলাম! তুই ঝেয়ে সেই পুলিস হলি!

সুবলসখা খুবই বেগড়বেঁয়ে লোক। ছেলের বিশ্বাস, বাপ তাকে অপদস্থ করার জন্যেই আছে। সে যদি বলে, এত সব তো আমি পুলিসের এসানে পাচ্চি। তা নেবে না কেন?

সুবল বলে, তুই ঝেয়ে পুলিস হলি কেন? জগাই হইছিল? কবির মল্লিক হইছিল?

সে যদি বলে, অসুকের সকল খরচা তো গবরমেণ্ট দেবে। তা

নেবে না কেন?

সুবল বলে, পুলিসের অন্ন বল, ওষুধ বল, কিছু নেব না। তুমি শুয়োর বেটা ঝেয়ে পুলিশ হলে কেন?

নিজের ছেলেকেই সে 'শুয়োর বেটা' বলে। তার রাগের কারণ হল, প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পর, সে তেরো বছর আগেকার কথা—পুরনো মানুষ বিষ্ণুবাবু, সজনী রায়, সবাই মিলে মন্ত্রী-টন্ত্রী নিয়ে এসেছিল ধানজুড়ি। সে কত আমড়াগাছি তাদের। কি সুবল, কেমন আছ কমরেড? যোগীন কোথায়? শহীদ কৌশল্যার বর? আহা আহা, মরে গেল? সুখের দিনটা এল, কংগ্রেসের দুঃশাসনটা ঘুচালাম আমরা—থুড়ি, ঘুচালে তোমরা। দেখার জন্যে রইল না যোগীন!

তখন কণ্ঠস্বরে প্রচুর তিক্ততা, বেদনা ও ক্রোধ ঢেলে দিয়ে সুবল বলেছিল। ই কি বললেন বাবু? বিশ বচর হয় কৌশল্যা বোঠান্ মবল, তা বিশ বচরে গোড়ার দিকে সজনীবাবু, বিষ্টুবাবু আসতে যেতে, খোঁজপাট আকতে। একন কতকাল ঝায় দু চক্ষু মিলে দেকনি আমরা আচি কি নি। কিসের তেভাগা, আমরা যে সব্বস্য খুইয়ে ভিকিরি সে খবর আকো। যোগেন কি একদিনে মরেচে? দিনে দিনে জমি গেল, সব্বস্ব গাপ করলে উই সাঁপুই। তা বাদে হা কৌশল্যা, জো কৌশল্যা, করতে করতে কলকেতার হাসপাতালে—আপনাদের রবরবা হয়েচে আপনারা দেকো।

সজনী ও বিষ্ণু ফুলকোঁচা ও পাঞ্জাবী বাঁচিয়ে সুবলকে থাবড়ে থাবড়ে কামারাদোরি ফিরাবার চেষ্টা করে। তখনি সুবল বলেছিল, ঝে সাঁপুয়ের বাপ পুলিশ-মেলেটারি আনল এত কীর্তি করল, তার বেটা আপনাদের আপনজন হয়েচে ঝে কালে, সে কালে সুবলকে আর পাচা থাবড়ে কি হবে বাবু?

না না, সব হবে সুবল। এ অঞ্চল তেভাগার অঞ্চল, এ অঞ্চল কৌশল্যা, রাইমণি দুর্গামণি, শত শহীদের রক্তে রাঙা। তোমরা সেদিনের সংগ্রামী সৈনিক—তোমাদের সকল দুঃখের প্রতিবিধান হবে। এই যে! শহীদ বটুক পালের ছেলে রাখাল পাল স্থানীয় নেতা—এ তোমাদের সকল অভিযোগ শুনবে।

তা তকন তো তোমরাও ছিলে, নয় ? সাঁপুইবাবু পালাল, একে একে সবাই, ঝত জোতদার মহাজন পালাল, তেভাগাটা হইছিল কি ঝন্যে বলতে পারো ? তখন ঝেয়ে সবাই জমির দকল নিলাম, সবাই জমি পেল, সবাই জমি নেবে। কিন্তক বাবুরা—

'বাবু বাবু' বলবে সুবল ?

তোমাদের এক জোড়া জুতোর দামে আমার এক মাস কেন বুঝি দু মাস ঝাবে, তা 'বাবু' সেজি আসতি পার, 'বাবু' শুনতি মন্দ নাগে ? আমাদের মুকে 'বাবু'ই শুনবে গো, সাঁপুইবাবুর মুকে কমরেট শুনো একন।

জনসম্পর্ক স্থাপনার দিক থেকে ব্যাপারটি খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সজনীবাবু তাই বলে, না না, তোমাদের হিত বিধান করে তবে অন্য কথা। জমি, চাকরি—

জগাই বলেছিল, জমি কেমন করে দেবে গো বাবু। উই যে নাগর। জুতো নাচাতেছে উই সাঁপুইবাবু ঝে তোমাদের ফরেণ্টের নোক গো। উনি সকলার জমি খেয়ে বসি আচে কংগ্রেসের ডাণ্ডা হেই ঘুরায়, ঝাণ্ডা হেই ঘুরায়। পুলিশ মেলেটারী ঢোকাল ঝে অভয় আর ভক্তচরণ, তাদের পরিবারকে কত জমি দিল কংগ্রেস। তোমরা না কি তাদের ভাস্তা নাতিরে চাগরি দিয়েচো।

কে, কে তুমি ?

সুবল খিকখিক করে হেসেছিল, দাও বাবুরা দু ঘা জুতো মারো ওরে। কৌশল্যার নাম নে ভোট কিনতেচ, তার ছেলে জগাইরে জুতো মারো দু ঘা। শিক্ষে হোক বেটার। অমনি আমারেও মারো দু ঘা। শিক্ষে হয়নে ওই হতভাগার আর আমার। আমি আর ও ভেবে ভেবে মরি। তকোন কংগ্রেসের সাতে লড়াই করালে ঝারা, তারা নিচ্চয় আবার আসবে। তকোন ঝার ঝার জমি ছিল, একোন তো সব— ব পতের ভিকিরি বললে হয়। একটা সাঁপুইয়ের ঠেঙে বিশ বচরে হাজার সাঁপই গজিয়েচে। ঝ্যামন ধান আজ্জায়, যেমন হাজার সাঁপুই গজিয়েচে। আজ্জায়, তেমন সাঁপুইয়ের চাষ একন। তা এমন দুক্কো বাড়তেচে, মানুষ মরে ঝায়। লাল ঝাণ্ডা পাট্টি গেল কোতা ?

লড়াই করাবে কে? মারো জুতো।

না না, সব হবে।

হবে না কেন? হবে আমরা চিলু সই হলে।

সজনীবাবু এবং বিষ্ণুবাবু এখন কম্যুনিস্ট পার্টির দুই শরিকের লোক এবং দুজনে আযৌবন কামারাদোরি শিকেয় তুলে পার্টি নীতি হিসেবে দুজনকে গাল পাড়ে। সুবলের গা-জ্বালানো কথাগুলি কিন্তু তাদের এ সময়ে মিলিয়ে দিয়েছিল। দুজনেই বলেছিল, যদি না হয়, দেখো।

আমাদের কাঁধে চেপে কাজ হাসিল করে বাবু! একোন ঝেয়ে শক্রুররে কমরেড বলতেচ। কৌশল্যা-রাইমণি একোন ভোট ভাঙাবার কৌশল, অ্যাঁ? আর তকোন গান কত,

ও মা কৌশল্যা তুই আমাদের প্রাণ
তোর অক্তে বোনা ধান
আর দিব না আর দিব না
দেহে অইতে জান—

আর বিষ্ণুবাবু ঝকোন কৃষক ফরণ্ট করে। তকোন বোঠানের নামে একটা গেট বেঁধে দেয়। জগাই বেটা সাঁপুয়ের লাথ খায়।

সমবেত জনতা বলে উঠেছিল, জমি দাও, জায়গা দাও! নইলে গদী ছেড়ে দাও!

দুই কমরেড তখন পরিস্থিতি বাঁচাতে ঝটপট বলে, তোমাদের আছে সংগ্রামী ঐতিহ্য। এই যে তোমরা সব কথা স্পষ্ট বললে, এই যে দাবী জানালে, তাতেই জানলাম তোমরা আমাদের আজও আপনজন ভাবো। তাই এই সত্যভাষণ! তাই এই তিরস্কার!

সুবল বলেছিল, এও এক ঢং। তোরা ভ্যাড়ভ্যাড়নি শুনগে ঝা, আমি চললুম। আয় জগাই, চলে আয়। তুই ছিলি বোঠানের সাতে, তাকে কাঁদ দিলুম আমি, এদের ছেনাল শুনতে পারিনি। ভোট নেবার আগে রুদয় হয়, ভোট নে বুস্ত ঝায়। এ এক নতুন চাঁদের নীলে খেলা।

সুবলের পেছন পেছন জনতাও ছুটে পড়ে। ফলে দুই মন্ত্রী

পড়ে বিপাকে এবং মন্ত্রী হবার পর প্রাচীন সংগ্রামের পৃষ্ঠভূমিতে মুখ দেখাবার, ঝাণ্ডা উড়াবার, পার্টির খুঁটি জোরদার করবার ইচ্ছার জন্য নিজেদেব গাল পাড়ে। লড়াকু লোকগুলি এ রকম নচ্ছার হয়ে গেছে দেখে মনে ব্যথা পায়।

দুজনেই সাঁপুয়ের বাড়িতে ডায়নামো চালিত আলো, লুচি, মাংস ও চা ইত্যাদির পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসে স্বস্তি পায় এবং দুজনেই সাঁপুইকে নিয়ে পড়ে। সেদিন অবধি ছিলে কংগ্রেসী চাই, জেনেশুনেই ফ্রণ্টে নিয়েছি। কিন্তু এ তুমি করেছ কি ; সকলের সব জমি পেটে পুরে বসে আছ ; কংগ্রেসে যা চলে, ফ্রণ্টে তো তা চলবে না বাবু।

সাঁপুই মাছের চোখেব মতো নিষ্পলক চেয়ে থাকে ও এই আজব জীবদুটিকে দেখে। তাব গলার স্বরটি দেহ আন্দাজে খুবই সরু। সে মিনমিনে গলায় বলে, তা আপনাদের অসুবিধে হলে আমি কংগ্রেসে ফিরে যাব। জোতদার কমিটির প্রেসিডেন্ট আছি যখন, তখন কোনো অসুবিধে হবে না আমার।

বিষ্ণু বলে, তাই বলেছি ;

কে জানে কি বলছেন ; আর জমিজমার খতেন যে করছেন, আদ্দেকের বেশি তো গুচো বেখে গেছে বাবা ঠাকুর্দা। সাঁওতাল—ওঁরাও আদিবাসীগুলো এক সের ধান ধার নিলে তারা এক বিঘে করে জমি নিয়েছে।

ছি ছি! শোষণ আর অত্যাচার।

জমি বাপের হয় না, দাপেব হয়। জেনেশুনেই তো এয়েচেন সব। আমি গিছলাম ;

থাক থাক, সে সব কথা থাক এখন। বলে দুই কমরেড সাঁপুইকে থাবড়ে দেয় পিঠে ও বলে, এখন আপনিও আমাদের কমরেড।

ওরা কর্মক্লান্ত দিনের শেষে যায় রাখাল পালের বাড়ি। সাঁপুইকে নমিনেশন দেবার কারণে রাখাল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তাকে তুষ্ট রাখা দরকার।

রাখাল বলে, আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। বিষ্ণুদাকে আজ দশ বছর ধরে বলে আসছি জমি থেকে চাষী উচ্ছেদ হচ্ছে, অঙ্কের

নিয়মে বর্গা উচ্ছেদ হচ্ছে, খেতমজুর আর বেকার বাড়ছে, একটা আন্দোলন নেই, একবার আসা নেই, আমি সুবলদের কি দেব?

বিষ্ণু কি যেন ভাবে আর ভাবে। তারপর বলে, চাকরি ঠিক করে জানাব। ওদের জানিও।

চাকরি!

হ্যাঁ। তুমি তেভাগার আঞ্চলিক কর্মীদের বয়েস, ছেলেদের বয়েস, শিক্ষার মান জানাবে।

আছেটা কে, সুবল আর জগাই ছাড়া?

গণেশ মণ্ডল?

উচ্ছেদ হয়েছে, চলে গেছে।

বিরাট গোয়ালা?

কবে মরে গেছে!

মঙ্গল কিসকু, সনা কিসকু, মান্ত্য টুডু?

দীর্ঘদিন বর্গা থেকে উচ্ছেদ। জেলায় জেলায় ঘুরে দাওয়ালী করত। বেঁচে আছে কিনা জানি না।

ভুনিচাঁদ মাইতি?

মাইরি! আপনি ধন্য লোক। ভুনিচাঁদকে যক্ষা হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলাম না সেবার?

আছে?

মরে গেছে।

এতজন মরে গেছে রাখাল? কোনো খবর রাখিনি? না না, রাজনীতি বড় সময় নিয়ে নেয়। মানুষের খবর রাখা হয় না একেবারে।

রাজনীতি, মানে আপনাদের রাজনীতির জন্যে মানুষ, না মানুষের জন্যে আপনাদের রাজনীতি?

বিষ্ণু বলে, সত্যি সত্যি—এবং মনে মনে রাখালকে 'বিপজ্জনক', 'পার্টিবিরোধী' বলে ছাপ মেরে দেয়। রাখালের বাড়িতে বিষ্ণু ও সজনী পরস্পরের সঙ্গে আর কথা বলে না। দুজনে দুটি খাটে ঘুমায় নেটের মশারীতে। মশারি দুটি সাঁপুই বাড়ির।

কলকাতা যাবার পর সজনী আর ধানজুড়ির কথা ভাবে না। কেন ভাববে সে? রাখাল যখন যায় রাখালকে বলে বিষ্ণু করুক যা করবার। হাজার হলেও ও, মানে গত নির্বাচনে তোমাদের পার্টি টেনেছে ষাট ভাগ ভোট। আমি গিয়েছিলাম কেন তা শুধোতে পার। আমি মনে করি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে না হোক, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধানজুড়িকে গুরুত্ব দেবার ব্যাপারে আমার পার্টির ভূমিকা অনেক বড। হ্যাঁ, তেভাগার সময়ে আমরা, মানে আমি আর বিষ্ণু একসঙ্গে গিয়েছিলাম ওখানে। তেভাগা অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

কিছু নয়? এত বড় আন্দোলন--

আহা, তার গুরুত্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকছে না। কৃষকদের হাতিয়ার ধরার ব্যাপারটা যে ঠিক নয়, তা আমরা দুটো পার্টিই বুঝি এখন। কিন্তু আমার বক্তব্য তা নয়। পার্টি তখন যুক্ত ছিল, গিয়েছিলাম। এখন নেই। এই পরিবর্তিত অবস্থায়, ও অঞ্চলে যে পার্টি গতবার ষাট ভাগ ভোট পেয়েছে সেই অর্থনীতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। আমার পার্টির হাতে আছে সংস্কৃতি, সাহিত্য। আমরা সেবার চল্লিশ ভাগ ভোট পেয়েছি। বেশ। এখন এটা জেনে রেখো ধানজুড়ির শহীদ কৌশল্যাকে নিয়ে যাতে আবার গান ও কবিতা লেখা হয়, তা আমি নিশ্চয় দেখব।

রাখাল 'দুত্তোরি' বলে বেরিয়ে আসে। সজনীর পার্টি কিন্তু তার মুখ্য দুই কবিকে দিয়ে 'ধানের নাম কৌশল্যা' ও 'অপ্রমেয় অন্ধকারে আকীর্ণ অঙ্কুরে বীজে তুমি' কবিতা দুটি লেখাতে ভোলে না। কবিতা দুটি পড়ে পার্টির চারপাশের সাহিত্য যশাকাঙ্ক্ষী শিল্পিত যুবক কবি বিপ্লবীরা মুগ্ধ হয়ে যায় ও অচিরে মস্কোতে কবিদের এ কবিতা দুটি কবি-প্রতিকৃতি সহ পঁচিশ লক্ষ ছাপা হয়ে যায়। কৌশল্যাকে এভাবে মস্কো পৌঁছে দিয়েই সজনীর কাজ ফুরায়।

বিষ্ণু রাখালকে বলে, ওরা চল্লিশ ভাগ ভোট পেয়েছিল, শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য করুক। আমার পার্টি ষাট ভাগ ভোট পেয়েছিল ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে। আমি কবিতা না বুঝতে পারি। মোকরারি কোর্ফা প্রজার দুঃখ বুঝি। তুমি ওদের জানাও, জগাইয়ের

ছেলে এবং সুবলের ছেলেকে আমি পুলিশে ঢুকিয়ে দেব।

জগাইয়ের ছেলের বয়েস আট।

অ্যাঁ? জগাইয়ের বয়েস?

ছত্রিশ।

ঠিক আছে। বয়েসটা কমিয়ে পঁচিশ করে ফেলুক। তাহলে আর ঢোকাতে কি?

আপনি না লিখেছিলেন, কৌশল্যার মৃত্যুকালে তাহার বড় ছেলের বয়েস ষোল? নাম জগাই?

সে ম্যানেজ করে দেব।

বলি শুদের।

পুলিশের চাকরির প্রস্তাব শুনে জগাই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত হয়। আর সেই রাতে, তার অস্থির উদ্ভ্রান্ত মনের শস্যক্ষেত্র-পাকা-ধান-আবাদ-বিদ্যাধরী ও মাতলা নদী ঢেকে আঁধার নামে। সে আঁধারে লক্ষ কোটি সূর্য ঝলসে ছুটে আসে জ্যোতির্ময়ী কৌশল্যা। ঠিক সেদিনের মতন। রক্তমাখা চুল বাতাসে ওড়ে ও চরাচর ঢাকে। কালো জমিতে সাদা চৌখুপি, লালপাড় জোলার কাপড় রক্তে ভেসে যায়। এক হাতে কৌশল্যা ধরে রাখে বেয়নেটে-গুলিতে দীর্ণ পূর্ণগর্ভ, অন্য হাতে কাস্তে তুলে ভীষণ আর্তনাদে মহাবিশ্বে প্রতিধ্বনি তুলে চেঁচাতে থাকে সাবধানবাণী, জগাই। নে গেল—নে গেল জগাই রে—সব নে গেল!

জগাই সকালে উঠে রাখালের কাছে যায়। বলে, পুলিশের চাগরি কত্তে পারব না গো বাবু। মাকে কাল স্পষ্ট দেকনু। তিনি আমার বিপদ ঝানলি ঠিক দেকা দেয়। তিনি দেকা দেল ঝকোন, তকোন আর সে চাগরি করব না। সাঁপুইবাবুর মত পুলিশও কি একোন পাট্টির নোক হয়েচে, হ্যাঁ বাবু? সাঁপুয়ে আর শত্তুরতা ভাবে নে, পুলিশকেও কমরেড ভাবতেছে?

পার্টির প্রতি বিশ্বস্ততা। এবং জগাইয়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধায় রাখাল টলমল করে। তারপর বলে, কৌশল্যার ছেলের উপযুক্ত জবাব বটে। আমি আমি তোমাকে যথাসাধ্য দেখব।

তুমি আর কি করবে বাবু? ঝ্যামন কপাল আমার, তেমন ভুগতে হবে। ঝাই, বাচুরটা ওলা তুলচে, ওষুদ দিতি হবে। শালার সাঁপুই ঘাস নিলে অদ্দি মাক্তে আসে চোক গরম করে, আর হ্যাকুর দে চেঁচায় বিস্তর। গুরুবাচুর ঘাস খায় নে? সেই আমাদের জমি টোকানি গো। নাবালে জমি, চাষ করে নে, ঘাস দেয় নে, ই কি জ্বালা!

জগাই চলে যায়। আর সুবল ওকে খুঁজে খুঁজে আসে। বলে, এ হতে ও আমারে মেরে থুয়ে গেল না কেন জগাই? ই কি অক্তে জম্মো, কি বেজম্মা ছেলে! আমার বেটা দেবেনের কতা বলচি। গুয়োর বেটা পুলিশ হবে বলে নেচে উটেচে!

সেই থেকে সুবল ছেলেকে দেখতে পারে না। তেরো বছরের দেবেন পুলিশ হয়ে, নানা ফন্দিফিকিরি করে বোনের বিয়ে দিয়েছে। ছোট ভাইকেও করে দিয়েছে হোমগার্ড। ছেলেকে ও দেখতে পারে না। ফলে বউ দেখতে পারে না ওকে। ইদানিং ১৯৮০ সালের গোড়া থেকে বউ সোদপুরে দেবেনের কাছেই থাকে।

সুবল তাতে খুবই নির্বিকার। যেমন এখন। গোড়াতেই বলেছি, সকালটাই ছিল অন্যরকম। জগাইয়ের সারারাত ছিল মায়ের অধিকারে। মা তার রাতগুলোয় যখন হানা দেয়, তখন যেন সব নিয়ে উথালপাথাল করে, উথালপাথাল। যত সেচখাল আর ভেড়ি, যত খালবিল আর সরকারের দল বদলের সমীক্ষিত চাষ ব্যবস্থা,—সেচ ব্যবস্থা—সব কি মা কৌশল্যার হয়ে যায় তখন? কেন না চরাচর ব্যেপে মা আসে তখন—মার দেহের জ্যোতিতে বারবার উদ্ভাসিত হয় বিশ্বচরাচর, যখন হয়, তখন বারবার দেখা যায় কত মানুষ, কত জমি, ধানজুড়ির সীমানা কোথায় চলে যায় যেন।

এমন এক রাতের পর জগাই শুধু সুবলের কাছেই যেতে পারে, আর কোথাও নয়। রাখাল থাকলে হত। রাখাল এখন এক নিষিদ্ধ নাম।

সুবল বলে, আয়, বস হেতাক।

ই কি হচ্ছে? এত মুড়ি কোতত্তেকে পেলে?

উনির কেরপায়।

সুবলের উঠানে একটি হলদি বা গামা গাছ। এ সময়ে গাছটির কদর বড়। আশ্বিনে ওরাওঁদের করম পূজা। এই ওদের করম গাছ। আগে ওরাওঁ বসতি আর সুবলদের পাড়ার মাঝামাঝি ছিল এক সুতোনলি খাল, কিছু বাঁশঝোপ আর সাঁপুইদের সাবুডোবা। ছিল বহু গাছ।

এত সাইকেল রিক্শার ভেঁপু, রেডিওর চিৎকার, মাইক সহযোগে লটারী-রাজনীতিক সভা-সিনেমা-যাত্রা বিষয়ে চিৎকার, এ সব ছিল না।

ফলে পূজার এক সপ্তাহ আগে থেকে শোনা যেত ওরাওঁ মেয়েদের গলায় করম পূজার গান—

এতা এতা জাওয়া কিয়য়া কিয়া
জাওয়া জাওয়া জাগালা মোর
ধানা বহুরা রে...
এতা এতা জাওয়া কিয়া কিয়া
জাওয়া জাওয়া জাগালা মোর্
গহম্ বহুরা রে...
তারা গাইত একটানা সুরে
নাহি-আরা জাবো কাইকে
চিউড়া মোই কুটালি
সেহ চিউড়া ধান মেশাই দেলাই
নাহি আরা জাই নাই দেলাই
বালি হায় রে...

পরবের দিন ওরাওঁ গৃহকর্তারা স্নান করে কাচা কাপড়ে কাচা চাদরে করমের ডাল আনতে চলত। সঙ্গে সঙ্গে চলত ঢাক বাজিয়ে ঢাকী, পিছনে চলত ছোট ছেলেমেয়ের দল। গৃহকর্তার হাতে লাল গামছা আর কোদাল। সেদিনও শুধু সুবলের উঠানে করম গাছ। গৃহকর্তা সুবলের গ্রামপড়শি, কিন্তু এ দিনে সুবলের অন্য পদমর্যাদা।

গৃহকর্তা হাতজোড় করে দাঁড়াত ও বলত, ঠাকুর গাছের ডাল নিব, দিতে আজ্ঞা হয়, আজ্ঞা।

দিলাম আজ্ঞা।

তারপর মাটিতে পাঁচসিকে পয়সা রেখে, গাছটিকে নমস্কার করে ডাল কেটে নিত গৃহকর্তা। যখন ফিরে যেত, তখন তার পিছনে চলত সুবলের ছেলে দেবেনের মত অন্য ছেলেপিলেরা।

এখন ওরাওঁ মেয়েরা গান গায় না কি বুঝতে পারে না সুবল? ওরাওঁ বসতিতে মাত্রই চার ঘর আছে এখন। অন্তবর্তী জায়গাটিতে বহু দোকানপাট, নয়াবসত। সুতোনলির খাল ছিল জলনিকাশী। তা বুজিয়ে সেখানে গভীর নলকূপ বসিয়ে সাঁপুই স্বক্ষেত্রে এনেছে সবুজ-বিপ্লব। এ সব কাজ সে সেরেছে চতুর কৌশলে। বিধানসভার ঘরের মেঝের এদিক থেকে ওদিক এবং ওদিক থেকে এদিক বহুবার হাঁটাহাঁটি করার পর। গত নির্বাচন থেকে আবার সে দাঁড়ে বসেছে শাসক দলের খাঁচায়, বিশ্বভ্রমণ করে এসেছে, এবং তার ছেলের শালা ও তার সচিব দিব্যেন্দুর পরামর্শে চলে বড় হাসিব পাত্র হয়েছে। রোমের কলোসিয়ম, এথেন্সের ডেলফি মন্দির জাতীয় কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে সে ছবি তোলায়। ছবিগুলি রঙিন। ধানজুড়ির একমাত্র স্টুডিওর শো-কেসে ছবিগুলি রাখা হয়। ইতিমধ্যে তার পার্টির প্রধান বিরোধী দলের রবরবা জেঁকে ওঠে এবং দিব্যেন্দু সেখানে চলে যায়। সাঁপুইকে ভয় খাইয়ে। দিব্যেন্দু তার বহু গোপন কথা জানে।

দিব্যেন্দুর সাফ জবাব, আপনি সাইকেল দিয়েছেন, ওরা স্কুটার দিচ্ছে। আপনি চাকরি করিয়ে মাইনে দেন, ওরা এমনি দেবে।

সেই দিব্যেন্দু লেগেছে তার পঞ্চায়েতের পিছনে। এবং পি.চর ড্রামের উপর দাঁড়িয়ে এক বক্তৃতায় বলেছে, যত ভাঙাচোরা বাড়ি-ঘরের সামনে ওনার ছবি কেন? উনি খালি ভাঙতে জানেন।

সকলেই এ কথা বিশ্বাস করেছে। অন্যের কথা আর কি বলা যাবে, বউ শিবানীও বলেছে, আমি জানলুম তুমি বেড়াতে যাচ্চো, তুমি সব ভাঙতে গিছিলে? তোমাকে তারা ভাঙবার ঠিকেদারী দিয়েছিল? আমি তো তাই বউমাকে বললাম, তোমার ভাইকে বোল, তোমার শ্বশুর কোনো কাজ বিনে কারণে করেন না। তিনি নিশ্চয় ঠিকেদারী পেইছিলেন, তাই ভাঙতে গিইছিলেন।

সাঁপুই দিব্যেন্দুকে ফেরাতে চায়। দিব্যেন্দু যা হাঁকছে, তাতে সাঁপুই রাজী নয়।

এ সব কর্মকাণ্ডে সুবলদের আপাত কোন ভূমিকা নেই। যদিও সুবলকে সবাই, সব দল নির্বিশেষে ঘোর সন্দেহ করে।

কেন সে পুলিশকে ভালবাসে না? অর্থাৎ তার ছেলেকে? এর মানে কি?

উঠোনের গামা বা করম গাছটি সে কাটে না কেন? গাছ এখন কেউ রাখে না। অভাবী লোক থাউকো টাকায় ধড়াধড় গাছ বেচে। সাঁপুয়ের কাঠগোলা আছে, সে নিজেই শিরিস, খিরিস, গামা, তেঁতুল, যা পাচ্ছে সব কিনছে।

সাঁপুই লোক পাঠিয়ে দেখছে বাজিয়ে। ওহো হো, সুবল রে, তোর হুককু দেকে পরাণ ঝ্যামন ফটাস করে ফেটে যায় রে। তা ঝে ঝা বলুক আমি তো জানি তোর জমি ছেল নিজের জাজ্যোল্য চার বিঘে। সম্বস্ব গেচে তোর। তা বাবু কপালে ন্যাকন অইলে ছাড়ায় কে? জমি তো গেচে। কিন্তুক দু'পাঁচশো টাকা তো তুই একনি পেতে পারিস। গামা গাচটা, বুড়ো তেঁতুলটা, গাচগুলো বেচে দে না কেন?

এ তো তোমার কতা নয় মোহন, এ সেই শুয়োর বেটার কতা।

বেচবুনি গাচ, ঝাও গে।

বেচবি না?

না, তুমি বেইরে পড় দিকি।

এই গাছকাটা নিয়ে কয়েক বছর ধরেই খুব কেচাকেচি চলছে। হঠাৎ, ১৯৮০ সালে সুবলের গাছ-না-বেচা এবং ওরাওঁদের করম পূজায় গাছের ডাল নেবার ব্যাপারটিকে নতুন আলোকে দেখা যাচ্ছে।

সুবল তা জানে। জেনেও তা নিয়ে চিন্তা করা ও ছেড়ে দিয়েছে। করম গাছের ডাল নেয় বলে ওরাওঁরা মাঝেমধ্যে ওকে মুড়ি দিয়ে যায়, নয় ছাতু। সুবলও গাছটির গা দিয়ে সাদা ও নীল অপরাজিতা লতা বাইয়ে দিয়েছে।

মুড়ির খুঁচি জগাইয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে সুবল বলল, খা কেন? লংকা তুলি আন দুটো মুড়ি খা। ভাদ্দর-আশ্বিনটা করম ঠাকুর

খাওয়া মাপে ক বচর ঝায়।

মুড়ি খেতে খেতে সুবল হুঁ হুঁ করে গান ভাঁজে। জগাই বলে, তা গলা খুলি গাও না?

সুবলকে দুবার বলতে হয় না। ঈষৎ হেসে সে গান ধরে।

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভোমে মাটি দিয়ে
ওরে মা বেটি কি মাটির মেয়ে
মিচে ঘাটিস মাটি নিয়ে—!!

তারপর বলে, বেশ গান। সব ঝানিনি। তবে বেশ গান। বোঠান শুনতি ভালবাসত।

মা এই করম পরব দেকতি ঝেত মনে আচে? ঢাকে কাটি পড়েচে কি সে মানুষ ঝাবে।

দলমলা মানুষ ছিল। আর কি সাহস, কি বুকের পাটা। বরষার জলে কুমির আসে ঝানা কতা। বোঠান পেতলের ঘড়া ভাইসে চ্যান করচে, ঘড়া ভেসি যায়। সোঁতের টানে হেই চলি যায়। তা বোঠান কি কুমির মানচে? তিনি গায়ে হলুদ মেকে ঝাঁপ দে পড়ল, ঘড়া নে এল। দেবেনের মা বলতেচে, হ্যাঁ দিদি, তোর ভয় করেনে? তা বোঠান বলতেচে, ঘড়া ভেসে গেলি তার পেতু?

খুব সাহস। আমি ঝানি। নথা তো কিচু ঝানে নে, দেকে নে কিচু, তাতে উ কতা বললি গোঁসা হয়।

কি কতা বললি? বোঠানের নাম করলি?

না। মারে দেকলে পরে।

দেকিস? তারে তুই দেকিস?

জগাই অতীব সবল ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে বলে, ঝ্যামন তোমায় দেকতেচি। সি কি অন্ধকার গো কাকা! সকল ঝ্যামন কালিবন্ন। আর আকাশ পাতাল বাদাবন খেত-জুলি ঝোঁপে মেঘের মত মা ছুটি আসতি থাকে! অক্ত আঙা চুল ঝ্যামন আকাশে উড়তিচে, এক হাতে ভরাভর্তি পেট চেপি ধরেচে, ঝুঁজিয়ে অক্ত পড়তিচে গো! অন্য হাতে কাস্তেটা উঁচু করে বাইগে ধরেচে আর আমারে আছাড়ি-

পিছাড়ি ডাকতিচে, জগাই রে—সব নে গেল, নে গেল রে জগাই। তেমনি করে ডেকিছিল, নয়?

তুই ঝানবি। তুই আর তোর বাপে তো তারে টেনি নিলি, ধুয়ে নে গেল।

জগাই তেমনি ঈষৎ বিস্ময়ে বলে, ভরাভর্তি ন' মাস। গুলি করতে তকনো ছুটচে। গুর্খাটা সঙিন দে ফেড়ে দেচে কে ঝানে। তকনো বলতেচে সব নে গেল জগাই রে, সব নে গেল। শোয়াত্তি না শোয়াত্তি হয়ে গেল।

অনেক ভেবে বলে, পেটের ছেলে গুলিতেই মরিছিল। পেট চিরতে মাতাটা আর একটা হাত বেইরে এসিচিল।

আমারে বলতেচিস কেন? কি ঝানি না আমি? দুগগামণিকে গুলি করতে তারে সাপটে নে দৌড়চ্চি। নামাতে পটলবাবু বলে, কারে আনতিচ, অ সুবল! দুগগা বোনের তো হয়ে গেচে।

ঝানি। আতে তুমি বলে গেলে, দুগগা নি, আইমণি নি বোঠান খুব সাবধান। কাল আরেকটা চোট আসতিচে। পিচেশদের অকম সকম ভালো নয়। তাতেই মা বলল, সাঁপুই তো পেইলে আচে। ওই ভক্তচরণ আর অভয়েরে বঁটি দে ছাই পেতে কুটব।

ভক্ত আর অভয়! সি কি ব্যাগ্যতা বে জগাই! মেরোনি মেরোনি বাপ সুবল, তুমি আমার বাপ। জমি ঘুইরে দোব, তেভাগা মেনি নোব, হলপ করচি। আমি বন্নু, দুগগা, আইমণিরে বোঠানরে ঘুইরে এনি দেতে পারবে? মাওড়া ছেলেমেয়ে ঝে কানতেচে, তাদেরকে বুজ দেতে পারবে? গুয়োর বেটারা বলে, পুলিশে মেরেচে বাপ, মোরা ঝানিনি। ঝ্যামন বলা, তেমন কোপ ঝানলি জগাই? এ হাতে বল ছিল কত? এই ঝে বল, কোতা গেল?

একো সাঁজ ভাতে বল থাকে। মাইলোর আটা নিজে খাই আজ কতকাল। আর বল থাকে।

তবু তু তারে দেকিস।

হ্যাঁ কাকা।

আমি দেকি না। তবে তোর কতা শুনে তোর চোক দে ঝ্যামন

দেকে নিলাম। চোক জুড়োল।

আর কি বিপদ আসতেচে বল দিকি?

বিপদ জগাই? আরো বিপদ চাস?

না গো কাকা। তারে ঝকন দেকি, তকনি বিপদ এট্টা আসে। সে ছিল শত মায়ের এক মা। মাঝিপাড়ায় আগুন লেগেচে, অমনি শাঁকে পোঁ দিলে। শাঁক বাজাতেচে আর বলতেচে শাঁক নাব্যে, তোরা ছুটে ঝা। আগুন নেবা রে। পড়শি হয়। শিক্ষে ছিল কত।

বিপদ!

হ্যাঁ, তুমি ঝানো কিছু?

কি ঝানব?

রাখাল থাকলে ঝানা ঝেত।

আর রাখাল! সে থাকলে বাঁচি।

এখানেই ওদের খোঁজ করে করে আসে লখিন্দর। বলে, কেওন শুনোচো?

কিসের কেওন?

যাত্রা হতেচে ঝানো?

আমার ঝানবার বয়েসনি, তোর বাপেরও নি।

দাদুর মুকে এক কতা। তোমরা ঝানো এক তেভাগা। সে তেভাগা করে হলটা কি?

সুবল গনগনে হয়ে ওঠে। বলে, কার নাতি তুই তা মনে একে কতা কোস নখা।

তেভাগার, কাকদ্বীপের তেভাগার কতা কেউ বলে নে কেন তবে? বই নিকেচে দেকলাম। তাতে বলতেচে একোন বর্গা রেকর্ড হবে বলে তেভাগা হইচিল।

মিচে কথা। সে কি তেভাগা রে নখা। তোর বাপ ষোল বচুরে ছেলে, আমি সা জোয়ান। সংগ্রাম কমিটি হইচিল। পাঁচ বচর নড়াই চলে। লপ্ত লপ্ত জমি সব ভাগ হইছিল চাষী ক্ষেত মুনিষের মদ্দে। কত জমিমালিক, সব ভেগিছিল। সে তেভাগা কিছু নয়? হ্যাঁ, পাট্টি আমাদের দেকলে না, দেলে না কিছু। আমরা ভিকিরি

হয়ে তাড়া খেলাম। হ্যাঁ, বাবুরা ঝেয়ে গদি নিয়ে বাবু হল। সাপুই আর পুলিশের সাতে গাঁটছড়া বাঁদল। তাতে কি সে তেভাগা মিচে হয় রে? উ কতা বলিসনি।

এত কতা আমিও ঝানি। তবু মনে ঝাল উঠে ঝায়। জাক গে, জে কতা বলচিলাম।

বল। সাত কতা উ:ট পড়ল।

জগাই হঠাৎ বিশাল অভিমানে বলে, আমার সঙ্গে তোর আবার কতা কি?

আতদিন তেভাগার ম্যাজাজ হাঁকিওনি। ভাল কতা বলতে এনু, তু ঝনায় আমারে ছেঁচাতেছে।

বল।

ঠাগমার কতা নে, যাত্তারা হতেচে।

কোতা?

হেতা। আব কোতা?

জগাই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। মাতৃভক্ত জগাই, জননী অন্ত প্রাণ। কিন্তু তেভাগা শহীদ কৌশল্যা জননীর সাংস্কৃতিক রূপান্তরটির অভিজ্ঞতা তার ভালো নয়।

মায়ের মৃত্যুর পরে পরে বাবুরা এসেছিল সেই গানটা বেঁধে গান শেখাতে। জগাই, সুবল, সকলের বুক ফুলে উঠেছিল গর্বে। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পড়ছিল জল। ওঃ, কৌশল্যা কি সামান্য মানুষ ছিল? কতজন তার নাম আজ গানে গানে শুনতে পাচ্ছে।

তারপরে যখন বাবুরা এল, ততদিনে মাতলা বিদ্যাধরীতে অনেক জল বহে গেছে। বিষ্ণুবাবু হেঁকে বলেছিল, এ কিরকম কথা? কৃষকদের দাবিদাওয়ার জন্যে কৃষকসভা। তোমরা যাবে না, এর মানে কি? তাছাড়া কৌশল্যার নামে তোরণ হচ্ছে—

মা মরে যাবার পর এতদিনে মনে পড়ল বাবু? —এ কথা বলে জগাই এক পেল্লায় ধমক খায়।

মরে গেছে মানে কি? কার ছেলে তুমি, এই তোমার রাজনৈতিক চেতনা? কৌশল্যার মৃত্যু নেই, তার মরণ হতে পারে না। এক

কৌশল্যা আজ লক্ষ্যজনের প্রেরণা। ভুলে যেও না সে কথা।

জগাই এ কথায় অতীব ঘাবড়ে যায়। মরে যায়নি মা? তাহলে কার দেহ নিয়ে সেদিন এই ধানজুড়িতে এত বড় কাণ্ড? বীরগঞ্জ থেকে শত শত স্বেচ্ছাসেবী নদী সাঁতরে চলে আসছে ধানজুড়ি। এদিকে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব ১৪৪ ধারা মানা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য কয়েকশো গুর্খা সৈন্য নিয়ে হাজির। কয়েক হাজার বর্গাচাষী, ছোটচাষী, খেত মজুরের শোভাযাত্রার সামনে তারা ব্যর্থ, অক্ষম, নিশ্চল। মিছিলের সামনে লাল পতাকায় মোড়া মা জয়চাঁদ। সব, সব সত্যি। কিন্তু সুবলকাকার হাতে ধরে মুখাগ্নি করানোও সত্যি: নির্মম সত্যি বেড়ার দেওয়ালে গোজা মায়ের লম্বা চুল জড়ানো কাঠের কাঁকই, উঠোনে মেলা মায়ের দ্বিতীয় কাপড়খানি। রোদে জ্বলা গাঢ় নীল কালোপেড়ে মোটা কাপড়খানাকে সাঁঝবাতাসে ফুলে ফুলে উড়তে দেখে জগাইয়ের বুক কি ফেটে যায়নি?

কিন্তু বিষ্ণুবাবু বলে যায়, মা মরেনি।

তার অনেক বাদে আবার যখন বিষ্ণুবাবু আসে, সুবল বলেছিল, বোঠানের নামে তোরণ দেকতি সে ঝাবেন গো। তার ধুম জ্বর। হাসপাতালে দে এনু। আর তিনি তো মরেচে, জগাইটাবে নে কয়েক বচর বাদে পিরিত উতলে উঠে কেন?

কৌশল্যা মরেনি—

বাবু, শত কৌশল্যা নিত্য মরতেচে। জমি নি, জেরাত নি, বিচার নি, ভাত নি, তা নে ঝন্নি তেনার পেয়োজন চেল তা তো হয়েচে। তোমরা গদী পেয়েচো, মন্ত্রী হয়েচো, জ্ঞাতগুষ্টি চেলাচামুণ্ডা সব্বস্ব খাচ্চো, এবার আমাদের ক্ষামা দ্যাও। লড়াইয়ে কতানি, হক আদায়ের কতানি, হেঁসো কাস্তে ধরার কতানি। অত মিটিন করার, বক্তিমে শোনার কতা আবাদী মানুষ বুজে না।

তুমি যাবে না সভায়?

ঝিনি সভা কত্তেচে সেই সাঁপুইবাবু জোন না খাটলি ঝ্যাটা মারবে নে? সাঁজগন্ত দুটো চাল কিনতি হবে না?

বিষ্ণুবাবু বলে, একদিনে কি আর ব্যবস্থা হয় সুবল? তখন

চাকরির ব্যবস্থা করলাম।

পুলিশে ছেলেরে পুলিশে ঢোকালে। বাবু! একন ঝদি আবার তেভাগা হয় তাহলি আর ভাবনানি। ছেলের হাতে গুলি খেঁইয়ে সটা নরকে চলি ঝাব। ও শুয়োর বেটা তো হাত তুলি নাচবে।

বিষ্ণুবাবু বার দুয়েক মন্ত্রী হয়েছে। মেজাজ তার ঠিক থাকে না। সে বলেছিল, রাখাল কি কিছু বলেছে তোমাদের? তোমরা যে এক তেভাগার টাঙে চেপে রইলে, আর নামছ না।

আমাদের গদীনি, মন্ত্রীগিরিনি, পেসেনে চাপানি, ভোট গুড়োনো তো নি, ওই তেভাগাটা আচে শুধু। হ্যাঁ আমাদেরি সে তেভাগা। তোমরা জমি নে বাঁচ না বাবু, সে তুক্ বুজ না। রাখাল? বলবে না কেন? আজই তো দেকে গেল ঘরে চাল আচে, না নি।

বিষ্ণুবাবু ক্ষেপে চলে যায়। এবারে আর কৌশল্যা পোরণের সামনে জগাইকে দাঁড় করানো যায় নি। 'কৌশল্যা মা' গান ও কবিতার সময়ে মঞ্চে তোলা যায়নি তাকে। জগাই হাসপাতাল থেকে নলিপারা হয়ে ফিরে আসে।

তারপরে আর নানা কারণেই জগাইয়ের কথা সবাই ভুলে যায়।

হঠাৎ এ বছর, এতদিন বাদে!

জগাই বলে, মায়ের নামে যাত্তারা! নইলে বলচি কি?

খুব এক যন্তরনা ঝা হোক।

চাঁদু আর দিলীপ তোমায় খুঁজতেচে।

রাজনীতিক দুই মস্তানের নাম শুনে জগাই আরো অবসন্ন হয়ে পড়ে। চাঁদু ও দিলীপ সকল অর্থেই সময়ের সন্তান। এক সময়ে যে দল রাখালকে যুবক নেতা হিসেবে অঞ্চলে রাখত—আজ সে স্বচ্ছন্দে রাখালকে খারিজ করে দিয়েছে।

চাঁদু ও দিলীপ যুবশক্তি বলে গণ্য হয়। দুজনের বয়েসই বছর তিরিশ। দুজনেই কংগ্রেসের যুবশাখায় ছিল। এত তাড়াতাড়ি তাদের রূপান্তর সময়ের নিয়মেই হয়। ভোটের আগেই তারা মস্তান, বন্দুক, পেটো ও হুমকি সংগঠিত করে ফেলে। তারপর যখন বোঝে হাওয়া ঘুরে যাবে, সাঁপুইকে বলে, পার্সেন্টেজ আসুন।

গোপন বৈঠকে সব কথা ঝেড়ে কাশা হয়। এবং চাঁদু ও দিলীপ নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়ে। দুজনেই বড় ঠিকাদারের ছেলে। ঠিকাদার এখন সবচেয়ে বড় কুলীন। ঠিকাদার যখন বড়, তখন সে সব সরকারেরই খুঁটি। সাঁপুই চাঁদু ও দিলীপের আগমনের ব্যাপারটিকে সুস্বাগতম জানায়। কারণ অন্যত্র। তেভাগার সময়ের সাঁপুইরা অঞ্চলে পুলিশ ঢুকিয়েছে, 'রে রে রে পাতকী' বলে নিজেরাও বন্দুক ফুটিয়েছে।

বড়ই দুঃখজনক নির্মম বাস্তব। তাই উক্ত 'হা রে রে রে' পন্থা এখন পশ্চিমবঙ্গে চলে না। জমি ধরে রাখতে পারলে, সরকারপ্রশাসন পুলিশকে কিনে রাখতে পারলে, 'হা রে রে' করার দরকারও হয় না। পশ্চিমবঙ্গের নকসা অতীব রাজনীতি-সচেতন আইনের ধারা উপধারা সম্বলিত এক জটিল নকসা। একই পরিমাপের জোত, এক রকম প্রভাব প্রতিপত্তি-ঠিকাদারী টাকাকড়ি হয়ত রাম ও শ্যামের আছে। এবং এর জীপে যদি লাল ঝাণ্ডা ওড়ে, ওর জীপে ওড়ে 'বিজয়ী বিশ্ব তিরঙ্গা প্যারা'। হয়তো দুজনেরই আছে গেঁটে বাত, দুজনেই সদরে টীকা নেয়, অন্দরে শীতলা পুজো করায়। হয়তো দুজনেই ব্যোমভোলে বাবার শিষ্য এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে একবার করে 'বিস্কোবি রবিন্দোনাথ' নামটি উচ্চারণ করে—বক্তৃতা দিতে গেলে এ আওতায় 'মার্কোস-লেলিন,' ও বলে 'মহাত্তাঁ গান্দি'। এ সব হবেই। গ্রামীণ সদস্যের বেলা এ সব মেনে নিতেই হবে। সহাবস্থান এ দেশে শুধু রাষ্ট্রনীতিতে নয়, সহাবস্থানের শিকড় খুব গভীর।

বিহার, অন্ধ্র বা তামিলনাড়ু হলে রাম বা শ্যামের জোতে কখনো আঁচড় যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে যদু সরকারে এলে শোনা যাবে রাম এক অন্যায়কারী জোতদার। তাহার জমিতে বর্গা রেকর্ড করাও। মধু সরকারে এলে শোনা যাবে শ্যাম অতীব শোষক ও অত্যাচারী, তার জমিতে বর্গা বসাও।

এই অন্যায়কারী জোতদারকে আইনের প্যাঁচে ফেলে শায়েস্তা করার কথাটি কিন্তু প্রচার-তথ্যচিত্র-মিটিং—কাগজের খবর, এই সবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বাস্তবে যা ঘটবে তা অতীব নীতিশিক্ষা প্রদায়ী ঘটনা। তা হল, —পার্টি ও প্রশাসন সর্বতোভাবে রাম ও শ্যাম মদত দেবে ফলে,— সাবধান হবে।

কোনো মতেই তাদের জোতে ঘা পড়বে না।

যদি কোন সৎ কানুনগো তাদের জমি ভেস্ট করে বর্গা রেকর্ড করায়, ভীষণ ও ভয়ঙ্কর চাপ আসবে তার উপর এবং চাঁহু মার্কা পার্টির ক্যাডাররা ঝাণ্ডা নিয়ে লড়ে যাবে।

এক ছটাক জমি আধা ভাগ বর্গাকে দিতে হলেও রাম ও শ্যাম ইনজাংশন চাইবে।

আদালত তা মঞ্জুর করবে। জমি ভেস্ট হবে রাম ও শ্যামের নয়। নেদো, কেনো, বোঁচা, পটলার। অন্যান্য নেদো-কেনো-বোঁচা ও পটলা দশ বিঘার জোতে পাঁচজন বর্গা বসবে। ফলে এ জমিও জমির নিয়মে রাম ও শ্যামের জোতের দিকে ছুটবে। বর্গারা পর্যবসিত হবে ক্ষেত-মজুরে।

আর যে সব ছোট রাম ও ছোট শ্যামের জমি অধিগ্রস্ত হবে,— তারা সব হাজার হাজার ইনজাংশন প্রার্থনা করবে। সাবজুডিস বা বিচারাধীন জমির ক্ষেত্রে কোনো মীমাংসা করা যাবে না।

এর পরেও বর্গা বসবে ও লাভবান হবে। সেই জমি মালিকের ক্ষেত্রে। যার উপর যদু ও মধুর সবার সরকারই হাড়ে চটা।

এই জটিল ও বেজায় গোলমেলে, অথবা জলের মত সহজ কাণ্ড-বাণ্ড যখন ঘটতে থাকবে তখন প্রচার পর্যায়ে জিনিসটি চূড়ান্ত সফল বলে ঘোষিত হতে থাকবে। প্রচারের যুগে জোর গলায় প্রচার চালিয়ে গেলে বেগুনকে ল্যাংড়া আম প্রতিপন্ন করা এ রাজ্যে বড়ই সোজা।

কেন না উনিশ শতক থেকে আজ সতীদাহ নিবারণ, কাল সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, পরশু ইংরাজ আসিলে ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাইবে, তবুও সেক্যুলার শিক্ষা প্রসার ইত্যাদি চিন্তা করে করে বাঙালী মধ্যবিত্ত বড় ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। স্বাধীনতার আগে অবধি কত বিষয়ে যে চিন্তা করতে হয়েছে তার ঠিক কি ?

স্বাধীনতার পরের বাঙালী মধ্যবিত্ত তাই নিজে আর চিন্তা করে না। স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বাস্তব বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি আরো সত্যি। নেতারা যা ভাবেন, কর্মী তাই বলে চলে হিংস্র বিশ্বাসে। হাইকমাণ্ড যা ভাবে, নেতারা তাই বলে চলেন হিংস্র বিশ্বাসে। বিদেশী রাষ্ট্রটি বা রাষ্ট্রগুলি যা ভাবে, হাইকমাণ্ড তাই বলে চলে হিংস্র বিশ্বাসে।

কেউ স্বাধীনভাবে চিন্তা করলে তাকে তৃতীয় রাষ্ট্রের দালাল বলে ছাপ মেরে দেবার অধিকার দুই হাইকমাণ্ডেরই থাকে।

অন্যদিকে থাকে ঘুমপাড়ানিয়া সাদর গানের কলি, বর্ধিত মাগগী ভাতা বেকার ভাতা চাষী ভাতা (চাষী কে?)—ফুটবল রবীন্দ্র-নজরুল সুকান্ত উৎসব—ক্রিকেট—দুর্গাপূজা থেকে কালীপূজা—অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলন।

হায়, বর্ধিত মাগগীভাতাকে কলা দেখিয়ে খানিক নেয় আয়কর—খানিক মিলায় আলু-চিনি-কেরোসিনের কালোবাজারে। বেকার-ভাতা নেয় পার্টি মস্তান। ফুটবলের মাঠ হয় অবধি দর্শক হত্যা মঞ্চ। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত উৎসবের বহু কাগজে 'শুকান্তো' বানান জ্বল জ্বল করে। পূজার মাসে পথে পথে ঘোরে অন্ন চেয়ে ভিখারী। অপসংস্কৃতি-বিরোধী আন্দোলনের জঙ্গী প্রচারের সঙ্গে চলে 'সেক্সি ড্রীম' মার্কা ছবি।

গ্রামবাংলা মরে বন্যায়, খরায়, ক্ষেতমজুর হয়ে যাবার বেদনায়। চাল চালান দিয়ে বহুজন খায় আটাসিদ্ধ, পঞ্চায়েতের মস্তানীতে গ্রামবাংলার নাভিশ্বাস ওঠে। কিন্তু প্রচার চলে উদ্ধত সাফল্যের।

পশ্চিমবঙ্গের নকসা যদি এত জটিল হয়, সাঁপুই কি করবে?

তার তো বিহারের জোতদারদের মত হারে রে রে' করতে বাসনা জাগে।

সব সাধ কি মেটে, সব আশা কি পূর্ণ হয়?

ব্যক্তির মস্তানী করার দরকার নেই। দল ও প্রশাসনই বত্রিশ বছর ধরে সকল মস্তানী করে দিচ্ছে এ বুঝতেও সাঁপইয়ের সময় লেগেছে।

চাঁদু ও দিলীপ এসে পড়াতে সাঁপুই স্বস্তি পায়। হাজার হলেও এরাও ঠিকাদার, সেও ঠিকাদার। এরাও জোতদার, সেও জোতদার। এরা বিরোধী দলে যতদিন ছিল, সাঁপুই প্রাণের ভয় করত। এখন এদের সঙ্গে এক দলে, এক মোর্চায় সামিল হওয়া খুবই সুবিধাজনক। 'সাঁপুই উর্দ্ধসীমার উপর পাঁচশো বিঘা জমি রাখে'—সাঁপুইয়ের ঠিকাদার কোম্পানির তৈরি বাড়িতে সিমেন্ট থাকে না'—'সাঁপুই যে কেন্দ্রে সদস্য, সে কেন্দ্রে এত লোক বছরে বছরে ভূমিহীন হচ্ছে'—এ সব খবর আর বেরোবে না। এলাকাটি ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়া যাবে। সাঁপুইয়ের ছেলে বলে, বাবা একলা সব খেও না। দিয়ে থুয়ে খাও।

সাঁপুই তো দিয়ে থুয়ে খেতেই চায়। দেবে বা কাকে। রাখাল এক মারমুখো জীব। সে কোনরকম ভাগবাটোয়ারায় নেই।

সাঁপুই বলে, তোমরা এই রাখালটাকে জব্দ করলে ঢের করা হবে।

চাঁদু ও দিলীপ বলে, সব আমাদের ভরসায় ছেড়ে দিন দেখি? জায়গা গরম করে ফেলে দোব। যত নীতিবাগীশ মান আচে, তাড়িয়ে ছাড়ব। আপনি সুদ্ধু নামগুলো দিয়ে যান।

দোব।

কোতাও লাশ ফেলতে হয়, কোতাও পেটো, কোতাও কত্তার হুকড়ো।—চাঁদু জঙ্গী।

না না, তার দরকার নেই। আমাদের খোমা পার্টির লেবেলে দেখলেই কাজ হবে। দিলীপ বলে।

তার সঙ্গেই একমত হয় সাঁপুই। এবং সে ভাবেই কাজ চলে, কাজ হয়। রাখাল বলে, একন আর আমাদের দরকার নেই। একন জমানা পালটে গেচে।

সেই চাঁদু, সেই দিলীপ! জগাই অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। চাঁদু ও দিলীপ সুবলের বাড়িই এসে পড়ে।

তারা বলে, কৌশল্যের ছেলে হয়ে হেতা সাঁজালে তো চলবে না। জগাই।

কি কত্তে হবে?

যাত্রার উদ্বোধন কত্তে হবে। সোজা কতা! লাখ টাকার পার্ট্টি এনিচি।

সুবল বলে, ক্যানো?

চাঁদু বলে, সে তুমি বুজবে? অপসমসকিত্তি বন্দো কত্তে হবে না? অপসমসকিত্তি—বল্ না দিলীপ—আমার বাবু মনে থাকে না।

অপসমসকিত্তি মানে হিন্দি ছবি।

সুবল বলে, সেটা কি মন্দ?

মন্দ নয়! অপসমসকিত্তি পাটিয়ে পাটিয়ে কেন্দ্র ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ষোলজন্তোর জুড়েচে। যার নাম ষড়যন্ত্র। জনসাধারণের—

সুবল বলে, মানে জনগণের—

ওই তো জানো দেকচি। তা জানবে, তা জানবে। কমদিন তো এ সব শোনো নি? তা জনগণের সরকারকে ফেলে দেবে বলে যে ষড়যন্ত্র কেন্দ্রের—তা রুকতে হবে। তাজ্জন্যে চাই ভালো সমস্‌কিত্তি।

তাতেই লাক টাকার যাত্তার দল এনোচো?

আনব না? যে পালা লিকেচে সে একজন বিল্‌পবী, সব জানে। বিল্‌পবী জিনিস দেকলে জ্ঞান হবে। তুমিও যাবে। তুমি হলে তেভাগার বীর। হা হ্যা হ্যা!

আমি ঝে আরেক ষড়যন্ত্রে মরচি।

কি হল আবার?

এই পেটের ষড়যন্ত্র। রোজ কি শালা দিনে একবার অন্তত খেতি চাইবেই চাইবে! আমার কি শালা সে জমিটোকা আচে, না ঘরে ধান আচে ঝে পেট ষড়যন্ত্র করলিই কিচু দোব?

চাঁদু ও দিলীপ অসম্ভব হাসে।

এ ষড়যন্ত্র তা করচো কি?

কিচু করতি তো হবে। তোমরা নয় হেসে খালাস। পেট তো আমার। আমিই দেকব।

আর ঝা কর, আইনসিংকলা ভাঙতে যেও না। তোমরা তো বোজো না কিচু।

একন তো বোজাবুজি নি আর।

হ্যাঁ, যা বলোচো। শুনবে আর মানবে।

ওরা বেরিয়ে যায়। সুবল বলে, একদিন শালা সব কটারে কুইচে কেটে গাঙে ভাইসে দে ফাঁসি যাই। আর সয় নে।

লখিন্দর বলে, রাখাল বাবু বলে শেষ অব্দি তাই হবে।

সে ঝন্থি সংগঠন কত্তেচে।

শুনবোখ'ন।

আজ তুমি আমাদের ঘরে খাবে।

কেন রে, হটাৎ ?

চাল এনিচি।

চাল কোতা পেলি !

বাসের হিসেব দেকচি না ক' দিন ?

তা তো ঝানি নি ?

কারেও বলি নি। বাঁদা কাজ তো নয়। পলটুবাবু ক'দিন অসুকে পড়েচে, তাই। গাংদাড়া মাচ, নক্কা আর চাল দেকে মা ঝ্যানো পাগল হয়েচে।

তা পাগল হবে নে ? চল্, তোরা ঝা। আমি চান করে এসতেচি। আজ এট্টু সাবান মাকব। সারা দেহে ঝ্যানো চিটে পড়েচে।

আর কি আটা নেগেচে চুলির জটে।

স্নান করে সুবলের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কুমড়ো সেদ্ধ আর গাংদাড়া মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেতে খেতে জগাই বলে। এমন দিন ঝদি নিত্য আসে !

লখিন্দর হঠাৎ বলে, দিন কি আসে ? তারে আনতি হয়। কিচু করবে না। খালি কচি ছ্যানার মত মা মা বলে কানবে, তাতে দিন আসে ?

সুবল বলে, বুজিচি। একোন খা দিকি।

তুমি খাও আর দুটো। তোমার তো মোটে জোটে নে। আমাদের তো তবু মা রোজকর চাট্টি আনে, সাত দিনে এক দিন

খাই। তোমার তো জোটে নে।

আর জুটতেচে! দেশের যত চাল সব পোঁটলা বেঁদে টেনে চাইপে কলকেতা ছুটতেচে। সরকারের পিরিতের সুয়ো বউ হয়েচে কলকেতা। তারে তুষ্ট রাকাই চাই। ডুমুর-থোড়—থানকুড়ো পাতা সতাসব্বস্বি কলকেতায় বাইতেচে।

লখিন্দর বলে চাঁহুদের কীত্তি শোনো। হিন্দি ছবি চলবে নে বলি তো এত চেল্লাচেল্লি কত্তেচে। আমারে বলল আজ যাত্তারা। কাল না দেকলি মরে যাব। তুই যেয়ে হিন্দি ছবির টিকিট চাট্টে কিনে রাক্। আমি বল্লু, না। আমার টাইম নি। চাগরির ধান্দায় যাব।

সে আর জানি না? উ না দেকলে আজ চুল, কাল চশমা, নিত্য নতুন শিকতেচে কোত্থেকে? যত ঢামনা কারবার। ধানজুড়িতে পারলি নি কাটপুরে ছিনেমা হল। না দেকলে ভাত ওটে নে গালে কারো।

এত কথার পর সুবল, জগাই, লখিন্দর সবাই 'জননী কৌশল্যা' যাত্রা দেখতে যায়। মাইকের সামনে শীর্ণ জগাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায় ও তাকে কিছু বলতে না দিয়ে চাহু ও দিলীপ, 'ইনিই ধানজুড়ির গর্ব শহীদ কৌশল্যার ছেলে। এনারা তকোন রক্তদান করিছিল বলেই আজ আমরা যুক্তফ্রন্ট কত্তে পেরেচি। আর যুক্তফ্রন্ট কত্তে পেরেচি বলেই অপারেশন-বর্গা আর ফুট ফর ওয়াক হয়েচে সে কতা মনে করবার। যারা এ কতা মানে না, তাদের চিনে রাকা দরকার।'—এই বক্তৃতা দিয়ে জগাইয়ের গলায় মালা ফেলে দেয় একটা। তারপর জগাইকে বসতে বলে দর্শকের আসনে।

জগাই গিয়ে বসে। সুবল তাকে বসায়। ধানজুড়ি ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ভেঙে লোক এসেছে। সাতদিন যাত্রা চলবে। নানা রকম পালা হবে। সকলেই জগাইয়ের দিকে একবার চায়। 'কৌশল্যা' নামটি অঞ্চলে খুবই পরিচিত। জগাই যে তার ছেলে তা সবাই জানে। কিন্তু কৌশল্যা একটি নাম। এত বড় ব্যাপ্তি সে নামের, যে আটা ও মাইলো সিদ্ধ খাওয়া মানুষগুলির মনের আয়ত্তে সে ব্যাপ্তি যেন আসে না। যাদের কথা তারা রাতদিন শুনতে

বাধা হয় তারাও কৃষকের যন্ত্রণা থেকে জন্ম নেওয়া, কৃষকের সে সশস্ত্র-জেদী, মহান সংগ্রামের কথা বলে না। পথের দু'পাশে বড় বড় হোর্ডিংগুলি কালো হরফে চিৎকার করে 'ধান রোপাইয়ের সময় আইনশৃংখলা ভঙ্গ করবেন না।' সেই তেভাগা কৌশল্যার তেভাগা এখন এক নিষিদ্ধ নাম।

জগাই নাম নয়, বাস্তব। কৌশল্যার ছেলে সে তাকে চোখে দেখা যায়। জমি নেই, জেরাত নেই। কাজ মিললে ক্ষেতমজুর, নইলে বেকার। জগাইয়ের কথা ধানজুড়ির মানুষ সব সময় মনে রাখতে পারে না। তেভাগার মহান সংগ্রামে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম পীটস্থান ধানজুড়িতে তেত্রিশ বছরের স্বাধীনতার কল্যাণে অধিকাংশ জনই জগাই। কে কারে মনে রাকতেচে? মানুষ আচে নিজের জ্বালায়। জমি নি, কাজ নি তা নিয়ে এট্টা কতা নি। কেন কতা নি বাবু? এ কতা শুদালি শুনবে আইনচেকলা ভাঙতেচো। বোবা হয়ে থাকো, তবে তুমি ভাল।

এত সব জ্বালাতেই কৌশল্যার সঙ্গে জগাইকে সম্পর্কিত করে নতুন চোখে তাকে দেখা হয়ে ওঠে না কখনোই।

আজ কিন্তু সবাই তাকায় একবার। জগাই ভাবে, এত ঝনা চেয়ে দেকতেচে হোতা। নে মালা দে আমারে মান্য দেল, তার নামে যাত্তার হবে এর মদ্যে বেপদ কি আচে? মা সপন দেকাল কেন?

যাত্রা শুরু হয়। বিপ্লবী নাট্যকারের লেখা পালা। জননী কৌশল্যা। দেখতে দেখতে জগাই সুবল ও লখিন্দর কাছে এসে ঘন হয়ে বসে। তেভাগার যে সংগ্রামে জগাই ছিল কিশোর, সুবল পূর্ণ যুবা। তাদের চোখের সামনেই সব ঘটেছিল, কৌশল্যার সাঁপুই-বাবুদের অসুমার শোষণ ছিল। ওরাওঁ সাঁওতালদের জমি কেড়ে নেওয়া ছিল, লাটদার চাষীদের জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরে নামিয়ে দিয়েছিল—সে জ্বালা ছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে যেন সর্বনাশের আগুন জ্বলল একসঙ্গে। সে সময়ের কথা সুবলের ভালই মনে পড়ে।

ভাবতে গেলে একটু অবাক লাগে সুবলের। তার মনে পড়ে।

হয়তো আমাদেরও পড়ে।

সে সময়ে দুঃস্থ ও নিরন্ন চাষীকে সাহায্য করতে এলাকা জুড়ে কত মহাজনের যে ভিড়। মন্বন্তরের আগেই এসেছিল সর্বনাশা বন্যা। সেই থেকে হাহাকার। তারপর মন্বন্তর। যাকে বলে মহামন্বন্তর।

তখন সাঁপুইবাবুর বাবা যাকে এক মণ খেসারি দিয়েছে, 'পাঁচ মণ ধান পেলাম' বলে লিখিয়ে নিয়েছে। যে দশ টাকা ধার দিয়েছে, সে একশো টাকার হাতচিটা লিখিয়ে নিয়েছে। তিনটে কাপড় যে দিয়েছে, সে তার দাম হিসেবে লিখে নিয়েছে পাঁচ থেকে সাত বিঘা জমি।

শেষে আর লিখে দেবার কিছু ছিল না। বাঁচার জন্যে এক-দেড় বছরের চুক্তিতে কতজন নিজেকে বিক্রি করেছিল।

কতজন তখন ফায়দা তুলেছিল। মহারাজা শ্রীশ নন্দী, সতীশ অগস্তি, শ্রীনাথ কর আর গোপী গিরি আর অন্নদা দাস আর বারিক সামন্ত আর বসন্ত মণ্ডল।

সেই দুর্ভিক্ষের কাজে সাহায্য করতে, রিলিফ দিতে কম্যুনিস্ট পার্টির আসা। সেই তাদের ডাক, হাতিয়ার ধরে লড়াই করো, নইলে কেউ বাঁচবে না। শোষণ উৎপীড়ন দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে হলে যারা শোষক, যারা শাসক, তাদের সঙ্গে লড়াই কর।

সেই তো সবাই কৃষক সভা সমিতির সভা হল। আর লড়াই তো করল কৃষক সমিতি।

কত, কত ক্ষেতমজুর এসেছিল সে যুদ্ধে। সেদিন সুবলরা জানেনি ক্ষেতমজুরের বাঁচা মরার প্রশ্ন আর কৃষক সভাকে একদিন ব্যথিত করেনি। তারা তো জোতদার আর বড় চাষীর বিরুদ্ধেও লড়েছিল। সেদিন সুবলরা জানেনি ধনী জোতদার আর ধনী চাষী হবে কৃষক সভার মস্ত খুঁটি।

তেভাগা—দুই ভাগ আমার এক ভাগ মালিকের। সে তেভাগা তো থাকেনি। লড়াইয়ের গতিপথে চাষীদের বুঝি মনে পড়েছিল, ক্ষেতমজুরের বুঝি মনে পড়েছিল যে এই জমি সেদিনও তার ছিল। আজ সে জমি থেকে অধিকারচ্যুত।

তাই তো জয়চাঁদের মত নেতারা, অঞ্চল নেতারা ডাক দেয়।

আর সব ধান ওরা ঘরে নিয়েছিল. ক্ষেতমজুররা পেয়েছিল জমি। তেভাগার নাম 'তেভাগা' ছিল। লড়াই হয়ে যায় অন্য রকম।

সব, স—ব সুবল আব জগাইয়ের মনে আছে. দুই নিরন্ন ক্ষেতমজুরের।

সামনের জগঝমপ ও ভীষণ চীৎকারের যাত্রাপালায় তারা এক নতুন তেভাগা দেখে, এক নতুন কৌশল্যা। এ কৌশল্যা ছিপছিপে তরুণী. এবং আসরে কোথাও কোনো ঘটনা বা সংলাপে তার স্বামীপুত্রের হদিশ থাকে না। পাপুইয়েব মতো চরিত্রগুলি এ যাত্রায় ভাঁড়। পুলিশ ও গুণ্ডা দলও ভাঁড়। এরা দর্শকদের হাসাতেই আসে।

সুবল নিচু গলায় বলে. দেকচিস।

জগাই মাথা হেলায়।

কৌশল্যা প্রথম থেকে একাই সংগঠন করে তেভাগা. দমাদম বন্দুক চালায়। তেভাগা সেনারা জেনারেল কৌশল্যার হুকম তামিল করে যায়। চারণগান গায় সে এবং নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে বিশাখা বসাকের সুললিত কণ্ঠস্বর ঝরে পড়ে। অবশেষে, মৃত্যুকালে কৌশল্যা বলে যায়. 'ওই, ওই দেখতে পাচ্ছি সব লালে লাল হয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি এসেছে জনগণের সরকার। দেখতে পাচ্ছি সে সরকার আমার এ রক্তদানকে বৃথা হতে দেবে না। সে সফল করবেই করবে বর্গাদারদের জমিতে স্বত্ব আর আধা ফসলের অধিকার। সে ক্ষুধাতুর নরনারীকে দিয়ে কাজ করিয়ে গম দেবে। সব দেখতে পাচ্ছি, আর আমার কোনো দুঃখ নেই।'

নিহত কৌশল্যার দিকে চেয়ে পুলিশ অফিসার টুপি খোলে ও হাঁটু গেড়ে বসে। বসেই থাকে। কেন না এটি সিনেমার ফ্রিজ শটের নিয়ম এবং যাত্রা এখন সিনেমার খুব কাছাকাছি।

আর বাজে এক বিপ্লব সংগীত। যে সংগীত না হলে আজকাল কোনো কাজ চলে না। এভাবেই শেষ হয় 'জননী কৌশল্যা' পালা। জগাইয়ের অতীব ক্লান্তি লাগে। মাকেও ওরা ব্যবহার করেছে। তেভাগা তাহলে চাঁদু আর দিলীপ বক্তৃতা দেবে বলে হয়েছিল?

এই জন্যেই মা স্বপ্নে এসেছিল অমন করে। জগাইকে বলেছিল, সব নে গেল জগাইরে—।

ওরা বেরিয়ে আসে ও ক্রমে সুবলের পথ ধরে। দিনে ভাত খেয়েছে আজ, রাতে খাবার প্রশ্ন ওঠে না। অন্য দিন নিষ্প্রদীপ আঁধারে শুয়ে পড়ে সন্ধ্যা রাতে। আজ এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না। ওরা কেউই কোনো কথা বলে না। নিজেদের জীবনের নির্যাতন ওদের ঘটেছে বহু দিনে, বহু বছরে। কিন্তু কৌশল্যা? সে তো তিরিশ পেরোতে মৃত। সে তো একটা নাম শুধু নয়, সে যে একটা বটগাছ। তার ছায়াতে ওদের মনটা আজও জুড়ায়। সেই কৌশল্যার সংগ্রামকে এমন করে দেখানো? কেন, কেন, কেন?

বাড়ি পৌঁছে ওরা ভূত দেখে যেন। রাখালবাবু। দাওয়ায় বসে আছে কুপি জ্বেলে।

তুমি?

কি মনে হচ্চে আমি নই?

না, তুমি তো হেতা নি অনেক কাল। আমাদের কতা আর মনেও নি।

সুবল কা, জগাই দা, লখিন্দর! ভাল, ভাল। আর কেউ আসবে না তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কত মন্ত্রী, কত মানিার লোক ঝেঁপে আসতেচে দু' বেলা। সুবলরে না দেকলি তারা মুকে ভাত তুলতি পারে না।

রেগে রয়েচো কেন? যাত্রা দেকে?

তুমি গেচলে?

পেচন থেকে দেকলাম।

ই কি? এর কোনো পেতিকার হয় নে? কে নেকে এসব পালা?

যিনি লেকে তিনি কত হাজার টাকা নেয় জানলে পরে মুচ্চো যাবে।

ঝানতে চাইনি। ঝার ঝা মনে নেয় নিক গে। একন আবুস্তা, অবস্তা নয়। যকন খুব দুর্দিন হতু, ওই জগাইয়ের বাপ বলতু, ওরে সুবল! এরে অবস্তা বলে নে, বলে আবুস্তা। তকন কি দিন গেচে! একোটা

কাপড় রিলিপে পেলাম। তা বেলেডে নম্বার দিকে আধা ফালি দিয়ে ওর বাপরে এক এক ফালি দিলাম, এক ফালি নিজে কোমরি জইড়ে খানিক কেটে জগাইরে কোমরি গেরো দে দেলাম। বোঠানের পরণে শত ছিন্নি কানি।

জগাই বলল, মনে আচে।

তবু সে সাঁপুয়ের ঠেঙে কাপড় নিতি দেয় নে। সাঁপুই কাপড়ের বস্তা নে ঘুরতেচে। কাপড় নে, কাপড় নে, জমি লিকে দে। বোঠান বলল, ও টোকা গেলি খাবে কি? কাপড় নিতি হবে নে। রিলিপে পাট্টির মেয়েরা ঘরে ঘরে ঘুরে দেকে কাপড় দেচে, তবে পরেচে।

বাবা তো সেই রাগেই কাপড়ের গাঁট কেড়ে নিচল আর বিলি করেছিল।

হাঁ গো! তুমি ঝে সেই বটুকের ছেলে, তা ভুলেই ঝাই। তকোন তুমি এতটুকু। কিচু মনে নি। বাপকেও মনে পড়েনে?

না।

সে জামাটা আচে?

সেই রক্তমাখা জামা? তা আর থাকে? মা মরে গেল। বাড়ি ঘর তো সন্নেসির গাচতলা হইছিল। দিদির ছেলেরা থাকে বটে। তবে তারা বোঝে এর মর্ম? সে আমি কবে গাঙে ভাইসে দিইচি।

আমারে বল্লে নে?

সুবল উসখুশ করেও কি বলতে গিয়ে বলে না। রাখাল বলে, তুমি ঝকোন বাবারে টেনে আনলে সুবলকা, তার আগেই বাবার হয়ে গেছল, তাই না?

আমি তো তা ঝানি না তকোন। সবে কিচুদিন হয় বোঠান, জয়চাঁদ, ভুগগামণি, রাইমণি গেচে—মাঝিপাড়ার অত জনা, তা বটুক বাবুরে খানিক ডরাতাম তো। তার জমিজমা ছিল খানিক। তা সত্ত্বেও সে মানুষ এসি আমাদের সাতে জুটছিল। খুব ভীমবল মানুষ ছিল। এক কিলে ডাব ফাটো জল খেয়েচে স্বচক্ষে দেকা।

শুনিচি। তকোন পুলিসের তাণ্ডবলীলে চলতেচে। ধানজুড়িতে পর পর ছাউনি তো। তা সেই সময়ে ঝেয়ে তিনি সতীশ মহাজনরে

কাচ থেকি মারবে তা কে ভাববে ? গুলি খেয়েও তিনি ছুটতেচে আর পেচন ফিরে গুলি কত্তেচে। আমি সাপটে নিতেই বলল, সুবল! মোরে গাঙে টেনে ফেলে দিস। রাকালের মা মানবেনে, পাল্লে জামাটা খুলে নিস, তাবে দেকাস। গাঙে ফেলে দিস। নইলে ঝদি জানে আমি মরিচি, তাহলি ওরা বুকি বল পাবে। জয়চাঁদ নি. আমি আচি বলে ঝানে। সতীশ আমারে দেকেচে, ওরা চেনে না। সতীশ ঃ আমি বন্নু খতম্। বাস্, আর কতা নি। টেনে বুনে ঝকন নৌকোতে নিইচি তকোন নফর হাড়ি বলে, কারে আনতেচ দাদা ? বটুকবাবু ঝে মরে গেচে গো।

তুমিই জামাটা আনলে।

না এনি পারি ঃ তোমার মাকে জামাটা দিয়ে দাঁইড়ে আচি আর তিনি মুকে আঁচল ঠেসতেচে। কানলে পাচ সবাই জেনি ঝাবে ঝে বটুক পাল নি। তা বাদে খানিক সামলে বলতেচে কারে বল নি। কি বুকের পাটা ছেল। ঝদ্দিন না সবে ঝানল, তদ্দিন কোনো কতা বলে নে, সিঁদুর পরেচে।

পরে অনেক কথা হয়।

কতা হইছিল, তিনি শোনে নি। বলিছিল, সে ঝদি অত বড় কতাটা কইতে পারে ঝে আমার মিত্যুর কতা ঝানিওনি, তা হলি তিনি ঝানতেচে আমি কেন বুকে পাতর চাপা রেকে সদবা সেজি আচি।

জগাই বলে, আর সে সব মানুষ হবে নে।

রাখাল বলে, যাক গে সে সব কথা।

লখিন্দর বলে, তুমি একা এয়েচো ?

হাঁ, একাই এলাম। একটু চা খেলে হত। চা আর স্যাকারিন এনিচি।

কাঠকুটো দিয়ে ছোট একটা তোলা উনোন সাজনোই থাকে সুবলের। অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ে সুবল চা করে ফেলে। বলে, স্যাকারিনের চেয়ে গুড় দে চা খেলি সোয়াদ মেলে। এ অমের্তো আর মুকে দিতে পারি না।

যাত্রা কেমন দেখলে ?

যাত্রা ? তা আর করবে না কেন বল ?—সুবলের গলায় হতাশা ও তিক্ততা ভরে ওঠে, সত্যি কতা বলতি কেউ নি। সেই দুক্কু, সেই কষ্ট এক্কন চতুগ্‌গুণ হয়েচে। কোনো এট্টা ঝারে বলে আন্দোলন নি। ঝারা ঝানত তারা অনেকগুলো মরেচে। ঝেগুলো আচে তারা মুক খোলে নে। ঝারা কিচু ঝানে নে তারা বলবে ঝা দেকলাম তাই সত্যি।

সেই জন্যেই তো যাত্রা পালা লেকা এবং করা আর একানে দেকানো।

চাদু এট্টা পার্টা বললি হয়। তার চেল্লানি কি। অপাসমসকিতি রে, হেন রে তেন রে।

সুবলকা, সময়টা এসেচে। সময়টাকে বোঝো দিকি। এই যে দেকলে, এতে এক সঙ্গে কত কাজ হল। যার নামে পালা, তার তনা রকমে দেকানো গেল। পুলিস আর জোদ্দার আর গুণ্ডাগুলোকে করে রাকল ভাঁড়। তাতে মনে হবে—আচ্চা, এরা তো তেমন বজ্জাত নয়; তবে এদের ওপর আকোচ করে কি হবে? তা বাদে দেকলে না? কৌশল্যা বলচে, শুদু হাতিয়ার তুললে হবে না। কৃষক সমিতি বলেছিল তেভাগার দাবী। আমরা করলাম জমি দখলের লড়াই, তেভাগার সাতেসঙ্গে, তাতে আনলাম ক্ষেতমজুরের দাবী। উপযুক্ত আর শক্তিশালী সংগঠন কত্তে হবে।—তার মুক দে এ সব কতা বলাবার মানে বোঝ?

বুজতেচি রাখাল, সব বুজতেচি। তোমার কতায় ঝানো সপষ্ট সকল বুজতেচি—জগাই বলে, তাতেই মা মোরে অমন করে ডেকে গেল আতে। নে গেল নে গেল জগাই রে! সে ডাক একনো বুকে বাজতেচে।

মা ডেকে গেল?

যা ছিল তার একার, গোপনে রাখার মত—তাই এখন জগাই টেনে আনে বাইরে, তার একমাত্র ঐশ্বর্য। আবার সে বলে, আমাদের ওপরে ঝকোন চোট আসে কোনো—তকন সে নিযাস দেকা দেবে আমারে।

কেমন করে?

সব ঝামন কালি ঢেলে দেবে কে—চরাচর ঝামন আঁধারে

ন্যাপাপোঁছা। কোতা চিকুর হাসতেচে আব মা আসতেচে সগল কিচুর চেয়ে বড় হয়ে—তার অক্তমাখা চুল উড়তেচে আকাশে, একো হাতে পেট চেপে ধরেচে ঝ্যামন, অক্ত ঝোঁজাতেচে কি! আর হাত শুন্য পানে উটো ধরেচে, তাতে অক্তমাকা কাস্তে। মা নাড়ী ছিঁড়ে ডাকতেচে, নে গেল, নে গেল, সব নে গেল জগাই রে।

তাই! তুমি ঠিকই দেকোচো।

সগল সময়ে দেকব।

কেমন?

খাদ্য আন্দোলন হইচিল কবে গো? তকনো করনট হইনি। সেই ঝে কেরতাস্থ বাবুরা আমাদের নে শহরে গেল? খুব গুলি চলল, নোক মরল কলকেতায়? হেতাসেতা ছুটতেচি, পালাতেচি, কেউ বলে নে কোতা ঝাব, সুবল কা ছিল বলি রক্ষে। উনি ঝানত সব। আমাদের কত ঝনারে নে ইদিকি পালায়, উদিকি পালায়।

হ্যাঁ, ১৯৫৯ সালে।

তুমি ঝাওনে তকন?

সুবল বলে, ওর তকন বয়েসটা কি? ইস্কুলির ছেলে বই তো নয় একদিন গাঙে ঝাঁপাই এগলা। খর সোত, জলে টান কি? ভয় নি এট্টু?

রাখাল বলে, তুমি টেনে তুলে এক চড় মাল্লে।

মেরেছিলাম? তা হবে।

জগাই বলে, সে আতে, সে কি ভুক্কের আত গো! কার বা বাড়ির সামনে ফুটপাতের বসে আচি সগলা। চক্কে কি ঘুম আসে? কত ঝনা এলাম, কত ঝনা নিকেশ হল কিচু জানি নি। তবু ঝ্যামন চক্কু মুদেচি, অমনি মা!

রাখাল আস্তে বলে, আরো বল?

আর সে জমি খালাসীর আন্দোলনটা কবে হল? কিচু মনে থাকে নে রাখাল, সনসাল মনে থাকে নে। তকন তুমিও জোয়ান, আর এ লখাটা ঝাড়া দে উটেচে। সেই যে লাতুপুরে সম্মেলন হল? আমরাও গিচলাম।

রাখাল বিষণ্ণ হাসে। বলে, হ্যাঁ, ১৯৬৮ সালে। সেবারই খুব

জমি নিয়ে কতা হয়।

সুবল বলে, বাপ্ রে কতার ঝ্যানো ইমারত তুলে দিল। কতার ঝ্যানো ধানগোলা উটো দিল, কতার ঝ্যানো ধান তুলে দিল গোলায়। তেভাগার পর এতকাল বাবদ এই শুনলাম বিষ্টুবাবু, ওঃ, চেল্লায় বেস্তর। বিষ্টুবাবু বলতেচে জমি দিতি হবে।

রাখাল বলে, না। বলেছিল মৌলিক ভূমি সংস্কার আমাদেরও লক্ষ্য। এখন নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজ করতে হবে আমাদের। খেতমজুররাও থাকবে সে আন্দোলনে। তোমরা খেতমজুর হিসেবে গিইছিলে নয়? চয়শো ছিয়াত্তর জনার মদ্যি একাত্তর জন ছিল খেতমজুর। তার মদ্যেই গিছিলে?

আর কেমনে ঝাব? জমি ছেল? বর্গা আন্দোলন আবার বিষ্টুবাবুর মত সজনীবাবুরাও করচিল বলি শুনলাম।

রাখাল যে কথা সেদিনও বলতে পারত না, আজ তা বলে। সেদিনও তার মধ্যে ছিল অসীম পার্টি বিশ্বস্ততা। আজ সে মনে করে সত্যভাষণে নিজেকে অকুণ্ঠভাবে মেলে ধরবার দরকার আছে।

রাখাল বলে, লাতুপুর সম্মেলন হয় ১৯৬৮ সালে। ১৯৬৭ সাল থেকে জমির দাবীতে, নানা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দার্জিলিং জেলার নকসালবাড়ি অঞ্চলে কৃষকেরা আন্দোলন শুরু করে। হাতিয়ারবন্দী লড়াই ছিল। ১৯৬৭ সালেই বহুজন মারা পড়ে। তা বাদে সে আন্দোলন বহু জায়গায় চলে।

একেনে?

নানা জায়গায়। অন্য রাজ্যেও।

তারা সব জোতদার-মহাজনরে কেটিছিল, পুলিস মেরিছিল, নয়?

হ্যাঁ।

আর তাদেরও খুব মেরিছিল সবাই। নয়?

হ্যাঁ।

তারা কি বলিছিল?

কৃষক আর শ্রমিকের রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের কতা। সে জন্যেই আন্দোলন শুরু করে।

কতাটা তো ভালই ছিল, কিন্তু তারা এগলা পড়ি গেল, নয় আর সবাই তাদের মাত্তে উটল।

কতকটা তাই। আমরা তখন অন্য পথে আন্দোলনে বিশ্বাস ছিলাম। আর যে জন্যে তারা লড়াই করে, সে তুক্ক তো ঘরে ঘরে আমরা, বলতে পারো, আমার বিশ্বাসে বলে, নকসাল আন্দোলনটা ঠেকো দেবার জন্যে লাতুপুরে জমি দখলের কতা বললাম। তাতে সাড়া মিলল বিস্তর। জমি বলতে খাস জমি, জবর দখল জমি। কিন্তু জমি বচরখানেক দখল চলিছিল। ইদিকে মাতন লেগে গেল, তাতেই নকসালীটা ইদিকে হয়নি। আর সে জন্যেই পর বছরে হেলেদা সম্মেলনে দেকা গেল খুব সদস্য বেড়েচে কৃষক সভায়। চব্বিশ পরগনা থেকে বিস্তর জনা সদস্য হল।

সুবল হাসে, জগাই হাসে সে কথা মনে করে। জগাই বলে সেই তো কতকাল বাদে ছোলেমান, আবু, কলিম, এদেরকে দেকলাম খানিক জমি উদ্ধার হইচিল বটে। ছোলেমানরা মেচো ঘেরি জমিও খানিক পেইছিল।

সুবল বলে, আর সুমোহনবাবুর তড়পানি কি। হেলেদায় তিনি সমানে একঝনারে দেকাতেচে আর বলতেচে, দেক দেক! নকসালদের পত কি পত? সে পতে কিচু মেলে নে। ইনি তো নকসালী করে গিইচিল, ঘুরে এয়েচে। বাপু হে! ফরন্ট যা কত্তি পারে, নকসালে তা পারে? আর সে কতায় সবাই তালি মাত্তেচিল।

হাঁ রাখাল, সে জমি ধরি রাকত্তি পেরিচিল? ছোলেমান তো শুনি তখন মজুর। তারা সকল জমি দকলে রেকে দেবে?

তাই বল! হটাত আন্দোলনটা হল কেন, অনেকদিন ভেবেচি। হলও তাই। ঝপ করে উঠল, ধপ করে পড়ল।

রাখাল তিক্ত হাসে, তকন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না কারো। দুই কম্যুনিষ্ট পার্টি, সোস্যালিষ্ট পার্টি, জনসংঘ, সবাই যেয়ে একসঙ্গে হয়ে "জমি ছিনাও" আন্দোলন তুলে নকসালী ঠেকো মারল।

সুবল বলে, তকন তুমি পার্টির ন্যাতা একেনে। তাতেই আবারো সাঁপুই পিচলে বেইরে গেল। ছোলেমানরা জমি পেল, সে

ছিল কংগ্রেসের ন্যাতার জমি। সাঁপুই ঝে আমাদের সব্বস্ব নিয়ে গিলে বসে আচে—তার বেআইনী জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে আমরা ধান কেটে নেলাম, বীজ ফেলব ভাবলাম আবার—আর তোমরা বললে, কর কি, কর কি, উনি ঝে ন্যাতা। সেই কেত্তন আজও চলতেচে রাখাল! দেক! আমি মাজে মোটে ঝাইনি কৃষক সভায়। লাতুপুরে ঝাই তোমার কতায়। আর সিদিনে তোমার কতা শুনেও জমি কামড়ে ছিলাম। ঝকোন সাঁপুই পুলিস এনে ঠেঙিয়ে তুলল? ঝকোন তোমরা বললে অন্যত্তর চলো জমি দকল নেবে? সিদিনে বললাম, আর নয়।

ক্ষ্যামা দাও।

কোতা গিইছিলে?

কলকেতা। ছেলের উপদ্দোরব থেকি বাচতি।

জগাই বলে জমি নিলাম, জমিতে দকল। আর মনে কি চিন্তা! রাকতে দেবে? রাকতে পারব? আর মা এল জগজ্জোড়া হয়ে সগল ঝানো ঝেঁপে।

রাখাল বলল, এটা তো বোঝাই যায় জগাইদা। যকন তোমার মন অশান্ত হয়, মন এট্টা আচ্ছয় চায়। তেভাগার কতা মনে পড়ে তোমার। কেন না তুমি জানো। সেই যে তেভাগা, যাতে ফসলের ভাগ নয়, জমির দখল নিইচিলে তোমরা, তাই হল আসল পত। আর তেভাগা তোমার মনে মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েচে। এণ তুমি বোজ, যে তোমার সকল দকল ধুলোবালি হয়ে যাচ্ছে এ্যেকক চোটে। তাতেই সপন দেক।

তবে তাই! আমি ঝানি না।

একন কাজের কতা বলি। সময় তো বিস্তর যাবে গো। ঘরে কি ফিরতে পারবে?

লখিন্দার বলে, তুমি আসবে ঝকোন খবর পাট্যেচ, তকোনি মারে বলে বেইরেচি। সুবল ও জগাই তাজ্জব বনে যায়।

অ্যাঁ? ঝানতিস তুই?

রাখাল বলে নিশ্চয়।

আমাদের কিছু বলে নে গুয়োটা?

বলবে কারে? ইনি খালি কালীর গান কত্তেচেন, উনি মা মা কত্তেচেন।

কালীর গান? হাঁা সুবল কা?

আহা, ওই গানটা গো!

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভোমে মাটি দিয়ে—

গানটা জগাইয়েব বড় পচন্দ গো!

জগাই বলে, হাঁা রাখাল! কত কতা শুনলাম, এবারে বিষ্টুবাবুরা কলকেত্তায় নানা-নিদি মুত্তি বসাবে—মায়ের, জয়চাঁদের, সগল জনার—শুনোচো কিচু?

না, খবরও রাকি না। মূর্তি করে কি হবে? সেই চোর আঁদাড়ে জীবন কাটে যদি? যে এলাকার যে মানুষের যে লড়াইযের জন্যে তিনি জীবন দিল, সে কাজ যকোন কত্তে পারা যাবে তকোন সেই বাদা জমি, নিশত্তুরী পাকা ধান, সগল হবে কৌশল্যা। যেদিক পানে চাইব, সেদিকে কৌশল্যা।

বল, কাজের কতা বল।

আট্টু চা কর দিকি।

শুদু চা?

তবে ছাতুটা নাও, নুন আচে ত?

ছাতু এনোচো, চাল এনোচো, থাকতি এয়োচো নাকি আবার? সবাই তো তোমার তরে কি আকুলিবিকুলি করে। বলে, রাখাল থাকতি কেরোচিনি রে, ফুট ফর ওয়াক রে দুটো কতা আমাদের ঝক্কি বলার লোক ছিল। সে গেচে কোতা? চাতুর হাতে আমাদের সমপ্পন করে? ওরাওঁরা তো ক ঘর মোটে। তারাও বলে।

থাকতে আসি নি গো। নিয়ে যেতে এসিচি। চাল কটা দেকোচো?

হাত দাও, হাত দাও দুজনায়ই!

কেন গো?

হাত দে দেক।

দেলাম।

এ কোন চাল জানো ? এ সামান্য নয় গো। এ চাল কেনে এত টাকা কারো নেই সংসারে।

বলবে তো ?

লখিন্দর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারে না। বলে ঠাগমার জমি, ঠাগমা এ চাল দেচে।

কি বলিস তুই ?

নিয্যস বলি। ঝেতা হোক, সেতা জমির দকল নেচে রাখাল দা'রা, ছোলেমান চাচারা এ জমিতে নাঙল দেচে, তবে ঝেয়ে ধান উটেচে। কয় বিঘা জমির নাম ঠাগমার নামে, জয়চাঁদের নামে, রাইমণি আর দুগগামণির নামে।

নিয্যস ?

নিয্যস।

হাঁ। রাখাল, বল কিচু :

চাল কটা রাকো। খেয়ে নিই এটু।

ওরা বাইরে যায় জলত্যাগে। রাখাল হাত মুখ ধোয়। তারপর ছাতু মাখে, সবাই খায়। চা। জগাই বলে, আমদের লখাবাবুরে দেকো। নিতা উনি নাক ডেকি ঘুমোয় সাঁজ থেকি। ওর মা বলে কুম্ভকন্ন জন্মেচে।

লখিন্দর বলে, আজ এটা দিনির মত দিন নয় ? তোমারে বলিনি ? ঝে দুর্দিনটা ডেকি আসে, সুদিনটারে ডেকি আনতি হয় ? তা সে কতা শুনব না ঘুমোব ?

রাখাল হেলান দিয়ে বসে দাওয়ায়। বলে, পার্টির কাজকম্ম ছেড়ে বসেছিলাম প্রথমটা। আমার মত মন ভেঙে গিচল অনেকেরই। সুতা-পুর পঞ্চায়েতের গোলমালের পর কে এল বল দিকি আমার কাচে ?

কে ?

সুমোহনবাবু।

বল কি !

অনেক দিনের লোক সে।

হ্যাঁ, আর কোনো বেঁকাপতে ঝায়নি।

সেই সুমোহনবাবু এল। বলে, রাখাল, মন মোর ভেঙে গেচে। এত বচর ধরে কৃষক সভা করচি, আর কিচু জানি না। কিন্তু একন আর মনে ভরসা নেই কোনো। একদিনে নয়, অনেক দিনে কতা হয়।

আর কে ছিল?

সুমোহনবাবু, কৃতান্তবাবু, ছোলেমান, আবু, জয়চাঁদের ভাগ্নে মৃন্ময়, এদের চিনবে। আর যারা, তাদের ছেলেমান এনেচে। তাদের চিনবে না।

কি কতা হয়?

অনেক কতা। দশ বচরের হিসেব এনে দেকাল সুমোহনবাবু। দেকে মাতা কাটা গেল অপমানে আর লজ্জায়। আমরা অঞ্চলের হিসেব জানতাম, তল্লাটের হিসেব জানি না। একে তো ভালো করেই বুঝিছিলাম যে কৃষক সভা করে কোনো মতে পারচি না সব্বনাশ ঠেকাতে। মুকে বাজাচ্ছি জয় ঢাক, আর উদিকে সব্বনাশ হচ্চে।

হবে নে? তকন সে কতা বললি, উঃ!

সুমোহনবাবুর হাতে ছিল এট্টা ছোড়ান। সেটা ছুঁড়ে মেরেচে মাটিতে আর চেল্লাচ্চে কত!

দেকে ঝ্যানো সম্বিত ফিরে পেলাম।

কি দেকলে?

একষট্টি থেকে একাত্তর, দশ বছরের হিসেব। চব্বিশ পরগণা আর সুন্দবনের চাষীর সংখ্যা কমচে সমানে, খেতমজুরের সংখ্যা বাড়চে হু হু করে। সুন্দরবনে পাঁচ লক্ষ্য তিরিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর জন মানুষ থাকে। তার মধ্যে দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দু ছাপান্ন জনা খেতমজুর? এ অবস্তা একদিনে হয়েচ?

কত বচর ধরি চেষ্টা চলতিচে রাখাল, হবে নে অবস্তা? ঝত বার বলিচি, তোমরা তো খালি মিটিন্ কত্তিচো, দাবি দিতিচো, ইদিকে ঝে সব্বনাশ হয়ে গেল।

তাই দেখলাম। কৃষক সভা করেচি, অনেক কতা শুনেচি, যা শুনিচি তাই বলেচি তোমাদের। কিন্তু কৃষক সভা যদি ছোট চাষীর স্বার্থ দেকত, তা'লে এত মানুষ খেতমজুর হয়? সভা দেকেচে বড়

চাষীকে, জোতদারকে, মধ্য চাষীকে। সাফ কতা। আজ বর্গাদার বলি এমন সোরগোল! কত জনা ন্যায্য রেকড করাতে পারচে?

সাঁপুইদের জমি ভেস্ হচ্ছে?

না কখনো নয়।

আদালতে ঝেয়ে আটকে থাকচে নে—

বহু জনের এমন হয়েচে।

বর্গারে বোজালে তোর নাম রেকড কইরে দোব, মালিকরে বলালে, আপনার বাঁইচে দোব। নাম লেকাক, ঝেয়ে আদালতে দরখাস্ত দেন—এমনি করে এর থেকে নেচে, ওর কাচে নেচে এমন কত ঝনার হয়েচে সে হিসেবের বুজি শেষ নি।

তাও সত্যি।

খেতমজুরের কতা কে ভাবলে?

ভাববে কেন? আর সকল রকমে আন্দোলনের পত বন্দ করতে এত কৌশল। কৃষক যাতে জমি না চায় তাতে ভাতা দিচ্চে। কয়টা টাকা দিলে, জমি দকলের কতা সে ভুলে রইল, ভোটের কালে ভোটটা দিল। এই তো! আর চাঁতুর মত লোকদের হাতে যাচ্চে সব্বস্ব ক্ষমতা। ঘুরে ঘুরে দেকলাম তো। ব্লকের গ্রামসেবকরা বলে। ব্লকের আর মাতাব্যতা নেই কিচু।

ঝ্যানো কবে ছিল!

একন পঞ্চায়েত চোক রাঙিয়ে যা বলবে তাই হবে। অপিসার তাতে সই করবে। দারোগা চলবে পঞ্চায়েতের কতায়। আর টাকা-পয়সার সাগর-সুমুদ্দুর পঞ্চায়েতের হাতে। আর কোনো কতা নি।

খেতমজুর না কি দশ টাকা পাচ্চে একন—শুনে বলি সে কোতা? কোন সগ্গে?

যদি পায়, কোনো দু-পাঁচটা জায়গায় পেতে পারে। যেকানে মজুর কম, পান-আলু কষ্টের চাষ। অন্যত্তর? ঘুরে ঘুরে দেকলাম সব।

কি দেকলে?

কোতা দেকলাম পাঁচ সিকে বা দেড় টাকার ওপর মজুরি নেই। সঙ্গে এক কিলো চাল দিচ্চে।

তা'লে ধর সবশুদ্ধু সাড়ে তিন বা চার টাকাই হল। তার ওপরে তো ওটে নে?

না না কোতায়? জমি একভাগের। খেতমজুর আট ভাগ মানুষ, এই তো হাল।

কোনো আন্দোলন নি?

আন্দোলন? না না, করতে দেবে কেন যদি কোতাও খেতমজুর দাবি করে মজুরি ওটাচ্চে, কৃষক সভা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মিচুয়াল করে দিচ্চে।

এ সব কোতা দেকলে?

নানা ঠেঙে দেকলাম। কত জায়গায় আদিবাসী বিস্তর। তারা মজুরি চাইলেই বলতেচে ঝাড়খণ্ডী করচো?

এ সব জায়গায় কেউ লড়ে নে?

এক সময়ে পার্টি দুটো, তা বাদে লড়িছিল নকসালরা। নকসালরা খেতমজুদের হক নিয়ে জবর লড়িছিল।

তারপর কি করলে?

সুমোহনবাবুদের সঙ্গে কি একদিন কতা বলিচি? অনেক দিন ধরে অনেক কতা হয়েচে।

কতা তো হয়ই, কিচু পত হল?

সুমোহনবাবু বলে, বসে থাকব রাখাল? এটা প্রাশ্চিত্তির করব না? কৃষক সভার কতা বলে বলে আমরা তো ওদের সঙ্গে বেইমানি করিচি। তেভাগার জন্যে এত রক্ত দিল যারা, তাদের এই অবস্তা?

ঝাক, এ কতা যে কেউ বলেচে তাতেই আমার বুকটা জুইড়ে যাচ্ছে। ককনো ভাবিনি এ কতা শুনব।

কি করা যায় ভাবতে ভাবতে এমন অনেক রাখাল, অনেক সুমোহনের সাক্ষাত মিলল।

এই করতেচ আজ এক বচর ধরে?

এই করতেচি, তা বচর ঘুরে গেল।

হল কিচু?

ননীর নাম তো জানো।

তোমার কেমন ভাই হতু না?

হ্যাঁ। জ্ঞাতি ভাই।

নকসালী করিছিল, নয়?

না না, কোনোদিন নয়। তবে দল ওর ছিল, আচেও। সে আমাদের সঙ্গে কতা বলতে চাইল।

গেলে?

গেলাম।

সে কোতা?

পরে বলচি।

ঝাক, শুনি। জগাই কি বুজচিস?

বুজচি তো ভালোই। একন সবদিক খাগলে বাচি। ঘরপোড়া গরু হইচি, আঙারি মেঘ দেকলি ডর আসে।

বল গো রাখাল।

রাখাল বলে যায়।

ননীর সঙ্গে কথাও তার একদিনে হয়নি. বেশ কিছুদিন লেগেছিল। ননীকে দেখে সে মোটে বোঝেনি ননী যে আদিবাসী নয়।

ননী বলল, লোনা গাঙে চান কর, রোদে ঝালাপোড়া হও, তোমার চেহারাও এমনি হবে।

গায়ে জামা নেই, হেঁটো কাপড়, খালি পা।

নইলে যাদের মদ্যে আচি তাদের কি বশ আসবে?

হাতে লাঠি নিয়েচো।

সাপের চাষ দেচে যে।

সাপ তো চালান দিচ্চে খুব। চামড়ার জন্য মেরে ফেলচে ধড়াধড়।

যেতা আচি, সেতা সাপের চাষ।

ওঃ, গোহাড়গেলে, পাখির ডিম, সব চালান দিচ্চে।

সেতা নয়।

গলায় কি পরোচো?

দিল এক বুড়ি ভালবেসে পরিয়ে। বলে এ গলায় থাকলে তোমার কিছু হবে নে। না পরলে সে মনে দুক্কু পাবে।

কান্না জুড়বে। বিস্তর কাঁদতে পারে।

বিশ্বেস না কর তো পরোচো কেন ?

ননী হাসল। বলল, ওরে দিয়েই খোলাব। আমি খুললে তো ওর বিশ্বেস নষ্ট হল না ? আমি মাদুলি মানি না তাই প্রমাণ হল। বুড়িরে দিয়ে খোলাব আর দেকাব যে দেকো মা, কোনো বিপদ হয়নি। তাতে ও মানবে।

নাও, একন বল।

কতা কি ঝপ করে হবে ?

ঝপ করে হবার কতা নয়, ঝপ করে হয়নি। দুই দিন দুই রাত ধরে কতা হয়।

ননী প্রথমেই বলল, ও সব হিসেব-টিসেব বাজে। দু লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো সাতাত্তর জন চাষী তো হিসেবে। এর মদ্যে এক লক্ষ এক হাজার চারশো উনষাটজনের জমি কত জানো ? মাতা পিচু বারোশতক। তাও আচে, কি আরও কম। এদেরকে 'জমি আচ' বল্লে ঠাট্টা করার ব্যাপার হয়। এরাও খেতমজুর। এটুকু জমিতে কি আর ফসল পাচ্চে তা বল ?

ননীদের হিসেব খুব সোজা। ওরা নিজেদের নকসাল বলে না। কিন্তু ভোটের লড়াই বাজে লড়াই। সে করতে গেলে সময় নষ্ট। ভোটের লড়াই জিতে গদীতে বসলে সবাই মানুষকে ভুলে যায়।

এ রাজনীতিতে ওদের বিশ্বাস নেই। এখনকার রাজনীতি। কয়েক লক্ষ লোককে নানা কৌশলে কিছু পাইয়ে দেবার রাজনীতি চলছে সব রকম আন্দোলনকে বন্ধ করে দেবার রাজনীতি। গ্রামকে শোষণ করে কলকাতাকে সুখে রাখবার রাজনীতি। নিজের দলের সং ও বিবেকী কর্মীদের বাদ দিয়ে নীতিহীন মস্তান ও শোষক শ্রেণীকে গ্রাম জীবনের বিধাতা করে দেবার রাজনীতি।

বোঝাই যাচ্ছে, ভাবধারার দিক থেকে এই কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি কংগ্রেসের মতই দেউলিয়া হয়ে গেছে।

এ এমন এক সাধারণ লোকের সরকার। যার প্রচার চলে আকাশ ফাটিয়ে। কিন্তু কার্যকালে এ সরকার আর কংগ্রেসে তফাত তেমন কিছু নয়। যে যত খুশি জমি রাখছে, জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীনকে

দেবার কথা বলার হিম্মত এ সরকার রাখে না।

রাখাল যেন কথাগুলি বুঝে দেখে।

ঘেরি-ভেড়ি-জমি মালিকের পোয়াবারো আজ। ঠিকাদার-কালো-বাজারি মুনাফালোভীর পোয়াবারো আজ। প্রতিবাদ করার ব্যাপারটি সরকার মুছে দিচ্ছে। কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ মানে আইনশৃংখলা ভঙ্গ করা।

কেন্দ্রের ঘাড়ে সব দোষ চাপানোর মানেই হল নিজেদের ব্যর্থতা-গুলি থেকে লোকের মনোযোগ সরিয়ে দেওয়া।

ননীর কথা শেষ হলে সুমহনবাবু বলেছিল তবে কি, সশস্ত্র বিপ্লবের পথ? হিংসার পথ?

ননী বলেছিল, এ নিয়েও অনেক কথা হতে পারে। তা বলা দরকারও। সে কি একদিনে হবে?

নয় কেন? পার্টি আমাদের অনেক কাল ধরে টুপি পরিয়েছে। আর পরতে রাজী নই।

হিংসার পথ মানে কি?

ভাল করেই জানো।

হাতিয়ার ধরা?

যদি বলি তাই?

তেভাগা যখন করেন তখন কি বেলপাতা আর তুলসীর মালা নিয়ে নেমেছিলেন?

না, তা নামিনি।

কবে, কোন কৃষক আন্দোলনটা হাতিয়ার ছাড়া হয়েছে বলে দিন। এ করে আপনি তো চুল পাকিয়ে ফেললেন।

করে কি হয়েছে?

'হয়নি' মনে করেন, না 'হয় না' মনে করেন?

হয়নি মনে করি।

হয়নি, কেন না সংগঠনের জোর ছিল না। তেভাগার মাটিতে জন্মকর্ম আমারো। বটুক পালের বংশের ছেলে আমিও। তবু বলব, তেভাগার লড়াই যে অমন সাড়া জাগাবে, চাষী আর খেতমজুর হকের

জমি ফেরত চাইবে, মা-বোনেরা দা-কাটারি নিয়ে রুকে দাঁড়াবে, জান দেবে সবাই অকাতরে—তা সেদিনের কম্যুনিস্ট পার্টি ভাবে নি। সংগঠন, পার্টি, নেতৃত্ব, পরিচালনা কিছুই সে তেভাগার জন্যে তৈরী ছিল না।

তাতে কি বোঝা গেল?

তারপর থেকে দেখুন। পার্টি তো ক বছরের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবকে, সে লাইনকেই দোষ দিল। বলল ও পথ ভুল। ঠিক হল দাবিদাওয়া জানাবার আন্দোলন। ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন মনে পড়ে?

খুব মনে পড়ে।

খাদ্য নেই, মিছিল করো, কেড়ে নিও না। মিছিল করতে করতে, ডেপুটেশন পাঠাতে পাঠাতে, দাবী জানাতে জানাতে ছোটরা বড় হয়ে যায়, গেলও। এত মিছিল বের করলে তার একটা ফল দাঁড়ায় বটে। কিন্তু শান্তির পথে চলতে চলতে ছোট চাষী জমি খোয়াতে থাকে, বর্গা উচ্ছেদ হতে থাকে, খেতমজুর বাড়তে থাকে।

নকসালরা হিংসার পথ নিইছিল।

আমরা নকসাল নামে নিজেদের ডাকি না। কিন্তু নিজে ভেবে দেকে বলচেন কি কথাটা?

স্বাধীনতার পর থেকে সরকার দেশ জুড়ে যত লোক মেরেচে, আজও মারচে, তা হিংসা নয়, অহিংসা? হাতিয়ারে বিশ্বাস করে না কে? আপনারা করেন নি?

তাহলে কি বল।

এগুলো ওপর-ওপর কতা হচ্চে বই তো নয়। তাতেই বলচি। হাতিয়ার ছাড়া লড়াই হয় বলে আমরা বিশ্বাস করি না। যকন তেমন লড়াই বিফল হয়, সে জন্যে অন্য কোনো ভুল দায়ী। হাতিয়ার নয়। সর্বহারার হাতের হাতিয়ার ভুল করে না।

আমাদেরও বলার আছে।

আমরাও শুনতে চাই। তবে গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো, আমরা জমির মালিকানা এক ভাগের হাতে রেখে, আসল সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে হাজারটা থাপাচাপি দিয়ে মানুষের দুঃখ দূর করার

ধাপ্পা বিশ্বাস করি না।

সুমহনবাবু বলেছিল, তুমি তো ভারি সপষ্ট কতা বল হে ননী।

অ্যাঁ? সব সাফ সাফ?

অনেক তত্ত্ব বুঝতাম না। একন তত্ত্বটা মাটিতে আর মানুষে প্রয়োগ করে দেখছি। তাতেই কতা ছাঁটাকাটা হয়ে উঠেচে। কথা তো অনেক হল।

আমরাও তাই চাই।

অনেক কথা হয়। শেষ অবধি ন্যূনতম এক কার্যসূচীর ভিত্তিতে ওরা মিলিত হতে পেরেছে।

খাস জমির দখল সে সূচীর প্রথম কাজ। সে কাজই হয়েছে সুতুরজংপুরে। তারপর তেমোহনায়। না, সকলকে জমি দেওয়া যায় নি। ঘর তুলে দেওয়া গিয়েছে কয়েকশো ভুমিহীনকে। আর চাষের জমির ধান এখনো সবাই ভাগ করে নিচ্ছে। আন্দোলন জোরদার হবে, জমি ছিনিয়ে নিয়ে ভাগ করে দেওয়া।

সব শুনে সুবল বলে, তকন বাধবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

যুদ্ধ কি তকন হবে?

হ্যাঁ।

একন কি করচ?

সকল জানা কয়েকজনা জানলে হবে না সুবলকা। সকলারে জানতে হবে।

কেমন করে? হ্যাঁ রাখাল?

যেমন করে জানা যায়।

সগলারে নে বসতোচো?

না। পড়তে শেকাচ্চি।

তা বাদে?

পড়তে শেকো, নিজে পড়, নিজে জানো।

ওঃ, তা কি হয়? তা হয় নে।

খানিক হয় বই কি। লখারে শুদোও।

সুবল ও জগাই বোঝে লখিন্দরের সঙ্গে অনেকদিন ধরে যোগাযোগ আছে রাখালের। জগাই তার ছেলের রীতিকরনে বড়, অবাক হয় ও ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, এ ছোঁড়া কিছু বলে নে এতকাল ?

সুবলও নতুন চোখে লখিন্দরকে দেখে সে বলে, জেটকুলি ঝ্যামন দ্যাল আঁকড়ি ঘোরে, লখা তো তেমনি আমার সব্বস্ব দেহে বাইত সিদিন আবুদি। তার মনে এত ফন্দি হয়েচে কে ঝানে ?

লখিন্দর বিরক্ত হয়ে বলে, বলবে কারে ? মারে দুটো কত্তা কইবার উপায় নি। কুস্তে নে মারত্তে আসবে। বলবে এত ঝানিস যদি, দুটো পয়সা আনত্তে কি হচ্চে ? তুমি আচ মায়ের গানে, উনি আয়ে মায়ের ধ্যানে। আর এ কত। ইনি হুকুম না দিলি আমি বলতি পারি ?

ঝাক, বলেচো ভাল, না বলেচো ভালো। তুমিও ভাল আমিও ভেলি—ভালয় ভাল মিশে গেলি। একন রাখাল বল দিকি এই বুড়ো আর এই বুড়ো নে কোনো কাজে লাগাতি পাব ? তুই কি বলিস জগাই ? আমার ঝ্যানো অক্ত ওসে উটতেচে। আঃ. কতকাল কেউ বলে নে আমাদের দে কোনো কাজ আচে। মজুরি খাটি, তা কোনো দিন চাল-টাকায় পাঁচ টাকার ওপরে উটলোনে সাঁপুই। কোতা কে আট টাকা পায়. কে দশ টাকা পায়, গপ্পো মাত্তেচে।

জগাই বলে, ঝতবার জোট বেঁদে দাবি ওটাই, দিলীপ মাজে এসে পড়ে মিচুয়াল করে দে ছেঁটে পড়ে।

আমরা ঝানি না এত কত্তা, কাজে লাগাতি পার আমাদেব ? ফল চেয়ে তো কাজ করতি পারি। ফল নয় লখারা পাবে, আমি নয় না দেকলাম !

জগাই দা কি বল ?

ভাবতেচি।

কি ভাবতেচ ?

কাল ঝকন মারে দেকলাম, 'মা ডাকতেচিল কত, নে গেল নে গেল রে' জগাই—রাখাল এসি আমাদের নে ঝাবে বলি ডাকতেচিল বুঝি ?

রাখাল হাসতে থাকে। বলে, চল দিকি। আগে তোমাদের দেকিয়ে দিই।

চল।

বাড়িতে কি বলবে?

ঝা হয় বলব।

জগাই, রাখাল, সুবল আর লখা যায়। সুবলকে খুবই অদ্ভুত দেখায় শার্ট গায়ে। পলিত কেশ মাথায় গামছা বেঁধে নেয় সুবল। জগাইয়ের বুকে ঢেঁকি আছড়ায় যেন। ছোলেমান আর আবুকে আবার দেখতে পাবে তা তো জীবনে ভাবেনি। জীবনের বড় বড় পাওনা গুলি এমন ভাবে আসতে পারে, কোনো প্রত্যাশা যখন নেই, জীবন যখন ছিন্নভিন্ন, ধূলিমলিন, তা সে জানত না।

প্রথমে ওরা একটি দিন রাখালকে আটকে রাখে ধানজুড়িতে। যাত্রা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে 'পতিঘাতিনী সতী' পালায় রঙ্গমঞ্চে রোশেনারার ছুরিকা নৃত্য মানুষজনকে আটকে রাখে। ফলে ঝিমঝিমে আঁধারে ধানজুড়ির খেয়াঘাট থেকে ওরা নৌকায় ওঠে। নৌকোয় বেশ খানিক দূর গিয়ে মঘরাহাট। মঘরাহাট থেকে খানিক হেঁটে গাঙ পারে গিয়ে খেয়া নৌকায় কাল্লিক মের জল পেরিয়ে আবুলি। সেখানে সহুচাঁদ গায়েনের বাড়ি রাত কাটানো। সহুচাঁদের বোন বিউলির ডাল ও কানসা ভাত মরিচ পোড়া দিয়ে বেড়ে দেয় ও জল দেয়।

খাবার পর পান দিয়ে সহুচাঁদের বোন বলে, চিনতে পাত্তিচো না মোটে?

না গো, আপনারে তো দেকিনি।

সি কি গো। ভাল করে দেকো দিকি।

না, চিনলাম না।

বলি, পদ্মোরে মনে পড়ে নে? দুগগামণির বড় জা হই যে? মনে পড়চে?

অ্যাঁ? কাত্তিকের বউ?

তবে?

মোটে চিনি নি দিদি। পেন্নাম হই। পেন্নাম কর্ জগাই, পেন্নাম কর্ লখা। ইনি কি কম জনা ছিল তকন? দুগগামণির কচিটাকে বুকে নে দুগগারে আগুলে বসচে। বলতেচে, জান দেব তবু নাশ নিতে দেব না।

হেঁচুড়ে নে গেল।

খুব মনে আচে। সে ছেলে?

দোকান দেচে হেতা। মা গেল, বাপ গেল, মামারা বোন দুটারি নিলে, তারে নিল না। তা আমি বলি সে নি, তার চেন্নটা কি তুলে দোব?

কোতায়?

আজ নি ঘরে। শউরবাড়ি গেচে বউ আনতি।

সতুচাদ বলে, আমিও অপুত্তুরি, ঘরে নি বউ। কবে মরি বেচেচে। তা পদ্মা আর ওই গনশা। ওরাই একন ঘর-সোমসার, ওরাই সব।

পদ্ম দিদির মেয়ে ছিল না?

পদ্ম বিনা আবেগে বলে, কবে মরে গেচে। গুঁড়ো চেন্ন দুটো ছেলে। তা বাপ আসতে দেয় নে মোটে। ইসকুলি পড়তেচে তো। অ রাখাল তেল এনাচো?

তেলি এনিচি যে।

সুবল বলে, কি বলচো গো?

রাখাল বলে, সেই যে তুমি রসুন তেল কত্তে, আর কি কি মশলা-মাশলি দে, সেই তেল?

নাও ঝামিলি। সে একন হয়?

পদ্ম বলে, কেন হয় নে?

সুবল বলে, আকন্দের আটা, ওসুন, তেল—সে যে নানানিদি সামিগ্গি গো! কুল কাটে জ্বাল দিতি হয়।

তা দোব, সব দোব।

বেশ তো, কর দোব খুনি।

রাতে ওরা সকলেই এক ঘরে শোয়। পদ্ম শুয়ে পড়ে পাশের ছোট ঘরে। প্রথমে সুবল ও জগাই ভেবে পায় না এত উত্তেজনায়

ঘুমোবে কি করে। কিন্তু বাইরে থাকে নৈঃশব্দ। কোথাও কেউ ঢোল বাজায়, দূরে। সজনে গাছের ডালে বসে লক্ষীপ্যাঁচা, গম্ভীর ঘোষণায় কারা হেঁকে যায়, গেরস্ত হুশিয়ার!

রাখাল বলে, ওরা গ্রামরক্ষী দল। রাত পাহারার ব্যবস্থা হয়েচে থেকে চুরিটা কমেচে খানিক।

সতুচাঁদ বলে, চৌকিদারের সব্বনাশ।

সুবল বলে, কেন?

চৌকিদারে-চোরে সাট আচে না; চোর চুরি করে, চৌকিদারে ভাগ নেয়। ছেলেরা চৌকিদারকে পেটন দিতিই থালাবাসন চাট্টি বেইরে পড়ল। পঞ্চায়েত প্রধানের তো মুখ চুন। বলে, শিক্ষে হয়েচে ওর। ছেলেরা বলে, তা হবে নে। ওরে জাড়াতি হবে। তার কোনো ফেসলা একনো হয়নি। চৌকিদার আর বেরুচ্ছে না। ছেলেরা চৌকি দিচ্চে।

রাখাল বলল, ভুবনো গয়লা চোরের আটন বাঁদন মন্তর দিচ্ছিল যে তখন?

খুব দেচ্চেল।—সতুচাঁদ প্রসন্ন ও সদানন্দ হাসে, চাল দাও পয়সা দাও সে ঘরের অষ্টদিক বেঁদে দে যাতে চোর ঢুকবে নে। তা তার ঘরে চুরি হতে তবে তার ভিরকুটি বন্দ। একন আর কিছু বলে নে। সিদিনে পদ্মোরে বলে গেচে যে যার দোর পাঁজরে মুতবে তাতে মন্তর খাটে?

পদ্ম ও ঘর থেকে বলে, আমিও দিব্বি করে দিইচি ঝেড়ে। বলনু ঝেতা মোতে সেকান দে ঢোকে চোর? দেকোচো ককনো?

দেশঘরে কি কলতলা থাকে কারো?

সতুচাঁদ বলে, ভুবনা গরম হয়ে আচে খুব।

পদ্ম বলে, ওঃ, ওর ভয়ে তো আমি মরতেচি।

এত কথার পর ওরা নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুবলের ঘুম আসে না, ঘুম আসে না জগাইয়ের। আজকের সন্ধ্যাটি, সন্ধ্যা কেন, সারা দিনটি বড় আশ্চর্য। সেই পদ্ম, তার সঙ্গে দেখা এতকাল বাদে।

যার কথা এমন করে এতদিন ভাবিনি, সেই দুর্গামণির মুখ আজ মনে পড়ে। দুর্গামণি, রাইমণি, কৌশল্যা, সব একদিনে যায়, একদিনে। সেদিনই যায় অন্নপূর্ণাও। যদিও সে কথা সুবলরা প'রে জেনেছিল। একদিকে কতজন পুলিশ, আর দিকে চাষী মেয়েরা। তখনো স্বাধীনতার পর মাত্র দেড় বছর কেটেছে কি কাটেনি। দুর্গামণি দা মেরেছিল পুলিশের হাতে, তারপর দুর্গামণি আর রাইমণি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের দারোগার ওপর। দুজনের হাতেই দা ছিল তখনো। কিন্তু দারোগার ওপর থেকে তাদের ঠেলে না সরিয়ে পিছন থেকে গুলি করেছিল পুলিশ।

দুর্গামণির কোলের ছেলে ওই পদ্মর কাছে। পদ্মর এক হাতে দা, আর এক হাতে ছেলে। পদ্মর আকাশচেরা চীৎকার, দেব না, নাশ নিতি দেব না কারেও।

আর জয়চাঁদকে টেনে নিচ্ছিল অন্নপূর্ণা। জয়চাঁদ অনেক, অনেকক্ষণ লড়েছিল—অনেক অনেক দিন ধরে লড়তে লড়তে জয়চাঁদের সঙ্গে আবাদের তফাত ছিল না কোনো। সেদিন সেই জয়চাঁদকে যখন প্রথম গুলি করে পুলিস, যখন তারপরেও লড়ে জয়চাঁদ, যখন ঘাড় ফিরিয়ে জয়চাঁদ কৌশল্যাকে দেখে বলেছিল, কৌশল্যা বুন! মরলি পরে আমারে ঝ্যানো না নিতি পারে।

কৌশল্যা তো তখন ভরা মাস পূর্ণগর্ভা। এই দলমলে চেহারা ধান কাটে শক্ত হাতে মোটা গোছে। কাস্তে তুলে সে ঘোরাচ্ছে এক হাতে স্বামীর মাথাল ধরে রেখেছে সামনে ঢালের মতন, আর গুয়োর ব্যাটারা, ঢ্যামনা বেজন্মার পাল। জোতদারদের মদত দিয়ে ঝাবি কতকাল? তোদের ঘরে জমি নি? জমি কেড়ে নিলে বুকির মধ্যি দে নাঙল চলি ঝায় জানিস নি? হা রে শোঁসানের শুগ্নির পাল! ঘরে মা বুন নি তোদেরে? মা বুনের ওপর গুলি চালাচ্চিস?

এ কথা বলতে বলতে কৌশল্যা জয়চাঁদের কথা শোনে আর বলে, জয়চাঁদ কমরেট আবাদের ঝান্। তোদের নাশ দোব শুগ্নিদেরে?

জয়চাঁদ পড়ে যায়। অন্নপূর্ণা জয়চাঁদেরই বোন। সে টানছিল জয়চাঁদকে। বুকে গুলি খেতে সে ঘুরে পড়ে যায়, আর্ত ডাকে, কৌশল্যা রে, কৌশল্যা!

মাথাল ছুঁড়ে দিয়ে ধেয়ে আসে কৌশল্যা। জগাইয়ের চোখে লেখা আছে সে ছবি আজও আর শেষ নিঃশ্বাস অবধি লেখা থাকবে।

মা নিচু হচ্ছে, মা টানছে জয়চাঁদ কমরেডকে। কাস্তে ছাড়েনি হাতের। জয়চাঁদ কমরেড আজ কয়েক বছর ধরে আবাদের প্রাণ। মা বলে, উনি ঝেতা বসি বসি আমাদের লড়ায়ের কতা বোজায়, তেভাগা কায়েম হলি সে ঠাঁই অশ্বত্থ গাচ পুতি চিন্ন করি রাকবো। গাচের ছাওয়ায় বসলি পরানডা জুইড়ে যাবে।

জগাই বলে, কেন অশ্বত্থ গাচ কেন?

সে গাচের মরণ নি, জয়চাঁদ কমরেটের মরণ নি। উনি ঝ্যামন অক্ষয় গাচ ইনি তেমন অক্ষয় মনিষ্যি। ওঃ, কতাগুনো শুনলি পরে বুকের মদ্যে এমন হয়, ঝ্যানো ফাটাচটা মাটিতি বিষ্টি পড়তিচে। সগল জুইড়ে যায়।

সেই জয়চাদ, কৌশল্যার সেই অক্ষয় মানুষ মরে গেছে। কৌশল্যা তখন রণরঙ্গিনী। সে তখন তেভাগার সঙ্গে এক। ছেলে জগাই ও স্বামী যোগীনের সামনে একটা গুর্খা সৈন্য কৌশল্যার তলপেটে গুলি করছে। মা ঘুরে পড়ছে, পড়ল। আরেকটা গুর্খা সঙিনের ফলা উঁচিয়ে ছুটে যাচ্ছে। জগাইয়ের ও যোগীনের চীৎকার, না—! কিন্তু সঙিনের শাণিত ফলা চিরে দিচ্ছে পূর্ণগর্ভ। জগাইরা ছুটে আসছে। তখনো মা ডান হাতে কাস্তে ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছে, বাঁ হাতে চেপে ধরেছে বুলেট-বেয়নেটে দীর্ণ পূর্ণগর্ভ পেট। তারপর ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে মা সে সময়েও বলছে জয়চাঁদকে দেখিয়ে, ওই ঝে!

যোগীন আর জগাই মাকে দুদিকে নড়া ধরে টেনে নিতে চায়, টেনে নিচ্ছে, আর আকাশচেরা তীব্র চীৎকার, নে গেল, নে গেল জগাই রে! সব নে গেল!

সব নে গেল! জয়চাঁদ কমরেড যে "সব"। আবাদে সে তেভাগায় জয়চাঁদই 'সব'। সব নে গেল জগাই রে! মাকে টেনে নিতে নিতে নিতে নিতে, নিতে নিতে, নিমেষে মা ভারি হয়ে গেল, দেহের ভব ছেড়ে দিল। স্বামী পুত্রের হাতের উপর এলিয়ে গেল। আর শুইয়ে দেবার পর তখন দেখা গেল চেরা পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে ছেলের মাথা, ছেলের হাত।

সুবল বলল, মনে পড়ে জগাই?

সব মনে আচে। মনে পড়ে কি বলতেচ, মায়ের অক্ত বলতেছে লড়াই চালাও। ছেলে ডেকে বলতিচে নড়াই করো। ছেলের মা মরেও হাতের কাস্তে ছাড়েনি, বলতিচে নড়াই করো।

বাবা মারে ডেকে বলতিচে, শোনো, শোনো জগায়ের মা! আবাদ নিশক্তুরি করে তোমার ছরাদ করব। বাবা বলতিচে, একন ঝদি কাঁদিস জগাই, তোরে কেটি ফেলব।

আর তোরা ছুটতেচিস। আর পদ্দোরা শাঁক বাইজে চলেচে। আর গাঙ সাঁতরি আসতিচে তালগঞ্জের ভলান্টেররা। দাঁতে দাঁত কেমড়ে চেপি ধরি দুহাতে সাঁতার দেচ্চে আর মাতা উঁইচে বলতিচে "গুণ্ডার দল! আবাদ ছাড়ো!" ওঃ, আজও সম্পষ্ট দেকতি পাই ঝ্যামন।

আর পুলিস পলাতেচে কি!

আর সে রাত্তিই তো সগলার নাশ সামনে রেকে অহীন মণ্ডল বলতিচে, পুলিসরে পত দেইকে এনেচে ভক্তচরণ আর অভয়। ওদের নাশ ফেলতি হবে! এত ঝনার অক্তে মাটি ভিজল, ধানক্ষেত ভিজল, নড়াই চালাতি হবে।

পরদিন মনে আচে কি হল?

খুব মনে আচে।

দুজনে দেখতে পায় সেই ডিসেম্বর, সেই ধানজুড়ি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস কমিশনার ধানজুড়িতে। সঙ্গে পাঁচশো সৈন্য ও পুলিস।

চোঙা মুখে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সদম্ভ, মদমত্ত ঘোষণা, ধানজুড়িতে

১৪৪ ধারা জারি করা হল অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। বিশেষ আদেশ, একটি খবর যেন বাইরে না যায়।

আর তখনই বাইরে চলে গেছে। আগের রাতেই কলকাতায় কোথাও, কোন প্রেসে সে খবর ছাপা হয়ে গেছে। তেভাগার রক্ত কাগজে কাগজে ছড়িয়ে গেছে কলকাতায়। তখনো কম্যুনিস্ট পার্টি বিদ্রোহী পার্টি, পার্টির মেরুদণ্ড আছে। চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সাহেব জানে না, তখনো কেউ জানে না, জনগণকে নিয়ে কৃষক সংগ্রাম করার প্রতিষেধক আছে। সে প্রতিষেধক ১৪৪ ধারা, পুলিশ ও মিলিটারি নয়। অন্য প্রতিষেধক আছে।

গদীতে বসতে দাও। নিজেরা ১৪৪ ধারা, পুলিস ও মিলিটারি হাতে পাক। তাহলেই সব প্রগতিশীলতার মুখোশ খসে যাবে। তাহলেই দিনে দিনে, দিনে দিনে, সংগ্রামী পার্টিগুলি শিখে নেবে চতুর কৌশলগুলি। ধান রোপণ ও কাটার সময়ে জোতদার চীৎকার করবে, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ কোর না। বন্ধু কাগজ কলমে—প্রচারচিত্রে —দল বাজিতে প্রচার চলবে যে আমরা ভূমিহীন ও কৃষককে জোর মদত দিতেছি।

মদত পাবে এক অংশ। যাতে আবার ভোট মেলে। আর বর্গাদারী রেকর্ডের নামে গ্রাম পর্যায়ে চলবে টাকার খেলা। পঞ্চায়েতি শাসনের নামে চলবে ব্যাপক চুরি ও বাটপাড়ি। আর জমি হারাতে থাকবে মানুষ। জমি গিয়ে ঢুকবে তাদের ঘরে, যাদের জমির ঊর্ধ্বসীমা কেউ কখনো দেখে না। যাদের জমি ভেস্ট করতে গেলে জে এল আর কর্মী বদলী হয়ে যায়। যাদের কীর্তিকলাপ ফাঁস করতে গেলে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট গ্রামীণ মস্তান সরকারী কর্মচারীকে ঠ্যাঙানি দেয়।

এসব কথা যারা বলবে, তারাই রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে কেন্দ্রের লোক। নইলে বিভেদকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী। নইলে বিদেশী শক্তির এজেন্ট।

কিন্তু কৌশল্যাদের তেভাগার সময়ে এত কৌশল শেখা হয়নি।

তখনো সব দগদগে, জ্বলন্ত, জীবন্ত! যাদের জন্য তেভাগা, সেই চাষী, ভাগচাষী, খেতমজুর তো গদীর ধান্দা করতে লড়াইয়ে নামে না। তারা তো জানে না অসততা। যে পার্টি তাদের দাবির কথা বলে, তার পতাকা তুলে নিয়ে ছোট চাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুর দশক থেকে দশকে রক্ত দেয়। তবে দশকে দশকে তারা এ কথা শিখেছে, গদীতে আসীন বাবু ও ভদ্রলোকের পার্টিকে যদি তিরিশ বছর ধরে চাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুরের রক্ত দেওয়া যায়, তাহলে সে পার্টি শুধু রক্তই চাইবে। দেবে না কিছুই। কেননা যাদের তারা গাল পাড়ে, তাদের সঙ্গে মৌল চরিত্রে, বিদেশী রাষ্ট্র নির্ভরতায়, সশস্ত্র আন্দোলন বিষয়ে আতঙ্কে, তাদের সঙ্গে এদের তফাত নেই কোনো। শুধু ঝাণ্ডা ও দলের নাম আলাদা। ওটুকু রাখতে হয়। নইলে ভালো দেখায় না।

কৌশল্যাদের রক্তে ভেজা তেভাগায় এত কথা জানা ছিল না। কৌশল্যাদের মৃত্যুর পরদিন ডিসেম্বরের তীব্র বাতাস গাঙ ধোয়া জলের স্পর্শ বহে হু হু করে বয়ে যাচ্ছিল।

সে বাতাসে গলা ভাসিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হুমকি দিয়ে জানাল ঘোষণা।

পুলিশ কমিশনার চোঙা মুখে দিয়ে কি বলছিল, প্রথমে কেউ বোঝেনি। পরে কে বলল, উনি বাংলা বলতিচে। ইনর্জিরি বলে, বাংলা তো বলে নে ককনো। তাতেই মনে হতেচে বুজি বা হিন্দী বলতিচে।

তা বলতিচে কি?

বলতিচে, ঠাণ্ডা মেরি না থাকলি, তেভাগা নে পুলিশ ঠ্যাঙালি ধানজুড়ির সবখানি কামান মেরি উইড়ে দেবে। কচুকাটা করবে।

কমিশনারের কথা শেষ হতে না হতে পুলিশ এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার শুরু করে। অহীন, নফরচাঁদ, সুবল যোগীন, সবাই তখন আত্মগোপন করে আছে ভোর থেকে।

বেলা দশটার সময়ে তারা আত্মপ্রকাশ করল। যখন হঠাৎ একসঙ্গে বাজল শত শত শাঁখ। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল হাজার

কয়েক মানুষের এক আশ্চর্য মিছিল। কৌশল্যা আর জয়চাঁদকে লাল নিশানে ঢেকে সামনে নিয়ে! আর হাজার গলায় শ্লোগান,

কৌশল্যা, জয়চাঁদ!
তোমাদের ভুলব না।
দুর্গামণি, রাইমণি!
তোমাদের ভুলব না।
অন্নপূর্ণা মা জননী
তোমাবে ভুলব না।
তেভাগার লড়াই থামবে না।
থামবে না, থামবে না
খুনী পুলিশ নিপাত যাও
নিপাত যাও, নিপাত যাও
গুর্খা সৈন্য বাংলা ছাড়ো!
আবাদ ছাড়ো ধানজুড়ি ছাড়ো॥

পুলিশ ও সৈন্য, ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনার স্তব্ধ, নিশ্চল। হাজার হাজার মানুষের উপর যে গুলি চালানো চলে না।

এক রক্তাক্ত জনপদকে যে গ্রেপ্তার করা চলে না, তা তারা তখনি বোঝে।

সেই রাতেই সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত হয়, সাঁপুইদের নায়েব ভক্তচরণ আর কংগ্রেস নেতা অভয়, এদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

পুলিশ আর মেলিটারিকে ঝারা পত দেইকে নে এয়েচে। তারা দেশের শত্তুর।

সুবল বলেছিল, তারা ঝেকালে পুলিশ এনেচে, মেলেটারি এনেচে, ঝামন এনেচে তেমনই ধর না কেন তাদের নাশ গাঙের জলে ভাসতেচে। ও কতা আর ভেবনি অহীনবাবু, লড়ায়ের কতা বল।

এখন জগাই বলল, একা মেরিছিলে?

ছোলেমান, আবু, আমি, ক জনায়।

ঝার জন্যি, ঝাদের জন্যি এত কাণ্ড, সেই সাঁপুয়ের বেটা সাঁপুই আজ কমরেট।

এট্টা কতা বুজিচি জগাই।

কি?

এরি কাটলিও হবার নয়। গোকম ঠেঙে চোট মেরি গোটা বেবস্তাটা ফেলি দিতি হবে কাস্তের চোপে। বেবস্তা গেলি সব ঝাবে। নইলি পরে সব্বনাশ। সিদিনে ঝত সাঁপুই আচে ফেলি দিলি কাজ হবে। সিংহাসনবাড়িপাট যেমন-কে-তেমন রেখি বাজারে মারো, আবার বাজা আসবে। তাই গোড়া বেঁদি কাজ করতি হবে।

ঝা বলোচো।

সুবল অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, তোর ওই এক দোষ জগাই। আমি ঝা বলব, তাতেই বলবি ঝা বলোচো। কেন? নিজির মাতায় বুদ্ধি গজায়নে?

কেন? তোমারে ছাড়া কারে ঝানি? মা নি, বাবা নি, আপন বলতে তোমারে ঝানি, আর কারে ঝানিনি। তাতে তুমি গরম হও আর ঝাই হও।

না, আমিই তোরে মাতায় তুলিচি।

লখিন্দর আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসে ও বলে, তোমাদের দুজনার কি চক্কে ঘুমনি? কতা কয়ে রাত কাটালে? তোমাদের নে ভাবি ঝামালি।

সি কি সকাল হয়েচ?

হবে নে? নাও ওঠো, যেতি হবে।

এই কাক সকালে?

কেন্ না করলি কাজ হয়?

জগাই বলে, সিদিন অবদি না কাড়তিনি, আজ উনি বলতেচে কেন্ না করলি কাজ হয়নে।

সুবল বলে, উনির কেনটি তো বেশি হবে একন। যুবো মানুষ ও, আমাদের পত দেকাবে।

জগাই বলে, ঝা বলেচো।

এবং সুবল ও জগাই হেসে ফেলে। কেন হাসে তা জগাই বোঝে না।

ঝপ করে ওরা বেরিয়ে পড়ে রাখাল উঠতে না উঠতে।

পদ্ম বলে, মুড়ি ভাজব সুবলদাদা। ঘর ঝাবার কালে অবুশ্যি নে ঝেও।

সন্তুচাঁদ বলে, গাঙের মাচ খাওয়াব তকন।

এমন কথা সুবল বা জগাই দীর্ঘকাল শোনে না। ওরা ঘাড় হেলায়। লখিন্দর প্রণাম করে বলে, আসি ঠাগমা।

পদ্ম ওর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে অস্থির হয় ও ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, আয় বাচা। আজ কার নাতি কারে "ঠাগমা" বলতেচে গো। হ্যাঁ দাদা, দেকোচো? ঠিক ঝ্যানো কৌশল্যা দিদির কপাল আর চোক পেয়েচে নখা?

পথ চলার সময়ে ঠাকুমার কপাল আর চোখের উত্তরাধিকারের দায়িত্ব বহন করছে বলে লখিন্দর গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, একন বুজে চোলো বাবা।

কি বুজব?

আমারে গাল দিওনি।

গাল তোরে কবে দিই?

দাও।

দেব না?

না। ঠাগমার কপাল তার চোক তিনি আমারে দে পাইটেচে ঝকন তকন আমারে গাল দেওয়া সাজে নে তোমার। বুজোচো?

বুজিচি। পা চাইলে চল্।

পা চালিয়ে চারজনই চলে। পাঁচ ঘন্টা হেঁটে সাড়ে দশটায় ওদের মুখে নদীর বাতাস লাগে। হঠাৎ পথের মোড়ে এক জায়গায় চোখে পড়ে সুবিশাল তেঁতুল গাছের নিচে একটি মানুষকে। লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জগাইদের দেখে সে ছুটে আসতে থাকে। জগাইরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কাছে এসে লোকটি লাঠি ফেলে দেয় ও সুবলকে জড়িয়ে ধরে, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

ছোলেমান, ছোলেমান রে জগাই।

জীবনে ভাবিনি দেকতে পাব গো সুবল। হোই দেকো, আবু

আসতিচে।

এবার সুবলরা দৌড় ও হাঁটার মাঝামাঝি কদম ধরে

সুতুরজংপুরে সে সন্ধ্যায় রাখালদের বাড়ির উঠোনে নামে এক আশ্চর্য সময়।

সারাদিন গেছে কথা বলায়, কথা শোনায়। সুমোহন বাবু বলে, আজ আবার হবে খন।

কি?

দেকো তকন।

আবু আর ছোলেমান পুরনো পরিচয়, এবং একদা বাঁশের ডগা এক পাব কেটে ফেলে তারপর বাঁশের মাথায় ল্যাজার ফলা গেঁথে ফেলে পাশাপাশি দৌড়ে তা দিয়ে পুলিসের কাঁধে বিঁধাবার গৌরবে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে বলতে গেলে।

যে আসে তাকেই বলে, দেকে চক সাথক করে ঝাও। বেটাবিটিরে বলতি পারবে ঝে তেভাগার বড় নড়ুইদার সুবলসকারে দেকিচি, তেভাগার মা জননী কৌশল্যের ছেলে জগাইরে দেকিচি।

আর কিশোর ও বালকদের দেখায় জগাইকে। বলে, নকাদাদারে দেকিচিস তো? তার বাপারে দেক চক্ষু ভরে। অমন মা না হলি অমন ছাবাল হয়নে। আর ঝ্যামন বাপ তেমন তার বেটা। তোদের মত ভেরো মেরি বেড়ায় নে নকা। ঝানলি?

ননীকে বলে, এনাদের ঘর তুলি দাও। এমন সব নোক পেলি বুকে বল বাড়ে।

আজ ছুটি, ছুটির উৎসব সুতুরজংপুরে। আজ খাওয়াদাওয়া পোষলা করে। ধর্মগোলায় চাল আছে, ডাল কেনা হয়েছে। লঙ্কা-হলুদে গরগরে খিচুড়ি কাঠের উনানে। বেলা গড়িয়ে তেমোহনার লোকরা এসে পড়ে এক জাল মাছ নিয়ে।

একটি বুড়ো বলে, অ সুবল! চিনতি পারতিচো না বাপ? এই ছুকিরাম বিনে তকন ল্যাজার ফলা আর কাটারি হতুনি গড়ানো।

বলি তুকি কামাররে মনেনি ?

স্বপ্ন, স্বপ্ন যেন সব।

অন্নপূর্ণার মেয়ে বাতাসীকে দেখেই চমকে যেতে হল। ঠিক যেন অন্নপূর্ণা ফিরে এসেছে। বাতাসী নাকি কৃষকসভার সদস্য ছিল। আর সুমহনবাবুর সঙ্গে বাতাসী আর তার বরও চলে আসে।

ননী বলল, খুব তেজী মেয়ে বাতাসী দিদি। পুলিস তো খুব জ্বালিয়েচে তকন। দিদি বলে, গাঁয়ে অকাজে ঢুকেচে আর মেয়েদের দিকে তাকিয়োচো কি আঁশ বটি দে নাক কেটে দোব। কার মেয়ে আমি তা জানো?

খাবার সময়ে বাতাসী বলল, কিগো সুমোহন কাকা, তারা নাকি আসবে না? আমি আগেই ঝানি বাখাল গেচে ঝে কালে সে কালে টেনি আনবে ওদের।

তা বলছিলে।

সুবল বুঝল, মুখচোখে মিল নেই মায়ের সঙ্গে। কিন্তু কথা বলার ধরণে, ঘাড় তুলে চাইবার বিশেষ ভঙ্গিতে মা ও মেয়ের খুব মিল।

সেখানে সেই অঙ্গনেই সন্ধ্যায় হারিকেনের আলো জ্বলল।

ননী স্বভাব বিরুদ্ধ কোমল গলায় বলল, যে তেভাগা করিছিলে সে তেভাগার কতা তো কেউ বলে না একন? তা আমাদের ছেলেরা কেমন বলে শোনো।

আর তেভাগা! ঝে যাত্রারা দেখিচি।

হ্যাঁ জানি। তাই তো বলবে একন। সাঁওতালদের স্বাধীনতার লড়াই, তোমাদের তেভাগার লড়াই, সব চলিছিল এক কারণে। একন অপারেশন বর্গা হয়েচে তাতেই সকল লড়াই সার্থক হল। এই তো?

ওই তো শুনতেচি।

শুনলে কেমন লাগে?

বুকির মধ্যি জ্বলি ঝায়।

একন শোনো। কেমন শোনো বলবে পরে।

কেমন শুনব, হ্যাঁ ননী?

ঠিক একটুখানি শুনলি বুজতি পারবে।

আঙিনা ঝেঁটিয়েঝুঁটিয়ে পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছিল। সবাই বসে গিয়েছিল খানিক জায়গা মাঝে ছেড়ে রেখে। দাওয়ায় জ্বলছিল লণ্ঠন।

আস্তে সবাই চুপ হয়ে যায়। ননী বলে, আমাদের খুবই আনন্দ আজগে, যে দুজনারে পেইচি সামনে। ইনি সুবলসখা, নাম যতেষ্ট শুনোচো। ইনি জগাই, কৌশল্যার ছেলে। তেভাগার কর্মীদের জুটো যে কিচু করব তা ঝামন মনে ছিল না—আবার হতে করতে তারা যকোন এক-দুয়ে জুটল, তকন মনে নিল এক কতা। তেভাগা এনাদের মনে মস্ত কিচু। আজও। তাই তেভাগা নে কতা কইলে এনাদের মনে পঁউচানো যায়। আমাদের বয়েস যা, আমরা তেভাগা করিনি চোকে দেকিনি, তেভগার জনম যার কোলে, তত বড় বাংলাও দেকিনি। কিন্তু এ কতা জনম কাল হতে জেনেচি, যারা তেভাগা করেচে ব দেকেচে, তেভাগা তাদের কাচে অনেক সমিস্যের সমাধান ছিল। কেন ছিল তা আমি জানিনি, এরা জানে। সে কতাই জানতে চাই। সে কতা কে বলবে? কে ঝানে?

একটি কিশোর উঠে দাঁড়ায় ও বলে, তেভাগার কতা আগে নয়। কেন আবাদে তেভাগা বচরের পর বচর চলিছিল, কেন তা রইল না ভাগচাষীর নেয্য ভাগের লড়াই—কেন সে তেভাগা হতে লাটদার-জোতদারের জমি লড়াই করে ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষেতমজুর ঘর তুলল, চাষের জমি পেল—ভাগচাষী তিনভাগের দুভাগ, চারভাগের তিন ভাগ, সকল হিসেব ফেলে দিয়ে সব ধান কেটে নিল—সকল কতা জানতে হবে।

আর একসঙ্গে কয়েকটি কিশোর বলে, তার আগে জানতে হবে কেন নিজের জমি হতে উৎখাত হয়ে কে হয় ক্ষেতমজুর, কে হয় ভাগ-চাষী। জানতে হবে কাদের ছিল এ আবাদ কে তাতে মেদিনীপুর আর চব্বিশ পরগণার উচ্ছেদ উৎখাত চাষী বসত করাল। কেমন করে এল লাটদার।

জানতে হবে লাটদার-চকদার-গাঁতিদার-জোতদার-মহাজন এই চক্রের কথা।

জানতে হবে লয়ালগঞ্জ নাম বদলে লালগঞ্জ কেমন করে হয়। জানতে হবে লালগঞ্জ, বুধাখালি, চন্দনপিঁড়ির কথা। জানতে হবে ধানজুড়ির কথা।

মুক্ত অঞ্চল শুধু আজ হয় না।

সেদিন লালগঞ্জ ছিল মুক্ত অঞ্চল।

১৯৪৭ সালের ১০ই আগষ্ট লালগঞ্জে উড়েছিল লাল পতাকা। আবাদের তেভাগার তখন একবছর বয়েস হয়ে গেছে। সেদিন আবাদের চাষীরা লড়াই চালাবার সংকল্প নিয়েছিল।

সেদিন সংগ্রাম কমিটি কি বলেছিল, কি বলেছিল?

ভুতে পাওয়া, মন্ত্রাবিষ্টের মত সুবল উঠে দাঁড়ায়, জগাই। সুমোহন বাবুর দিকে তাকায়। সুমোহনবাবু উঠে দাঁড়ায়।

সুবলরা বলে, আমরা ঝানি।

ছেলেরা বলে, তোমরা বল।

তকন…কমিটি বলে ··সেদিবসের সিদ্ধান্ত মত কাজ হয়েচে। জমিদার জোতদারের চাপটা কাচারি আর পাঁচ হাজার বিঘা জমি আমরা দকল করিচি…বাজেয়াপ্ত করিচি গরু বাচুর আর ধান···কমিটি এ সম্পত্তি হিসাব মত ভাগ করে দিয়েচে সগলারে…আরো দেবে। ভাগচাষী নি, ক্ষেতমজুর নি এ মুক্ত এলাকায় সগলা জমি মালিক···

আর কি বলিছিল?

বলিছিল···কংগ্রেস সরকারের আইনকানুন—আদালত মানিনা ·আমাদর আইনকানুন—আদালত সগল হবে নতুন…জনসাধারণ বিচার করনে…তাদেরকে নিয়েই বিচার হবে···এই মুক্ত এলাকার নাম লালগঞ্জ—লালগঞ্জরে লাল রাকতি সবাই হব ভলাণ্টের. সগলা লড়ব···আর আশপাশের অঞ্চল ঝাতে মুক্ত হতি পারে সে ঝন্যি সেকানকার-ভাগচাষী ক্ষেতমজুরদেরকে সাহায্য করতি হবে···সগল আবাদরে লালে লা—ল করি দিতি হবে···ছোট জোতদার ঝাদি সগল মেনে এগোতে আসে···তার হক দেকা হবে · ঝে তা মানবে নে, সে দ্বারিক সামন্তের পতে ঝাবে।

ওরা দাঁড়িয়ে থাকে কথাগুলি শেষ করে। ওদের নাড়ীতে রক্তে

কোথায় গচ্ছিত ছিল কথাগুলি? কোথা থেকে উঠে এল?

সুবল ঘামে ভেজা মুখ তোলে, মুখ ঘোরায়, তারপর চীৎকার করে বলে, জগাই রে! লকা! ভুলিনি আমরা কিচুই—সুমোহন বাবু গো। সগল কতা ঝ্যানো মনে আচে! হ্যাঁ। তার নাম তেভাগা তে—ভা—গা!

আজ রাতে জগাই আবার মাকে স্বপ্ন দেখল। বিছানায় শুয়ে ও মনে মনে ভাবছিল আরেক আবাদের কথা। যে আবাদে গ্রামে গঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্গামণি, রাইমণি, উত্তমী, বাতাসী, সরোজিনী, অন্নপূর্ণা, জয়চাঁদ, অশ্বিনীর মূর্তি। ভাবছিল ওর দেখা কলকাতার কথা। যেখানে, এ কি আমার মায়ের মূর্তি রেকেচে?—মনে করে রাজভবন আর রেডিও আপিসের কাছে গিয়ে মূর্তির নিচে আরেক নাম দেখতে পেয়ে বড় কষ্টে ফিরে এসেছিল। ভাবছিল কলকাতা জুড়ে ওর মায়ের মূর্তি তুলে দেবার কথা।

ভাবতে ভাবতে ওর চোখে ঘুম এল।

ওর মুখে মা এল আবাদের আকাশমাটি ব্যেপে। আজ স্বপ্নের আকাশ কালো নয়, আলোয় আলো। সব যেন শত সূর্যে ঝলক দিচ্ছে। আজ স্বপ্নের আবাদ সেদিনের আবাদ নয়। আজকের ধানজুড়ি, আবুলি, তেমোহনা, তালগঞ্জ, সুতুরজংপুর যেন।

মায়ের রক্তমাখা চুল উড়ে দশ দিক ছেয়ে ফেলল, মায়ের হাত আকাশ চিরে উঠে গেল কাস্তে নিয়ে। মা দীর্ণ-বুলেটে ছেঁড়া তল পেটে থেকে সেই ছেলেকে বের করে নিয়ে সকল আবাদ জলা জমি, সকল মানুষ ও জনপদের ওপর কাত হয়ে শুয়ে সে ছেলেকে বুকের দুধ দিতে থাকল। ছেলের মুখে একটি বোঁটা, আরেক বোঁটা থেকে দুধ, শরীর থেকে রক্ত ঝরঝর করে প্রখর আলোতে আবাদের ওপর ঝরে পড়েছে। মায়ের এক হাতের বাহুতে মাথা, কনুই থেকে বাকি হাত ওপর পানে তোলা। সে হাতের কাস্তেতে আলোর ঝলক কি। আলোর ঝলকে আবাদ যেন বারবার ঝলসে ওঠে।

জাহ্নবী মা

অনেকদিন বাদে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল ঝমঝমিয়ে। ফলে খিচুড়ি রান্না হয়। অসংগত পরিমাণে খিচুড়ি খেয়ে জাহ্নবী মার নাতির ঘরের নাতিরা সবাই ঘুমোতে যায় ও বিবাহিত জীবনের প্রাক-নিদ্রা কর্তব্যকর্ম সেরে যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছিল তেতলায়।

মোক্ষদা দাসী তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দুঃসংবাদটি দিল। অনেকক্ষণ ধরে মায়ের কোন সাড় নি। একন দেকা গেল, দাঁত ছরকুটে কাট হয়ে আচে।

দৈব কারণে জাহ্নবী মার নাতির নাতিরা 'দাদা' নামে পরিচিত। যতদিন জ্ঞান ছিল জাহ্নবী মা-ও ওদের বলেই ডাকত।

রাখাল দাদা বলে, সে কি?

ঝা বলচি।

চল দেখি।

আমার মনে হয় তিনির হয়ে গেচে।

বর্ষার রাতে কাঁচা ঘুম ভেঙে মোক্ষদার মুখে এ কথাটি শুনে সাত দাদার পিলে-মেটে-পাকস্থলী-ফুসফুস, সর্বত্র ব্যাঙ লাফায়। কি অনাছিষ্টি কথা! আজ সকালেও সাত দাদা পরস্পরের রক্তদর্শন করার শুভেচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

জাহ্নবী মার হয়ে যাওয়ার খবরে সবাই নিমেষে একজোট হয় ও রাখালের দিকে চায়। রাখাল মোক্ষদাকে বলে, আমি যাচ্ছি।

আমি কোতা ঝাব?

তেতপ্পর রাত অব্দি জেগে আচিল, ঝেয়ে দালানে শো।

কি হল দাদা?

ঝা শোগে ঝা।

মোক্ষদা বেরিয়ে যায়। রাখাল বলে, চল্ দেকি গে। যদি দেকি হয়ে গেচে, আমি সামলে নোব। তোরা যে যার ঘরে যেয়ে ঘুমুবি। সকালা বিপিন যাবি, যেয়ে বলবি। তা বাদে গোপাল। মেয়েছেলেদের জানাবি নি।

না। চল চল।

সাত ভাই নামে নিঃশব্দে। মোক্ষদা দালানে কাঁথা বিচোচ্ছে। জাহ্নবী মার ঘরে ঢুকে সাতভাই ছাপর খাট ঘিরে ফেলে। রাখাল দরজার একটা পাল্লা টেনে দেয় ও ঝুঁকে পড়ে ডাকে, মা, মাগো! জাহ্নবী মা!

সে ভাবে ঝুঁকে থেকেই সে চোখ মটকে ভাইদের বুঝিয়ে দেয়, হয়ে গেছে এবং জাহ্নবীর হাঁ-করা মুখটি বুজিয়ে দেয়।

তারপর হেঁকে বলে, তাই বলো। এমন নিঃসাড়ে ঘুমোয়? মোক্ষদাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ গো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি থাকচি কাছে। অ্যাঁ? কি বললে?

গোপাল বলে, বিষ্টি পড়চে, বিষ্টি।

রাখাল বলে, আমি তোমার রাখাল গো! বিলেসের ছেলে।

মোক্ষদার মনে ঘোর সন্দেহ হয়েছিল। কেন না জাহ্নবী মার নাতির নাতিদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। এখন সে শোনে রাখাল বলছে। হ্যাঁ গো, আমিই থাকব। মোক্ষদা বাইরে শুচ্ছে।

মোক্ষদা ভাবে, দেখ! আপ্তজনদের দেখে বুড়ি কথা কইছে। গলার স্বর তো বহুকাল গেছে। আমাদের সঙ্গে যখন কথা কয়। তখন কে রাখাল, কে গোপাল, কে মোক্ষদা, কে গোপালী, কিচ্ছু চেনে না। কান পাতো, এক কথা খেতে দে, খেতে দে। এখন কেমন বলছে।

যা, তোরা শুগে যা। দেখ দিকি, এমন কাতর হয়ে পড়ে আছে, মোক্ষদা বল, গোপালী বল, কেউ বলে নি? খাচ্ছিস পরচিস কার দৌলতে?

মোক্ষদার আর সয় না। খনখন করে বলে, ই কি কত্তা, হ্যাঁ দাদা! তোমরা কেউ উঁকি মেরে দেক, না বউরা আসে? তোমাদের

মা জন্নুনী, ও তো সব ভুলে রয়েচে। ঝ্যাটা মার দেবতা হবার মুকে। সাত্ কেলে বুড়ি, দিদি শাউড়ি হয়, তার দৌলতে সব, কেউ দেক ?

চুপ কর মোক্ষদা।

আজ পাঁচ মাস হল সেধে সেধে মরতেচি। এট্টা ডাক্তার ডাক, এট্টা ওষুধ কর। আমাতে আর গোপালীতে এই আদা ছেঁচে দিই, এই বেলপাতা সিজ্যে দিই, কেউ দেকে না। একন বলচ, আমবা বলি নি ?

বেশ বাবা বেশ। বলিচিস, শুনি নি। একন চুপ কর। মানুষটাকে ঘুমোতে দে।

ছয় ভাই চলে যায় ওপরে। ওপরে গিয়ে গোপাল বলে, কালই ব্যবস্থা কত্তে হবে।

কি করবে ?

বড়দা বলবে।

নিবারণ একটু ভোঁদা আছে। সে বলে, কি শত্তুরতা করে গেল বুঝতে পারচ ? উদিকে ধনুকধারী বসে আচে। জানতে পারলেই দেবে লীলে ঘুচিয়ে।

তাতে তোমার কি ? গুচিয়ে নিয়েচো ভালো মত। আমারই হল সব্বনাশ।

ছোট দাদা রঘু বিচক্ষণ ও ঠাণ্ডা মাথা। সে বলল, সব্বনাশ সকলার। একন মাথা ঠাণ্ডা রেকে চলতে হবে। সোজা কতা, বুড়ি যে নেই, তা জানানো চলবে না।

তুমি বললেই তো মড়া বাঁচবে না ?

আমি আচি, দাদা আচে, করব যা হয়।

চল, শুতে চল।

ভাইরা যে যার ঘরে যায়। বৃষ্টি আবার নতুন উত্তমে ঝেঁপে আসে। রঘু মনে মনে বলে, থামিস নে বাপু, ঢেলে চল। এখন বুদ্ধি সাঁজাতেও সময় দরকার।

জাহ্নবী মায়ের ঘরে রাখাল দাদাকে রেখে আসার জন্তে অন্ত পাঁচ ভাই যে যার বিছানায় বিনিদ্র রাত জাগে। একা রঘুর কোনো

চিন্তা হয় না। জাহ্নবী মায়ের ঘরের সিন্ধুকের তালার চাবি সে বহুদিন হল জাল করিয়েছে ও চাবিটি সে কোমরে বেঁধে রাখে। চাবির ভরসায় সে মনে ভরসা পায়, বীরের সাহস, এবং গেনিকে সরিয়ে গেনির মাকে ঠাসতে ঠাসতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

রাখাল একতলায় একা জাগে জাহ্নবী মার শিয়রে। এখন সে নিজেকে সাধুবাদ দেয়। ভাইরা সবাই তেতে উঠেছিল। ছ মাইল দূর দিয়ে জাতীয় সড়ক গেছে। বিজলীবাতির পোস্টের টাকা এস্টেটের আয়ের কাছে নস্যি। গ্রামের লোকও তেতে উঠেছিল।

একা রাখাল লড়ে গিয়েছিল। ভাইদের বলেছিল, হারামজাদার দল। এততে হচ্চে না, বিজলীবাতি চাই। বাতিতে কি হবে রে? কেরোসিনের গুদাম করে রেখেচি। যত পার বাতি জ্বাল। তোরা কি বই কেতাব পড়বি?

গ্রামবাসীদের মোলায়েম গলায় বলেছিল, উনি তো চিরকাল রইবে না ভাই। তকন গ্রামে সর্বদিকে উন্নতি হবে। ওনার নির্দেশ। তকন হাসপাতাল, মেয়েছেলের ইস্কুল, চোদ্দ ফ্যাচাঙের জন্যে বিজলীবাতি দরকার হবে, আনবে। এস্টেট তো তকন তোমাদের গো। একন চাপাচাপি করলে খরচটা দেবে কে?

এই সব ভুজুং দিয়ে বিজলীবাতি আনা হয় নি। ভাগ্যে আনা হয় নি। জাহ্নবী মা বহুকালই পাথর পানা পড়ে আছে। জ্যান্ত থাকতেই মরার মত দেখাত। মরলে জীয়ন্ত দেখাবে। আবছা আলোতে।

রাখাল নিজেকেই বলে। দিনে মানে দরজা আবজে রাখতে হবে। মোক্ষদাকে রাখতে হবে বাড়িতে আটকে। ওকে বেরুতে দেওয়া নয়।

তারপর রাখাল মশারি তোলে ও জাহ্নবী মায়ের গলা থেকে সোনার রুদ্রাক্ষ মালাটি সযত্নে খুলে নিয়ে ট্যাঁকসই করে। আঙুলের আংটিগুলি 'ওঁ গঙ্গা' লেখা। সে গুলি নিতেও তার সাধ যায়। কিন্তু সেটা বড় চোখে পড়বে। তা ছাড়া গোপাল, নেপাল, নিবারণ, বিপিন, রতিকান্ত আর রঘু? ওরা কি একেবারে শুকনো যাবে? আংটিও পাঁচটাই আছে। ঝগড়া বিবাদ যাই হোক, এ টুকু ত্যাগ

স্বীকার করতেই হয়। খুবই ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ মনে হয় নিজেকে রাখালের।

এবার সে ধীরে দরজায় খিল তোলে। ট্যাঁক থেকে বের করে চাবি। দূরদর্শিতা, দূরদর্শিতা। থাকবন্দী নোট থেকে ও মাত্র দুটি থাক নেয়। সিন্দুক বন্ধ করে। করুণা উথলে ওঠে ওর অন্তর থেকে। তারপর বসে এসে জাহ্নবী মার শিয়রে। খিলটা নামিয়ে রেখে আসে দরজার।

জাহ্নবী মার মুখটি মশারির আড়ালে আবছা দেখায়। কাল দিনটা হল ঝামেলা। কাল একটা অগুরু আনতে হবে।

জাহ্নবী মা ও দাদাদের কাহিনী খুবই চমকপ্রদ। তালন্দি গ্রামে এই জীবিত বিগ্রহের মহাপীঠে জাহ্নবী মায়ের বই পাওয়া যায়। তাতে অনেক কথা লেখা আছে। জাহ্নবী মায়ের আবির্ভাব উৎসবের দিন বইটি অনেক বিক্রি হয়। বইটিতে তিনটি উল্লেখযোগ্য দেবী ঘটনার কথা লেখা আছে। তালন্দি গ্রামের ধনুকধারী ও তার চেলারা ছাড়া কেউই সে পুঁথিতে অবিশ্বাস করে না। জাহ্নবী মার ব্যাপারে ধনুকধারীকে চটানোও সম্ভব নয়। ধনুকধারী বাগদী। বাগদী সম্প্রদায়ের কাছেই জাহ্নবী মা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। উক্ত ঘটনার দাবিতে এখনো জাহ্নবী মায়ের আবির্ভাব পূজার প্রথম পূজাধিকারী বাগদীরা। তারা মন্দিরের সামনে পুজো রাখে। তারপর শুরু হয় অন্যদের পূজা।

বহুকাল যাবৎ, মরদেহের বয়েস বছর নব্বুই হবার পর জাহ্নবী মা আর সারাদিন সশরীরে পূজো নিতে পারেন না। জনসাধারণ তাঁর পেতলের প্রতিমারূপ প্রতিনিধিকেই পুজো দেয়। সাত দাদা মাঝে দোলায় বসিয়ে আনে দুপুর নাগাদ। যখন হাকিম-অধ্যাপক-মন্ত্রী-এম এল. এ.—ডাক্তার দারোগা, এঁরা সব আসেন।

দেবী প্রতিমাটি হেসে চলে। মরদেহে ভীমরতি। কখন হাসেন জাহ্নবী মা, কখন কাঁদেন। কখন সকলকে অকথ্য গাল পাড়েন। সবই তাঁর অসীম করুণা বলে কীর্তিত হয়। যাঁকে 'শালা' অথবা

'গুখেগো' বললেন, তিনি নিজেকে মনে করেন অসীম সৌভাগ্যবান।

একশো ছোঁবার পর মরদেহের স্বরভঙ্গ। চেতনায় বিশ্বজোড়া খিদে। নিঃস্বর গলায় 'খেতে দে' ছাড়া বাক্য নেই! মন্দিরে নামীদামী ভক্তদের আনা সন্দেশ, ফল, রসগোল্লা ও কালবোশ মাছ (মায়ের প্রিয় মাছ) দেখে মায়ের চেতনায় আলো জ্বলে। এত খাবার থাকতে তাঁর কপালে শুধু গলা ভাত, সাবুর ঘাঁট। তাই তিনি 'দে দে' বলে খেতে চান। ভিখিরির মতো কাতরে মুলো বাড়ান।

এ সময়ে এক অবিশ্বাসী বলেছিল, ওঁকে খেতে দেওয়া হয় না। খেতে চাইছেন।

রাখাল মৃদু হেসেছিল, দৈব লীলা করচেন।

খেতে দেন না কেন?

মায়ের আহার সামান্যি।

পেট ভরে খেতে দিলে মরে যাবেন?

আড়াইশো বছর লীলে করবেন। তারপর যাবেন অন্যত্তর। গঙ্গা নদী বইবে যদ্দিন, তদ্দিন থাকবেন।

তারপর কি হবে?

কিসের পর?

আড়াইশো বছরের পর?

এ দেহ তালন্দিতে রাকবেন। আবার কোতা যান?

রাখার পর এত ঠাটবাটের কি হবে?

এ অন্য দেবতা, জানলেন? সরকারের কাচে উইল জমা আচে। এই এস্টেট তখন সকলের।

আপনারা?

চলে যান।

তখন কি কিছু থাকবে?

মায়ের নেই কি? অতুল বৈভব। আমরা কে বাবু? সেবক বই তো নই। আপনি লেকাপড়া জানা মানুষ, বিশ্বেস যাবেন না। ওই পুঁথি পড়লে জানতে পারবেন।

অবিশ্বাসী যুবকটি বলে, পয়সা পিটছেন দেদার, তা গ্রামে আসার

পথঘাট করেন না কেন ?

এরপর আর অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি বলেন, এর মধ্যে যে মায়ের কি করুণা তা আপনি বুঝবেন কি করে। দেবস্থানে যেতে হলে কষ্ট করতে হয়। তাই মা এই পথটুকু রেখেছেন।

ছেলেটি বোধ হয় এতেও অবিশ্বাসী থেকে যায়। কিন্তু ফেরার সময়ে সে ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে জখম হয় এবং ঘটনাটি মায়ের দেবীত্বে অবিশ্বাসের শাস্তি বলে প্রচার পায়।

এর পরের বছর জাহ্নবী মা দর্শন দানকালে কাপড়-চোপড় নষ্ট করে ফেলেন। রাখাল অবশ্য বলে, মায়ের এখন দশম দশা চলেছে। তেলেঙ্গা স্বামীরও এ রকমটা হত।

বলে, কিন্তু সেই থেকে আর মাকে বাইরে আনে না। মলয় ডাক্তারও বারণ করে। বলে, একশো পেরিয়ে গেছেন, চোখ বলতে নেই, শরীরে আহার নেই, কবে কি হয়ে বসে ঠিক কি!

এ সময়েই মা জাহ্নবীকে একতলার এই আঁধার ঘরে আনা হয়। রাখাল বলে, ওনার তো দেহে শীত-গ্রীষ্মির বোধ নেই এখন, এখেনেই থাকুক।

মা বলে, কে ওকেনে যেয়ে গু-মুত কাড়বে ?

সব ভেবিচি। মোক্ষদা আর গোপালী করবে।

অমর অক্ষয় পরমাই মা!

রাখাল জননীর মর্যাদা ভুলে ষাঁড়ের মত গর্জে বলে, চোপড়াও হারামজাদী! মুকে নুড়ো ঘষে দোব। যার জন্যে খাচ্চ পরচ, চৌবেলা দুধ সন্দেশ সাঁটতেচ, তারে হেনস্থা ?

সেই থেকে মোক্ষদা ও গোপালী জাহ্নবী মাকে দেখে। ওরা বাগ্দী। তাতে কী ? মা তো ওদের সমাজেই পরকাশ হইয়াছিলেন। আর মায়ের কাছে সবাই সন্তান। যখন মা এ দেহ ছেড়ে অন্য দেহবাসী হবেন, তখন এস্টেট সকলের। জমি থেকে, আবাদ থেকে, তাল খেজুর গাছ থেকে, মাছের ভেড়ি থেকে, সিন্দুক পোরা টাকা থেকে, সবাই সব পাবে। মোক্ষদা আর গোপালী যদি ততদিন মা

থাকে, তাদের বংশধর যে থাকবে সে পাবে !

মোক্ষদা আর গোপালীও এ মন্তরে ভজে যায়। রাখাল বলে, যত্ন করিস বাছা, এ জন্যে টাকা দোব।

খেতে দিবি নি মোটে।

শুক্যে মারব ?

ধূরো মাগী ! পেট ভরে খেলে সইবে না।

কেন দাদা ? উনি তো দেবতা।

এ ওঁর লীলে, জানলি ?

হাঁ করে কতা কয়, গলা যে শুক্যে যায় ?

জল দিবি পলতে চুষিয়ে।

মোক্ষদা আর গোপালী বড়ই বিভ্রান্ত হয়। জাহ্নবী মাকে সেবা করা এক পরম সৌভাগ্য। গোয়াল কাড়নী থেকে সে সৌভাগ্যে উন্নীত হয়ে তাদের মর্যাদ বেড়েছে

হক কতা। কিন্তু মুকি, খেতে চায় যে ?

এরা তো দেবে না।

নিত্যি ওই গলাভাত আর জোলো সাবু, নয় বাল্লি, মানুষ খেতে পারে ? দুধ নয়, ঘি নয়।

ওরা তো খববও নেয় না।

নেবে সেই পূজোর দিনে।

ধুস্ ! একন তো পূজোতেও লেবে না।

আমার এক কতা !

কি, বল ?

উনি ঋদি জ্যান্ত দেবতা, তা'লে ওনাকে, চাইলেও দিচ্চি না, এতে আমাদের তো মহাপাপ !

সে তো নিচ্চয়।

দুজনে খুবই ভাবিত হয়। তারপর গোপালী বলে, আমার সাহস নি। তুই ঝেয়ে ধনুকধারীকে শুদিয়ে দেখ্।

কথাটি মোক্ষদার মনে ধরে। এ গ্রামের বাগ্দীরা কথায় কথায় ধনুকধারীর কাছে যায়। অভ্যাস। ধনুকধারী রাখালদের এক

প্রবল প্রতিপক্ষ। মার-দাঙ্গা কেজেতে খুবই দড় সে। দেবত্র এ তালন্দি এস্টেটের জমিতে ভাগচাষীর কোনো ন্যায্য স্বত্বই রাখালেরা মানত না।

ধনুকধারীর কারণেই ফসলের ভাগ বাগদীরা পাচ্ছে। তাছাড়াও ধনুকধারী নির্ভয়ে ভেড়ির মাছ চুরি করে, খেজুর গাছ-কাটা শিউলিদের দলে রেখে রস চুরি করে।

ওর এক কথা।

যা পারচে, ওরা লুটেপুটে নিচ্চে না? যকন উনি দেহান্তরী হবে, তকন দেকবে, যথাসব্বস্ব ওই সাত ভাই নে পগার পার করেচে। ওরা তালুক-মুলুক সরাচ্ছে, আমরা কিচু নেব না? পেটে খাব বলে নিচ্চি। পেট মোটা তো করচি না?

ওরা যে সেবায়েত নেবে না?

সেবায়েত সেবা করবে, দশজনকে দেবে। কে খেয়ে বাস কিনচে, কে করচে জমি, জানিনি কিচু? ঝার জন্যে সব, তাকে উপোস রেকেচে, গুয়েমুতে ফেলে রাকে।

এই ধনুকধারীর কাচেই যায় মোক্ষদা এক বিষণ্ণ মেঘের দুপুরে। বিশ্বচরাচরে মেঘের মলিন প্রলেপ। ধনুকধারী কোঁচের ফলা শান দিচ্ছে।

কি গো পিসি, কি মনে করে?

আসতে কি নেই?

একন পাড়োচো ঠাকুর সেবা নে—সময় কোতা?

কথাটি শুনে মোক্ষদা গালে হাত দেয়। বলে, কোতা থেকে জানলে, হাঁা? কিছু কি অজানা থাকে নে?

তোশামোদে ধনুকধারী খুশি হয়, সকল মানুষের মত এবং বলে, ঝকন দেকলাম মুকি পিসির মেয়ে আর গোপালী দিদির ব্যাটার বউ মাতায় তেল মেকে চান করে গামলা চাপা দে ভাত নে খাচ্চে তকনি জানি তোমাদের কপাল ফিরেচে।

একন বল দিকি কি করি?

মোক্ষদা তার একান্ত বাস্তব সমস্যাটির কথা খুলে বলে। বলে, হাজার হলেও দেবতা তিনি, খেতে চান!

শুনি ঝে কতা হয়ে গেচে?

বলি, কেউ কি কাচে ঝেয়ে কান পেতে শুনেচে?

কতা কয়?

ওই ছোট ছেলে হয়ে লীলে করে।

কেমন লীলে?

খাব, খেতে দে।

তোমরা কাচে ঝাও?

ও মা! বিচনা গায়ে বেঁদে, নরম বিচনা পেতিচি। সব্ব অঙ্গে যেমন চটা পড়েচে। ঠিক তোমার ঠাগমার মত। হ্যাঁ ধনুকধারী, দেবতার গায়ে চটা পড়ে?

জানি নে পিসি।

দেখে মলয় ডাক্তার দাদাদের কত বকলে। আমাদের বলিছিল, ন্যাগড়া দে, গরম জল দে অঙ্গ মুচে মুচে পোষ্কের কন্ন্। মাতায় হাত দিই, নমস্কার করি। মাতায় জল ন্যাগড়া দে মুচে দিই। বাতাস করি, ঘুমোয়।

কি ঝানি?

কত কি খেতে চায়।

ধনুকধারী নিজের মনের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করে। তারপর বলে, তোমরা ছাড়া ও ঘরে কেউ ঝায় নে?

না।

বড্ড দেকতে সাদ ঝায়।

সে হয় নে বাচা। মাচি ঢুকতে নিষেদ। ও মহল্লায় কেউ ঝায় নে। আমাদের পরে বা কত নিষেদ।

কি খেতে চায়?

মোক্ষদা উশখুশ করে ও বলে, সব লীলে গো। আমি-তুমি কি থই পাব?

কি চায়?

এই ভাত পান্তা। এই ল্যাঠা মাচ পোড়া।

ধনুকধারী গভীর বিশ্বাসে বলে, আহা! সাদ হয়! তা মহাদেব ঝদি ভাঙ-গাঁজা খেতে পারে, তো তেনার পরিবার তো উনি? তোমাদের সেবা নিচ্চে, তোমাদের খাদ্ব চাইচে। ওদের সেবা নিত, ওদের সামিগ্‌গি চাইত।

আমাদের ঝে মহাপাপ হয়।

কেন?

চাইচে দিচ্চি না।

পিসি! ঠাকুরদেবতা হোক, ঝা হোক, আচে তো মানুষ হয়ে। লুক্যে লুক্যে দিও জিবে ঠেইকে।

চোক তো ঘোলা জল যেমন, দাঁত আচে।

আচে?

হ্যাঁ গো ছোট হয়ে গেচে।

কষ্ট খুব।

না গো। কষ্ট হয় নে।

হয়নে?

না গো। হাসে কত, দেয়ালা করে।

একন উনি দেহান্তরী হলেই পারে।

সে কি তুমি—আমি দেকে ঝাব?

তা কি বলতে পারি? তবে—

কি, বল?

সেই বাবু বাড়ির গপ্প গো। দুদ চাই খাঁটি। তাতে দুদের বালতির ওপর নজর রাকতে চাকর রাকল। দুদ ছিল, জল মিশল। চাকরের ওপর চাকর রেকে চলল বাবু। শেষে দেকে কি, বালতিতে মোটে দুদ নি, জলের মদ্যে চিংড়ি মাচ নাচতেচে। আমাদেরও তাই হবে। সেবায়েতের বংশ বাড়তেচে। তবিল ফাঁক করে সব পকেট ভরতেচে। একোদিন তিনি চকু বুজলে দেকা যাবে মোদের তরে কিছু নি।

কোঁচ শানাতেচ?

ওই ঝে গো। বিলের ধারে রোদ পোহায় ? নিবারণ বলে উঠি কুর্ম অবতার ? সেই কুর্ম অবতার চিত করে রেখে এইছি তিনটে। কোঁচে গাঁথব।

অবতার নে উকি কতা ?

পেট অবতার ঝে মানে নে মোটে। মৎস্য অবতার খাই, বরাহ অবতারও খেইছি, কুর্মটা আর বাদ রাখি কেন ? ওটাও হয়ে যাক। খাব।

রঘু দাদা বলছিল, তোমার জ্বালায় গাচে কঁ্যাটাল থাকে নি মোটে। তুমি নাকি ঝাকুড়ে নে নিচ্চ।

এই দেক ! ঠাগরুন একশো পার করচেন, আড়াইশো বছর অব্দি থাকবেন। তদ্দিনে আমার গুষ্টির কে থাকবে, কে ভোগ করবে দেবোত্তরী ? আমি তো থাকবই না। তা অথণ্ডে পরমাই নি বলে কি নিখাকী হয়ে থাকব ? চোক মেলে শুদু দেকে ঝাব ওই পিচেশগুলো গাণ্ডেপিণ্ডে গিলচে ?

ধন্যি ধন্যি তুমি !

একন ঝাও দিকি। কাজ কত্তে দাও।

এ ভাবেই ভরসা পায় মোক্ষদা ও গোপালী। মার কাছে একশো বার ক্ষমা চেয়ে মুখে গুঁজে দেয় কুপথ্যি। মা জিভ আর মুখ চুকলে চুকলে খান। মায়ের বিছানা নষ্ট হয়। সে বিছানা সেরে আগলে দেয় ওরা।

ও দাদা ! পুরনো কাপড় দিও ক খানা।

কেন ?

বিচ্না বদলে দোব।

ওঃ, কাপড় বা কত লাগে ?

দাদা, বাল্লিক নি মোটে।

চিনির জল করে দিগে যা।

দাদা, ডাকতারে বলেছে পাউডার মাকাতে।

দোব, এনে দোব।

ঘরের ছ্যালে নোনা ধরতেচে।

জ্বালাস নি তোরা।

রক্তমাংসের দেবী অজর অক্ষয় পরমায়ুর অভিশাপে ছেঁড়া ন্যাকড়ার বিছানায় গড়ান। কখন হাসেন! কখন চুক চুক করে পলতে চুষে চিনির জল খান।

মন্দিরে তাঁর প্রতিনিধি পেতলের জাহ্নবী মা সিংহাসনে বসে নিত্য পূজা, আরতি, ভোগ, সব দেখেন হাসি ভরা মুখে। কীর্তন ও গান শোনেন, পুঁথি পাঠ। রাতে নাইলনের মশারি খাটিয়ে নিদ্রা যান। প্রতি শীতে গায়ে দেন নতুন লেপ।

পুঁথিতে জাহ্নবী মায়ের বৃত্তান্ত এই ভাবে লেখা আছে—

তখন ঘোর কলি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ গেছে। কলিতে পাপের বাড়বাড়ন্ত, অধর্ম—অনাচারের জয়। তালন্দির কাছে ছিল গঙ্গার মরা সোঁতা। গঙ্গা তো পাপের বাড়ন্ত দেখে সরতে সরতে দক্ষিণ হতে দক্ষিণে গেছেন। ভক্তজনের কান্না শুনে স্বর্গে বসে মা গঙ্গার মন টলে গেল। তিনি বললেন, মহাদেব! এ কি হল? পৃথিবীর মানুষের দুঃখ তো আর সয় না?

মা হয়ে তুমি ছেলে ভুলে আছ কেন?

ভগীরথ ডাকলে, মর্ত্যে গেলুম, অমন নদী হয়ে বইছি, তাতেও এত পাপ, এত দুঃখ?

তুমি আবার যাও।

কি রূপ ধরে যাব?

ওই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় তালন্দি গ্রাম। সেখানে ভূস্বামী সদানন্দ পতিতুণ্ড। তার তালুকমুলুক অথস্থল। সেখানে যাও।

ঠাকুর, কোনো পাপ না করলে মর্ত্যে জন্ম নিই কি করে?

নিজের পাপ নিজে তৈরি কর।

মহাদেব মুখে এ কথা বলছেন, মনে মনে হাসছেন। গঙ্গা রোজ একশো আটটি বেলপাতায় শিবের চরণ পূজা করেন। সেদিন পূজা করছেন। শিবের ছলনায় বেলপাতায় পিঁপড়ে। পিঁপড়ের কামড়ে শিব বলছেন, এ কি! এ কি! জাহ্নবী? তুমি কেমন অচ্ছেদ্দায় বেলপাতা তুললে? পিঁপড়ের কামড়ে আমি গেলুম।

সবাই দেখে, সত্যি! শিবের দুধের মত সাদা আঙুলে পিঁপড়ের কামড়।

শিব বললেন, যাও। তালন্দি গ্রামে যাও। সেখানে গিয়ে পতিতুণ্ডের ঘরণী হয়ে সশরীরে গঙ্গামাহাত্ম্য প্রচার কর, মানুষকে উদ্ধার কর।

মা মর্ত্যে এলেন।

এ হল আদি পুঁথির বৃত্তান্ত। এ পুঁথি যে পড়ে তার হয় অক্ষয় পুণ্য। যে শোনে তার হয় অনন্ত স্বর্গবাস। এ পুঁথির বাতাস লাগলে মরা গাছে পাতা গজায়, ফুল-ফল হয়। হাজামজা শুখো জমিতে ধান ফলে। এ পুঁথি ঘরে রাখলে অতুল বৈভব পায় মানুষ।

বছর পঞ্চাশেক আদি পুঁথি মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তারপর মায়ের চরণে ঠাঁই নিতে আসে অতুল মাস্টার। এই অতুল মাস্টারের ছিল পেটের ব্যামো। কোনো ওষুধেই আরাম হয়নি। অবশেষে সে স্বপ্ন দেখে জাহ্নবী মাকে।

স্বপ্নেই মা তাকে ওষুধ-পথ্য বলে দেন ও ঘুম থেকে উঠে অতুল মাস্টার সেই সব ওষুধ ও পথ্য শুরু করে। অচিরে রোগমুক্ত হয় সে, এবং 'রইল পড়ে ঘর সংসার' বলে চারটি আণ্ডাবাচ্চার ভার বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মায়ের থানে চলে আসে।

অতুল মাস্টার স্কুলের শিক্ষক নয়। সে মোমিনপুরের বিখ্যাত যাত্রার পালা-লেখক। পঁচিশ টাকা পেলে সে দুটো সালে পালা লিখে দিত, বারো টাকা পেলে একটি। ১৯২০-২২ গ্রামে-গঞ্জে যে সব পালাগান হত, তার অনেকগুলিই তার লেখা। কমলে কামিনী, পুরান ভকত, নদের নিমাই ইত্যাদি পালাগান তার লেখা।

অতুল মাস্টার আসে এবং থেকে যায়। প্রথমে সে গঙ্গাবতরণ, মর্ত্যে জাহ্নবী ইত্যাদি পালাগান লিখে ও শুনিয়ে গ্রামবাসীদের মোহিত করে। তারপর সে একদিন রাখালের বাপকে বলে, দাদা! পুঁথিখানা নতুন করে লিখতে হচ্চে।

কেন?

দাদা, তোমরা যুগের হাওয়া বোঝ না। এখন মানুষের ভূমিকা

বড় করে দেখালে মানুষের মনে দাগ কাটবে, জানলে? যে কালের যা রীতব্যাপার। মায়ের কথা লিখে দিচ্ছি। সাকুল্যে পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে। ছাপিয়ে নোব পাঁচ হাজার করে দুই লট।

বাস। দশ হাজার বই বেচলে ছয়শো টাকা পাচ্চ। একটা তালুক হয়।

লেখো দিকি।

অতুল মাস্টার পুঁথি লেখে। পুঁথি ছাপায়। রাখালের বাপকে দশ হাজার পুঁথি দেয় ও জাহ্নবী মাকে প্রণাম করে আবার ঘরে ফেরে।

ছাপাখানার সঙ্গে বন্দোবস্তে এক লট পুঁথি সে নিজের বাড়িতেই রেখেছিল। সেখানে গিয়ে এখন অতুল মাস্টার কালীঘাটে, চেতলার হাটে, রথের মেলায় পুঁথি বেচতে থাকে। তার চেষ্টাতে যাত্রা দলরা মায়ের ভক্ত হয় এবং মায়ের মন্দিরে বাৎসরিক উৎসবে যাত্রাগানের আসর করতে থাকে।

এভাবে মায়ের মহিমা নব নব জায়গায় প্রচার পায় তো বটেই। অতুলেরও দুপয়সা হয়। বই সে ছাপিয়েই চলে। বই বেচেই অতুল মাস্টার বেশ গুছিয়ে নেয়। গঙ্গাভক্ত বলে তার নাম খ্যাত হয় ও ক্রমে সে 'সুলভে জ্যোতিষশাস্ত্র' পড়ে হাত দেখতে শুরু করে।

এ সময়েই সে চুল কাটা ছেড়ে দেয় ও আলুলায়িত চুলে, জঙ্গুলে দাড়িগোঁফে সুশোভিত হয়ে বার দিয়ে বসে। সবই মায়ের দয়া গো। তার খোলার চাল টিনের চালা হয়। মেয়েদের বিয়ে হয়। ছেলেরা দেয় পাঁচালী স্তোত্র ব্রতপূজার কেতাবের দোকান। জাহ্নবী মা বিন কে পারে তরিতে গো—গানটি অতুল গাইতে শুরু করে। এই অতুলকে মা পরোক্ষে দাঁড় করিয়ে দেন।

যুগের হাওয়া বুঝে অতুল যে পুঁথি লিখেছিল, সেটি এখনো চলছে। তাতে যে কাহিনীটি আছে, তা স্বর্গসত্য জড়িয়ে।

মহাদেবের আদেশ চাঁদেশের কথা এতে নেই। এতে লেখা

আছে ভক্ত সদানন্দ পতিতুণ্ডের তালুকের সরবালা নাম্নী মেয়ের ওপর গঙ্গার অহৈতুকী কৃপার কথা।

সদানন্দ পতিতুণ্ড ছিলেন এক সমৃদ্ধ ভূস্বামী। অগাধ ধনসম্পত্তি তাঁর। তালুক মস্ত বড়। সরবালা (জাতের উল্লেখ নেই) এক সামান্য মেয়ে। সে ছিল সদানন্দের আশ্রিতা। সদানন্দ নিত্য গঙ্গাপূজা করতেন গঙ্গার মরা সোঁতায় নেমে। সোঁতাটি ছিল নাবাল। বর্ষায় তাতে জল হত, বর্ষা গেলে জল শুকোত।

এই সদানন্দ ছিলেন নিঃসন্তান। তাতে তাঁর মনে ছিল অপার দুঃখ। কিন্তু মা গঙ্গার লীলা কে বলতে পারে? এই সদানন্দের কি ত্রুটি হল বলা যায় না। হঠাৎ তাঁর ধানের মরাই ইঁদুরে খায়। গোহালে গরু মরে, অবশেষে এক রাতে শোনা গেল কান্না, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির লক্ষ্মী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুকের চাবি অন্তর্ধান, ঘরে ঘরে বাতি নিভল, উনোনে ভাত নিমেষে পুড়ে আঙ্গার হল। পালে পালে আশ্রিতজন সদানন্দের ঘর ছেড়ে যায়।

সরবালাও বেরুল ঘর ছেড়ে। চলে, চলে গঙ্গার সোঁতায় জল, সে বসল সোঁতার পাড়ে। বসতে না বসতে অঙ্গ ঢেলে দৈবী নিদ্রা। ঘুমে সরবালা বিবশ, বিবশ।

হঠাৎ শোনে শঙ্খ-ঘণ্টা-দুন্দুভি। চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসে সরবালা। আকাশ নিকষ কালো। উঠে সে কি দেখল? আহা, চরাচর, কালি ঢালা, শুধু মরা সোঁতায় শতলক্ষ ঢেউ গর্জায়, চারদিক আলোয় আলো হয়, বাতাসে চন্দনের গন্ধ, আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি।

সরবালা, ভয় ভীতে কাঁপে। এখন সোঁতার বুকে দিব্যস্তুতি ছাড়িয়ে দেখা দিলেন মকরবাহিনী গঙ্গা। বললেন, এই যে, আয় বাছা! আমার কাছে আয়।

দৈবী লীলা। সরবালা জলের ওপর পা ফেলে হেঁটে যায়। মা তাকে কোলে টেনে নেন। বলেন,

কলিকালে সত্য-ধর্ম ভক্তি-শুদ্ধি নাশ
তাহাতে তোমার দেহে মোর পরকাশ ॥
তুমি হইলে আমি, এবে তুমি হইলে আমি
মর্ত্যধামে দেখা দিবে পোহাইলে স্বামী ॥

মকরবাহিনী আরো বলেন, এই নে সিন্ধুকের চাবি। এই নে এই ছেলে দিলাম। সশরীরে পূজা নিবি। ভক্তজনে মন্ত্র দিবি, কাজ ফুরালে আমাতে মিলাবি, এখন কলি চলবে কতকাল। যতকাল চলে, মর্ত্য শরীর জীর্ণ হলে সে দেহ ছেড়ে নতুন দেহে নতুন দেশে যাবি। আজ হতে তোর মরণ নাই। ছেলে হতে সেবক বংশ হবে, পতিতুণ্ডকে বলছি।

সুখে আনন্দে সরবালা মূর্ছা যায়। যখন জ্ঞান ফেরে, তখন তার হাতে পতিতুণ্ডের সিন্দুকের চাবি, অঙ্গে দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার, কোলের কাছে এক দেবশিশু।

দেবশিশু কোলে সরবালা গ্রামে ফেরে। আহা গো, তার পায়ে পায়ে ফোটে পদ্মফুল। তার পিছনে পিছনে নদীর ধারা। গ্রামের মানুষ সভয়ে পেছন পেছন যায়। পতিতুণ্ডের ঘরে দাঁড়াতেই সরবালা নিমেষে হয় মকরবাহিনী গঙ্গা। তাকে দেখে সবাই প্রণাম করে। দৈববাণী শোনা যায়, ইনি জাহ্নবী মা! সশরীরে তোমাদের ত্রাণ করতে এসেছেন। এই পুত্র দেবতার দান। এ হতে পতিতুণ্ডের বংশ থাকবে। আজ হতে পতিতুণ্ড এঁর সেবক, ইনি গঙ্গার অংশ, সেই বুঝে এঁর সঙ্গে ব্যবহার রাখবে।

সরবালা ঢুকতেই গোহালে গরু ফেরে, উঠানে রাম-লক্ষ্মণ ধানের গোলা হয়, কড়াইয়ে দুধ উথলায়, সিন্ধুক উপচে মোহর পড়ে।

এততেও যেন অবিশ্বাসীর সংশয় যায় না। এঃসময়ে মাতঙ্গ বাগদীর বউ মরা ছেলে নিয়ে মায়ের পায়ে দেয় ও কেঁদে বলে,

পুত্র বিনা এ সংসারে কেহ নাই আর
দরিদ্রের খুদকুঁড়া এ পুত্র আমার ॥
নিদ্রাকালে কাল ফণী হরিল জীবন
সত্বর জীয়াও মাতা এই নিবেদন ॥

মা হেসে বলেন, বাছা! কত ঘুমাবি দেখ?

দেখ, তোর মা কাঁদে, তোর বাপ কাঁদে। ওঠো ওঠো বাছা আমার।

মায়ের ডাকে মরা ছেলে খলবল করে জেগে ওঠে ও মায়ের কোলে ঝাঁপ দেয়।

জাহ্নবী মা বলেন, এইবার তোমরা জানলে আমি কে! আমার দেবলোকের হিসাব অন্য তোমাদের মরলোকের হিসাব অন্য। তোমাদের হিসাবে আমি এখানে থাকব আড়াইশো বছর। তারপর দেহান্তরী হয়ে অন্য কলেবরে অন্যত্র যাব। সেখানে থাকব আড়াইশো বছর। এইভাবেই থেকে যাব আমি। অনাদি অনন্ত কাল। যতদিন গঙ্গা বইবে, ততদিন আমি আছি।

সকলে জয় জয় বলে, হুলাহুলি পড়ে যায়। মা করুণাভরে বলেন, মাতঙ্গের ছেলে জীয়ালাম, মাতঙ্গ আজ, আর পরে বাগ্দীরা আমাকে প্রথম পূজা দেবে। পূজার প্রথম অধিকাব তাদের রইল।

তখন সদানন্দ বলে, মাতঙ্গ কি দিয়ে পূজা দেবে মা? আমি তারে পূজোর সামিগ্‌গি দোব। ওরা হল ছোট লোক।

কচু-ঘেঁচু-ওল খায় ল্যাঠা মাছ পোড়া
পান্তা-পচা শুঁটা মাছ খায় বন বরা॥
পরনে গলিত বাস, বাস কুঁড়ে ঘরে
খাজনার কড়ি দিতে জানে প্রাণে মরে॥
তারা তোমার কি দিয়ে পূজা করবে মা?

মায়ের নয়ন রক্তাভ হল। তিনি বললেন, সদানন্দ! আমার পূজা আমি নেব।

মা চললেন বাগ্দী পাড়া। তখন সদানন্দ বুক পেতে দিল। ক্ষমা চাইল বার বার। তখন মা প্রসন্ন হলেন। বাগ্দীদের বললেন, তার ঘরে যা আছে, তাই এনে পূজা দিক মাতঙ্গ।

মাতঙ্গের ঘরে ছিল আউশের ভাত, ল্যাঠা মাছ পোড়া, আদার রস, লঙ্কা, লেবুর রসে মাখা—আর শাক। তাই আনল সে। মায়ের বরে সামান্য অন্নে অমৃতের স্বাদ। সে এক থালা অন্ন ব্যঞ্জন আর

ফুরোয় না। চৌপর দিন সকল লোক সে অন্ন খেল। মা গিয়ে পতিতুণ্ড গৃহে অধিষ্ঠিত হলেন।

জাহ্নবী মায়ের কথা জাহ্নবী সমান
শ্রবণে অশেষ পুণ্য ফল গঙ্গাস্নান॥
গঙ্গাস্নানে যত পুণ্য হয় মহাশয়
শ্রবণে ততেক পুণ্য জানিবে নিশ্চয়॥

সেই ছেলে বড় হল। মা ঘরে আছেন। জাঁয়ন্ত দেবতা। তাতে অগাধ বৈভব হল। কিন্তু ছেলে যুবা হতে তার মনে বিপরীত বুদ্ধি।

প্রজা ধরে প্রজা মারে করে অত্যাচার
প্রজা কাঁদে দেখি তার বিষম ব্যাভার॥
মায়ের শ্রবণে কান্না পশিলেক যেই
বজ্রপাতে অত্যাচারী প্রাণ তেগে সেই॥

মহানন্দ মরল। তার স্ত্রী এসে কেঁদে পড়ল। মা বললেন, ওকে আর জীয়াব না। অতিদর্পে রাবণ মরেছিল। সে কথা ও মনে রাখে নি। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার এক ছেলের সাত ছেলে হবে।

প্রজাদের ডেকে মা বললেন, ঢোলসোহরে ঢেঁড়া দিয়ে সকলকে আনো।

সবাই এল।

মা বললেন, যা হয়েছে তা আর হবে না। তোমরা নির্ভয়ে থাক। পতিতুণ্ডরা আমার সেবায়েত মাত্র। এ বৈভব সবই আমার। দেহান্তরে আমি যখন নতুন কলেবর ধরব, তখন এই সব কিছু তোমাদের হবে। স—ব!

মাতঙ্গের ছেলে ভীম বলল, মা! অভয় দাও তো বলি! সেদিন কে রইবে, কে জানবে? মর্ত্য মানুষ তো লেখাপড়া করে দেয় মা।

মা অভয়হাস্যে বলেন, তাই হবে।

মায়ের ভক্ত হাকিম—আমলা। তারা তখনি লেখে দানপত্র। তালন্দির শস্যক্ষেত্র, জলাশয়, অরণ্যভূমি, সকলই মায়ের, আর মায়ের

ইচ্ছায় তালন্দির সর্বজনের। পতিতুণ্ডরা সেবায়েত মাত্র। দান-বিক্রয় আত্মসাতে অনধিকারী। তারা মায়ের এই কলেবরকালে এ সম্পত্তি হেফাজতদার। তারা এ সম্পত্তি সমৃদ্ধ করবে। মায়ের দেহান্তে সমৃদ্ধ, সম্পন্ন তালন্দি তালুক দিয়ে যাবে সর্বজনকে।

হাকিমের বুদ্ধিতে দানপত্র গচ্ছিত থাকে আদালতে।

এখন মা প্রজাবর্গকে ডাকেন। মহানন্দ যার ঘর জ্বালিয়েছে, সে পায় নতুন ঘর। যাকে মেরেছে, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আরাম করেন। হাকিম আমলা দারোগার সামনে গোদা মাঝির পায়ের গোদ খসে, হারাম মালাকরের গলগণ্ড দূরে যায়, পারি—হারি—সারি তিন কানা বোন পায় নতুন চোখ।

এ ভাবে যুগে যুগে মা তাঁর দৈবী ক্ষমতা দেখিয়ে ভক্তজনকে মুগ্ধ করেন। জয় মা।

দুষ্ট দারোগা সজল হালদার ছিল ঘোর অত্যাচারী। মায়ের ভক্ত হয়ে তার দুষ্ট বুদ্ধি দূরে গেল।

রামা—কালু দুই ডাকাত এসেছিল মায়ের গহনা চুরি করতে। মা দাঁড়ালেন। শুকনো ডাঙা সাগর হল। হাঙর-কামট-তিমি কুমির মায়ের সন্তান সব, দুই ডাকাতকে গ্রাস করে যেমন জলে লুকাল, অমনি শুকনো ডাঙা যেমন ছিল তেমন হল।

মায়ের পুঁথি পাঠে লক্ষ গঙ্গাস্নানের পুণ্য। যে শোনে সে বৈকুণ্ঠ যায়।

মায়ের পুঁথি পাঠে কোটি গঙ্গাস্নানের পুণ্য। যে পড়ে সে অক্ষয় স্বর্গ পায়।

মায়ের পুঁথি কিনলে অযুত-নিযুত কোটি গঙ্গাস্নানের পুণ্য। সে সবংশে, স-আত্মীয়-বন্ধু-কুটুম্ব অক্ষয় স্বর্গ বাস করে।

এই পুঁথিটি আদি পুঁথির বাজার নষ্ট করে। এখনো এই পুঁথিই চলছে। সারা বছরে। এতবার সময় ও মানুষ বদলে যাবার পরেও। এ পুঁথি বিক্রি হয় পাঁচ-ছয় হাজার। এখন দাম এক-এক টাকা। ঝড়তি পড়তি ছেঁড়া পুঁথিগুলি রঘু লাল কাপড়ে জড়িয়ে পূজার উদ্দেশ্যে বেচে। তাতেও ভাল পয়সা ওঠে।

মাঝে তেমন বিক্রি হচ্ছিল না। সেই থেকে রঘু নিয়ম চালু করেছে। মকর সংক্রান্তির দিন পূজার পুঁথির বিসর্জন, নতুন পুঁথি আবাহন।

রঘুর বুদ্ধিতে আরো আরো আয় বেড়েছে। পেটি বোঝাই হোমিওপ্যাথি ওষুধের খালি শিশি কিনে আনে রঘু। সারা বছর ধরে ও বিক্রি করে চলে শিশি বোঝাই জল। এটি দেখে নিবারণ।

মায়ের চরণামৃত, এক শিশির দাম চার আনা। এ শিশির বিক্রি সারা বছর থাকে। এটি দেখে বিপিন।

মায়ের স্নানের জল, এক শিশি দশ পয়সা। এ জল প্রতি সধবার অবশ্য ব বহার্য, প্রত্যহ। এ জলের মাহাত্ম্যে সধবা পতিপ্রিয়া হয়। এটি দেখে নেপাল।

মায়ের বৈকালী হাত-মুখ ধোয়া জল, এক শিশি দশ পয়সা। এ জল ব্যবহারে অনূঢ়ার বিয়ের ফুল ফোটে। এটি দেখে রতিকান্ত।

রাখাল মায়ের পিদিমের তেল বেচে দশ পয়সা শিশি। এ তেল সর্বরোগহর।

গোপাল বেচে মায়ের প্রসাদী ফুল। দশ পয়সা মোড়ক। এ ফুল সর্বার্থসাধক। ফুলটি ঘরে রাখলে মামলায় জিত হয়, বর্গাদার জমি রেকর্ড করায় না, নকসাল ভীতি থাকে না, রোগ-শোক দূরে যায়, মরুবেত গাছ ফল দেয়, হারানো গরু গোয়ালে ফেরে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রঘু এসব ধান্দায় নেই। সে জোগাড় করে মায়ের প্রাত্যহিক প্যালা। চাকরের কাঁধে কেরোসিনের টিন চাপিয়ে ও বেরোয়। টিন ফুটো করে কেরোসিন বের করে নেওয়া হয়েছে। তারপর পয়সা ফেলার জন্য খানিকটা কাটা হয়েছে। তালন্দির প্রতি নর-নারী-বালক-বালিকা আণ্ডাবাচ্চা, প্রত্যেকের নামে রোজ বাড়ি বাড়ি পাঁচ পয়সা করে জোগাড় করে ও।

ধনুকধারী বলে, পিটতেচ খুব।

কিচু নয়, কিচু নয়।

কিচু নয়?

ক্ষেপে ওঠে ধনুকধারী। বলে, নতুন নতুন জুলুম বের কত্তেচ। বলি, তিনি কি বলেচে এ সব করো?

সব তো তোদের জন্যে রে।

ফাঁক করতেচ তবিল।

কি যে বলিস! তোরা কি নিজেদের আখের বুঝে এতো পয়সা জমাবি? তাতেই কৌশল করে জমিয়ে দিচ্ছি। যখন তিনি দেহ ছেড়ে অন্য শরীলে অধিষ্ঠান হবে তকন তোদের হাতে রাজার ঐশ্চর্য তুলে দেবে।

সে ঝা বলো। আমি দিচ্ছি নে।

মহাপাতক ডেকে আনচিস রে।

আনলে আনচি, বউ মরে গেচে। সোমসারে একা মনিষ্যি। পাতক হলে হবো।

কত বড় মাচটা?

হ্যাঁ গো, বিলের মাচ।

রঘু নিশ্বাস ফেলে। ধনুকধারীর সঙ্গে লাগা সম্ভব নয়। ওর কথায় বাগ্দী-তিওর-ক্যাওট ওঠে বসে। ধনুকধারী আরো বলে, প্যানাপুকুর সাফ কত্তেচ।

পাঁচজনা জল পাবে।

কোনো ধান্দা আচে।

কি যে বলিস?

পানা পুকুরটিও এখন আয়ের পথ বাজা গাই যেন দুধ দিচ্ছে। পুকুর সাফ হল, ঘাট বাঁধানো হল। তারপর ঢাকঢোল বাজিয়ে রাখালরা সাত দাদা পেতলের মাকে এনে পুকুরে চোবাল।

সেই থেকে ওটি মায়ের পুকুর। পুজো যখন দাও, ওতে ডুব দিতে হয়। সে জন্যে মন্দিরে দশ পয়সা জমা রাখো, টিকিট নাও, ঘাটে গিয়ে রঘুকে টিকিট দেখাও, তবে জলে নামো।

এই ধনুকধারীরা মায়ের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আরেকটি কাহিনী বলে। কাহিনীটি তারা লিখতে জানে না বলে কোন পুঁথি লেখা হয়নি।

কাহিনীটি কোনো অংশেই অলৌকিক নয়। বাগ্দী তিওররা

এ কাহিনীতে বিশ্বাস করেও দেবীত্ব ও অলৌকিকত্ব বিশ্বাস করে, সেটি খুবই দ্যোতক।

কাহিনীটি প্রাচীন।

একশো বছর আগে এ সব জায়গা খুবই অনুন্নত ছিল। এখানকার মতনই। সদানন্দ পতিতুণ্ডি তালন্দির জমিদার। তার ছিল উপরি রোজগার ডাকাতি। শোনা যায়, তার শ্বশুর ও শাশুড়ি মেয়েকে একবার দেখে তীর্থ বেরোবেন বলে তালন্দি আসেন। শাশুড়ির সর্বাঙ্গে গহনা ছিল, শ্বশুরের কাছে ছিল টাকার তোড়া। তাঁরা আর ও বাড়ি থেকে বেরোন নি। সদানন্দ তাঁদের মেরে পুঁতে ফেলে।

এই সদানন্দের স্ত্রী ছিলেন গঙ্গা। গ্রামের লোক তাঁকে কোনোদিন দেখে নি। গঙ্গা সদানন্দের প্রথমা নন। কিন্তু অন্য স্ত্রীদের খবর জানা যায় না।

ডাকাতি ছাড়াও সদানন্দ মেয়েছেলে ধরিয়ে আনতেন। সে সব মেয়েদের আর কেউ বাড়ি ছেড়ে বেরোতে দেখে নি। তখন গঙ্গা সোঁতা ছেড়ে সরে গেলেও, মাইল দুয়েক দূরে ছিল। সমুদ্র খুব দূরে নয়। ফলে গঙ্গায় প্রবল স্রোত। মানুষ মেরে ফেলে দিলেও কেউ হদিশ পেত না।

সরবালা ছিল বাগ্দী পাড়ার মেয়ে এবং বউ। মোটামুটি রূপবতী, স্বাস্থ্য ভালো। বছর পনেরো-ষোল বয়েস হতে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার কথা হচ্ছিল। শ্বশুরবাড়ি সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে। বাঘের দেশ বলে মা বাপ এতদিন মেয়ে পাঠায়নি। জামাই গড়িয়াতে কোন্ জমিদারের লেঠেল হয়ে চলে আসে। তাতেই ওরা মেয়েকে গড়িয়া পাঠাচ্ছিল।

তার আগেই সদানন্দের লোকজন সরবালাকে তুলে নিয়ে যায়। সরবালার মা-বাপকে মেরে বের করে দেয় গ্রাম থেকে। ঘটনাটি কিন্তু নতুন নয়। এ রকম আগেও হয়েছে। কিন্তু নতুন যা, সদানন্দ সরবালাতে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যান। সরবালাকে আর দেখেনি গ্রামবাসী। তারা ধরেই নেয়, সরবালা আর নেই। গঙ্গায় ভেসে গিয়েছে লাশ হয়ে।

সরবালা কিন্তু পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। বর্ষার রাতে, গঙ্গায় মরা সোঁতায় যখন উবুচুবু জল, সে বাড়ি পালায়। সোঁতার ঘাটে গিয়ে ডিঙি খোঁজে। ডিঙি বাঁধা থাকলে, সোঁতা পেরুবে। পেরিয়ে পালাবে।

সে সময়ে তাকে ভীত ও বিস্মিত করে পতিতুণ্ড বাড়ির দিক থেকে ছুটে আসেন এক অপরূপ মহিলা। তাঁর কোলে এক ছেলে। গায়ের গহনা, আঁচলের চাবি ঘাটে রেখে তিনি ঝাঁপ দিতে যান জলে। ছেলে নিয়ে।

সরবালা নিমেষে বোঝে ইনি কে। এঁকে সেও চোখে দেখেনি। সে ছিল বাহির মহলে। নিজের বিপদ ভুলে সে ডেকে বলে, মা! এ কি কর?

মহিলা বলেন, কে? কে ডাকল?

আমি গো!

'আমি' কে?

সরবালা। তুমি, তুমি…

আমি গঙ্গা। ভাল হয়েছে, মা গঙ্গা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই গহনা নাও, চাবি নাও, ছেলে নাও।

সরবালা অভিভূত হয়ে ছেলে কোলে নেয়। মহিলা এখন ডেকে বলেন, বাপ-মাকে মেরেছে, মেয়েছেলে নিত্য মারে, পাপের পুরীতে থাকব না মা! মা গঙ্গা, গঙ্গাকে নাও।

এ কথা বলে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। অবিশ্রান্ত বর্ষায় মরা সোঁতায় স্রোত। সোঁতা গিয়ে পড়েছে বড় গঙ্গায়। মহিলা কালো জলে অদেখা হন।

সরবালার মনে সবটা এক অলৌকিক ঘটনা বলে প্রতিভাত হয়। ছেলে কোলে নিয়ে সে কি করবে ভেবে পায় না। স্বয়ং গঙ্গাই কি তাকে সব দিয়ে গেলেন? গহনা নেবে কোথায়? অবশেষে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ও গহনা ও চাবি আঁচলের কোণে বাঁধে? তারপর বাগ্দীপাড়া।

মাতঙ্গ বাগ্দী তাকে দোর খুলে দেয়। সরবালা বলে, আগে ছেলে ধর, একটু দুধ খেতে দাও ওরে।

সব শুনে মেলে গাঁজার ভোমায় আচ্ছন্ন মাতঙ্গ তাকে প্রণাম করে।

ও কি কত্তেচ গো?

তুই আর সরো নোস।

তবে আমি কে?

মা গঙ্গার ছেলে কোলে, মা গঙ্গার গয়না আঁচলে, তুই একন গঙ্গা মা।

তোমার মাতা! বাবুর বউ মোল।—মাতঙ্গের বউ বলে ও বাসি ভাত, হিঞ্চে শাক, ল্যাঠা মাছ পোড়া খেতে দেয় সরবালাকে থালা সাজিয়ে। বাবু বাড়ির ঘি-দুধে অরুচি, অরুচি। মনের মত ব্যঞ্জন পেয়ে সরবালা তৃপ্তি করে খায়।

মাতঙ্গ বলে, না। বাবুর বাড়ি বউ হয়ে মা গঙ্গাই ছিল। নইলে সরোর পেচনে আসবে কেন? ঝা বুজবার, বুজিচি। মা তুই গয়না পর। এরা কি ঝানবে? মহাভারত শুনিচি, মা গঙ্গা সন্তানদের জলে ফেলত। কাল তো এ ছেলেকেও জলে ফেলত। দেকল সরোর দেহে তিনির বাস হবে, সরোর কোলে দিল।

মাতঙ্গের কথাগুলি সকলকে বিবশ করে, বিবশ করে। ভোরের আলোয় সরবালা গহনা পরে, চুল খুলে দেয়, ছেলে কোলে নেয়। মাতঙ্গরা ঢাক বাজিয়ে বাজিয়ে তাকে নিয়ে পতিতুণ্ড বাড়ি চলে। সঙ্গে চলে বাগ্দী তিওর-ক্যাওঠরা।

পতিতুণ্ড বাড়িতে তখন হুলস্থুল পড়ে গেছে। সরবালা নেই, ঘরের গৃহিণী নেই, বংশধর নেই। পতিতুণ্ড হো হো করে কাঁদছে। বউ ছেলে আবার হবে। আরেক সরবালা মিলবে। স্ত্রীলোক ও শিশুর কোনো দাম নেই। তাদের নিরুদ্দেশ হওয়া কোনো অলক্ষণও নয়। সিন্দুকের চাবি নেই কেন? সে যে ঘোর অলক্ষণ।

এরই মধ্যে ঢাক ঢোল বেজে ওঠে। পতিতুণ্ড চমকে ছুটে আসে। মাতঙ্গ হেঁকে বলে, জমিদার বাবু! মা গঙ্গা একন সরবালার

দেহে অধিষ্ঠান। তিনি মকরবাহিনী হয়ে চলে গেচে। বলে গেচে, সরবালা উনির অংশ।

পতিতুণ্ড এ কথা মেনে নিতে চায় না। কিন্তু তার পুরোহিত এখন স্পষ্ট দেখতে পান, সরবালা মকরের পিঠে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পায়ের কাছে ও বৃষ্টির জল নয়, কলকল্লোলিনী গঙ্গা। ও গুলো ব্যাঙ লাফাচ্ছে না, হাঙর-কামট খেলা করছে।

মা গো! দীনদয়াল পানিগ্রাহীকে দয়া কর মা। তোমার অধম সন্তান আমি।

সদানন্দের কুকাজের কাজি ঈশ্বর লেঠেলই সরবালাকে ধরে এনেছিল। এখন তারও গঙ্গা দর্শন হয় ও, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে, অঙ্গ যামন ঝাঁকি দিয়ে উঠতেছে, লৌ জ্বলে যায় গো মা! বলে সে ঠাস করে পড়ে মুর্ছা যায়।

সদানন্দ গত রাতের সরবালাকে জৈবীতাড়নায় উত্তম খুত্তম করে মেরেছে। এখন সে দেখে সরবালার কোলে ছেলে, আঁচলে চাবি। সেও প্রণাম করতে যায়, কাদায় পিছলাও ও আছাড় সামলাতে মাতঙ্গের ঠ্যাং ধরতে যায়। গাঁজার দমে ও দেবী মাহাত্ম্য আবিষ্কারের মত্ত উল্লাসে মাতঙ্গ তার মাথা ধরে সরবালার পায়ের কাছের মাটিতে ঠুকতে থাকে, প্রণাম কর, প্রণাম কর।

করিচি, ছাড় ছাড়।

ইনি দেবী।

হাঁ, রে হা।

অনেক ভাগ্যি তোমার যে তোমার ঘরে এয়েচেন। একন পূজা-নৈবিদ্যিতে রাখবে কি না বল। নইলে আমার ঘরে উনি পরোকাশ হয়েচেন, আমরা মাথায় করে নে ঝাব। তোমার বলতে কিছু রাকব না। চাবি ওনার কাচে।

মাটিতে মুখ গোঁজা অবস্থাতেই সদানন্দ এ কথার ভয়ঙ্করত্ব বোঝে। বাগ্দী-তিওররা বুনো রাগী জাত। ওরা অনেকে, সদানন্দ একা। তার লেঠেল-বর্শেলরাও বাগ্দী। ভিন্ গ্রামের। ওরা সব জুলুম সয়ে যায়। কিন্তু হয়তো ওরা ক্ষেপে আছে মনে মনে। সইছে,

সইছে, যদি না সয় ? সাহেবদের নীল চাষই বন্ধ করে দিয়েছিল, সদানন্দ তো নীলকুঠির গোমস্তাই ছিল এক কালে।

ওদের সরবালাকে ওরা যদি দেবী হিসেবে পায়, হয়তো বা তাতে উৎসাহ পাবে। হয়তো বা ক্ষেপে উঠবে। বর্শেল লেঠেলরাও হয়তো গিয়ে সামিল হবে। সে একা, ওরা অনেকে। সরবালাকে কেন্দ্র করে এক নতুন হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে।

সদানন্দ হামা টেনে এগোয় ও সরবালার পা ধরে বসে, কোতা যাবে মা ?

ছুঁও না !—সরবালা ছিটকে সরে যায় ও সাত্যা জ্ঞানপ্রাপ্ত ঈশ্বর লেঠেলই, মাকে ছোঁওয়া !—বলে মনিবকে চড় মারে। সে চড়ে যে সদানন্দের মুখ বেঁকে যায়, আর সে মুখ জীবনে সোজা হয়নি। ঈশ্বরের হাতের চেটো ও চড়ের জোর সুবিদিত।

সদানন্দ মেরে অভ্যস্ত, মার খেয়ে নয়। চড় খেয়ে সে কাঁদে ও বলে, সেবক হয়ে থাকবো মা গো।

আমি ও বাড়িতে ঢুকব না। পাপের পুরী।

ঈশ্বররা তখনি বাইরে তোলে নতুন ঘর। সে ঘরে দেবী হয়ে বসে সরবালা। ছেলে মানুষ হয় দাসীর কাছে। ঈশ্বররা রাতদিনে পাহারা দেয় দেবীকে। সনাতন কাছেও আসে না, দেখে যায় শুধু।

মকরসংক্রান্তির দিন তালন্দিতে মহোমচ্ছব লেগে গেল। আশপাশ থেকে সবাই এলো দেবী সন্দর্শনে। যত মিষ্টি, মুড়কি, ফল, পয়সা সব দেবী বিলিয়ে দিলেন।

দীনদয়াল পাণিগ্রাহী বললেন, সদানন্দ ! করচ কি ! জীয়ন্ত দেবীকে রেখোচো কুঁড়েঘরে ?

মন্দির তো এক কতায় কত্তে পারি। সিন্দুকের চাবি একনো ওনার কাচে।

সে কি আর তাঁর মনে আছে ?

আমার সব চুলোর দোরে গেল।

কেন ?

ঈশ্বররা অবধি ওকেনে সামিল।

বিষয় বিষ সদানন্দ !

ভিকিরি হয়ে গেলাম।

এ হেন সময়ে সদানন্দের মামা নকুড়চন্দ্র ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির। ভাগ্নেকে তিনি নকড়া ছকড়া করলেন। বললেন, দেবতা ফেলে দিচ্চে, নিতে জান না ?

কি করব ?

ভেমো বাগ্দীরা জীয়ন্ত দেবতা পেয়েচে, মহানন্দ আছে। এক পো ছুধে ক্ষীর বানাতে ওরা জানে ? আমরা জানি। আমার ওপর সব ছেড়ে দাও দিকি। চলো, হাতে পায়ে ধরে চাবি চেয়ে নিই বা।

ঈশ্বরবা, মাতঙ্গবা সে চাবি নিতে দেবে না। মামার শিক্ষায় সদানন্দ কবুল খেলেন, চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলবেন।

মা যখন নরদেহে আছেন, তখন তাঁর জন্যে দালান উঠবে, নতুন মন্দির। এ সবই এখন মায়ের। মায়ের সেবক সদানন্দ।

মা যতদিন আছেন, তারপর ?

নকুড় সব জমি জাল করার দায়ে হরিণ বাড়ি খেটে বেরিয়েছেন। তিনি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, পাগলা ! তোরা হলি মায়ের পাগল ছেলে। মা সশরীরে থাকবেন আড়াইশো বছর। যতদিন গঙ্গা নদী বইবে, ততদিন ওঁকে থাকতে হবে। আড়াইশো বছর পুরলে এই দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যাবেন। ইংরেজের রাজত্ব, গঙ্গা নদী, মা, এ তিনের রয়ক্ষয় নেই। এখন বুজলি !

মানুষ আড়াইশো বছর বাঁচে !

পাগল তোরা ! আমাদের আড়াইশো বছর, ওনাদের চোখে এক পলক মাত্তর। দেবতার হিসেব আলাদা। আমি সারা জীবন কাটালুম তীর্থ ধর্মে। কাশীতে তেলঙ্গস্বামী ! আহা হা, পাঁচ হাজার বচর রয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ ! আহা হা, পাঁচশো বচর বয়েস হল, কেমন বিরাজ কচ্চেন। ইনি তো স্বয়ং মা জাহ্নবী। আজ এঁর মহিমা শুনিয়ে দোব।

এত কথার পর চাবি ফেরে সদানন্দের কাছে। নকুড় বলেন, দালান

তোল, পূজো দালান বানাও, আমি মায়ের মহিমা প্রচার দিই শতলক্ষ ভক্ত আসবে, ধুলো মুঠো ধরবে সোনা মুঠো হবে।

ফিরে মকর সংক্রান্তিতেই নকুড় মামার কথার যথার্থ্য প্রমাণিত হয়। জমিদার, দারোগা, ব্যবসায়ী, সব তা-বড় লোক আসতে থাকে। ঝমাঝম প্রণামী পড়ে। নকুড় মামা মিহি হেসে বলেন। ঝিলি ঝিলি সেবকে করবে মা গো!

বাগদীরা এতে সন্দিহান হয়। নকুড় মামা তাদেরও তুষ্ট করেন। বলেন। মায়ের আবির্ভাব চৌঠা শ্রাবণ। আবির্ভাব উৎসবের পূজো হল আসল পূজো হল, আসল পূজো। সেদিন বাছা, তোরা দিবি প্রথম পূজো। নইলে মা উপবাসী থাকবেন।

নকুড় মামার বুদ্ধিতেই সদানন্দ সম্পত্তি মায়ের নামে দেবত্র করে দেন।

বাগদীরা জানত না এই অকস্মাৎ দেবীত্ব এক কাঁচা মাল। একে বিক্রীতব্য পণ্যে রূপান্তরিত করা যায়। নকুড় ও সদানন্দ এখন দেবীত্ব লাগাল কাজে। নতুন বাড়ী তৈরী হল পুরনো বাড়ি ভেঙে। পাকা বাড়িতে এলেন দেবী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে মাতঙ্গদের প্রাত্যহিক যোগাযোগ ঘুচল।

সকাল থেকে রাত আরতি-পূজো-ভোগ বৈকালী সন্ধ্যারতি কত কি। স্নান-খাওয়া-শোওয়া, তারও কত বিধিনিষেধ। মন্দিরে বসার সময়ে সকলের সঙ্গে যা দেখা হয়, ওই টুকু।

সদানন্দ মরল বুড়ো হয়ে। দেবীর মরদেহের বয়স তখন তিরিশ হবে। মহানন্দ কিশোর। তার বৌ হয়েছে।

ধনুকধারী বলে, নিজে সে জানে না। ঠাকুমার কাছে শোনা কথা। তার ঠাকুরদা মাতঙ্গ, ঠাকুমা মাতঙ্গের বউ। সদানন্দ যখন মারা যায়, তখন এক আশ্চর্য সন্ন্যাসী আসে দেবী থানে। বিশিষ্ট কোনো ঘরের ছেলে। আঙুলে আংটির দাগ তখনো আছে। কেন সন্ন্যাসী হয়েছিল কে জানে।

তখন দেবীর মাঝে মধ্যে সাধ যেত। একা ঘুরতেন বাগানে। একা পুকুরে স্নান করতেন। মাঝে মাঝে একা যেতেন গ্রামে

বেড়াতে। খবর পেলেই পাইক পেয়াদা ছুটে গিয়ে সঙ্গ নিত।

সন্ন্যাসী না কি, দেবীকে ডেকে নিয়ে যান বড় গঙ্গার ধারে। পুজো করবেন বলেন।

সেখানে গিয়ে বলেন- একা পাই না। তাই ডেকে এনেছি। এ কি ? তোমার কোনো ভোগ সুখ পূর্ণ হয়নি। মুখেচোখে তা লেখা আছে। তোমাকে দেবী হতে বলল কে ? এ তুমি অন্যায় করছ।

জাহ্নবী মা হয়ে যান সরবালা। কেঁদে বলেন, এ আমার কপালে দৈবে ঘটেছে।

সব শোনেন সন্ন্যাসী। বলেন, সব ছেড়ে চলে গেলেই পারো ? কে তোমায় আটকাবে ?

আমার কোনো স্বাধীনতা নেই।

তোমাকে ভাঙিয়ে পতিতুণ্ডরা পয়সা করছে।

বুঝতে পারি।

আইন ফাঁকি দেবে বলে তোমার নামে দেবত্র করেছে। নিজেরা হয়েছে তোমাব সেবায়েত।

আমি কি করব ?

আমি বলি, তুমিই এদের জব্দ করতে পার।

কি ভাবে ?

দেবত্র হয় স্থাপিত বিগ্রহের নামে। তুমি তো জলজ্যান্ত বেঁচে আছ। তুমি আদালতে দানপত্র করে দাও, তোমার মরণ হলে সব সম্পত্তি গ্রামের পাঁচজনের কাজে খরচ হবে। স্কুল-রাস্তা-হাসপাতাল-পুকুর এই সব হবে। জমিজমাও পাঁচজনের।

আমি যে ও সব জানি না।

আমি ব্যবস্থা করব।

আমাকে যেতে দেবে না। নইলে সব ফেলে চলে যেতাম কোথাও। চলে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম। কোথা থেকে কি হয়ে গেল। মা গঙ্গায় অবতার হয়ে ফিরে এলাম।

তাহলে ওই কথাই রইল।

এর পর সন্ন্যাসী চলে যান। নিশ্চয় তার প্রতিপত্তি ছিল। কেননা

একদিন হঠাৎ সুদূর সদরের কাছারি থেকে আসেন কৌতূহলী জেলা হাকিম। সদানন্দ তখন নেই। মহানন্দ যুবক হয়নি। নকুড় বুড়ো হলেও সব চালিয়ে যাচ্ছে।

হাকিম নকুড়কে জেরা করতেই তার পুরনো জেল খাটার কথা বেরিয়ে পড়ে এবং নকুড় ভয় পায়। তারপর হাকিম জানতে চান তালন্দি তালুকের কথা।

একটা প্রাইভেট সম্পত্তি দেবত্র হল কেন?

আজ্ঞে, জীয়ন্ত দেবতা।

বটে!

এ একটা খুবই জটিল ব্যাপার, হাকিম বলেন, এবং খাতাপত্র তলব করেন এস্টেটের। এস্টেটের কাগজপত্র বেঁধে নিয়ে চলে যান। নকুড় হাকিমকে টাকা-খাসি-মাছ-চাল ইত্যাদি দিতে গিয়ে প্রবল ধমক খায় ও কেঁদে ফেলে। তার কান্না দেখে বাগ্দীরা খুব আমোদ পায়। তারপর মহানন্দ নেয় নেতার ভূমিকা। সে বাপের মামাকে বলে, জেল খেটে এসেছেন, তা তো জানি না। আর আপনি মন্দির বা এস্টেটের কাজকর্মে যাবেন না। ও সব আমিই দেখব।

তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

তা তো বলি নি।

আর কি বলবে বল? এর চে গালে তুমি দুটো চড় কেন মারলে না?

এ গুলো রাগের কথা।

সব করিচি আমি, জানলে? তোমার বাবা ভোম হয়ে গিইছিল। আমি ওনাকে বাগ্দীদের হাত থেকে নে এসে একেনে পিতিষ্ঠে দিলাম। তারপর তো এত রমরমা হল। একন তুমি বলচ সব যে করল, সে বুড়ো বয়সে ক্যাঙালী হয়ে বেরোক।

মহানন্দ আস্তে বলে, বেশি কতা কওয়াবেন দাছু? বুড়ো আপনি হয়েচেন, কিন্তু একশো এক পাতে পাঁচ পো চালের ভাত খান, মেয়েদের বিয়ে দিয়েচেন, ছেলেরাও জলে ভাসে নি। আপনি ক্যাঙালী কেন হবেন? আমার যদ্দিন চোক কোটেনি, সেই পাঁচ

বচর সময় কালের মদ্যে আপনি আবাদে কয় শো বিঘে জমি হাসিল করেচেন? বাড়ি তুলেচেন মাঠকোঠা? আর কতা বাড়াবেন না।

চাবি-তহবিল সব বুঝে নেয় মহানন্দ। নকুড় গ্রাম ছেড়ে যায়। আবাদ-অঞ্চলের নোনা গাঙে সে পরে নৌকো ডুবে মরে। সবাই বলে, হবে না? মায়ের তবিল ফাঁক করে সব নিচল বই তো নয়। মায়ের সন্তান হাঙর কুমিরেই নৌকো ডুবিয়েচে লেজের ঝাপটে।

হাকিম সে কাগজপত্র দেখে ফেরত দেন। নিজেই আসেন ও চিকের আড়াল থেকে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চান। মা বলেন, কথা হবে সবার সুমুখে।

দেবী পর্দানসীন নন জেনে হাকিম আশস্ত হন। হাকিম দেবীভক্তদের মধ্যে থেকে সরকারী উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, সরকারী স্কুলের শিক্ষক, চারজনকে সঙ্গে এনেছেন তাঁদের সামনে রেখে তিনি বলেন, এই জাহ্নবী মায়ের দেবীত্বের ব্যাপারটি খুবই জটিল। যতদিন তালন্দি ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সরকার খাজনা পেত। দেবত্র হবার পর থেকে সে পথ বন্ধ। খাজনার কথা আমি বলছি না। কিন্তু সম্পত্তির আয় যথেষ্ট, বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাইশটি সমৃদ্ধ গ্রাম, জলকর, আবাদ, সে অনেক। এখন কথা হল, দেবীর এ দেহে যেদিন বাস ফুরাবে, সেদিন কি হবে? এ কি আবার পতিতুণ্ড পরিবারে বর্তাবে?

ভক্তরা চিন্তাকুল হন।

মায়ের কি ইছা?

মা বোঝেন, এ সবই সেই সন্ন্যাসীর চেষ্টায় হল। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছে—

বলুন। বলুন।

পতিতুণ্ডরা সেবায়েত থাকুক। আমার দেহবাস ফুরোলে এ সম্পত্তি থেকে সরকার দেখে শুনে গ্রামের সকলার ভাল হয়, এমন সব কাজ করাবেন। স্কুল হাসপাতাল-পুকুর-রাস্তা—এইসব। জমি জমা বিলিয়ে দেবেন। টাকাপয়সাও সরকারী হেফায়েত জমা দেবার ব্যবস্থা করে দিন।

মা !—ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে বলেন।

দান পত্র তৈরী হয়। এক অভূতপূর্ব দানপত্র। কেন না দেবত্র সম্পত্তির দানপত্রে স্বয়ং দেবীর টিপছাপ থাকে। ভক্তজনে সাক্ষী হন। চমকপদ ঘটনাটির কথা কাগজে বেরোয়। বাগ্দী তিওররা এমন খুশি হয়, যেন হাতে পেয়ে গেছে সব। ঢাক পিটিয়ে নেচে তারা অস্থির হয়।

মহানন্দ কিছুই বলে না। সে বড় হয়। দু বউ মরে। তৃতীয়বার এক ছেলে হয়। এ সময়ে মহানন্দের সহসা মনে হয়, দেবী মরলে সব তো চলে যাবে। এখন থেকে আখের গুছানো দরকার।

বাপের মত তার স্ত্রীলোকের ধান্দা নেই। ডাকাতি করে পকেট ভারি করাও সম্ভব নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীকে পায়। মহানন্দ উদ্যোগী হয়। সে নিজে খাজনা দেয় না, কিন্তু দেবীর নামে খাজনা তুলতে থাকে। জলের মাছ তোলার ওপর খাজনা বসে। শস্য কেড়ে নিতে থাকে। ধার কর্জ আদায় করতে থাকে গলায় গামছা দিয়ে।

দেবী থাকেন পাকা বাড়িতে, চার দেওয়ালে। কিন্তু সেখানেও কান্না পৌঁছয়, হাহাকার। অবশেষে একদিন আকাশ আগুনে লাল হয়। বাগ্দী পাড়ায় আগুন। দেবী সকলকে স্তম্ভিত করে সন্ধ্যারতির সময়ে সিংহাসন ছেড়ে উঠে পড়েন। মন্দির থেকে নেমে চলেন বাগ্দী পাড়ার দিকে। মহানন্দের লেঠেলদের বলেন খবরদার!

অসম্ভব হইচই পড়ে। লেঠেলরা লাঠি ফেলে ছোটে। বাগ্দীরা বুকে বল পায়। আগুন নেভায়। দেবী বলেন, সবাই মন্দিরে এসো।

সিংহাসনে বসে দেবী ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, মহানন্দ। এর মানে কি?

মা, এরা তোমার দুষ্ট প্রজা।

সবাই আমার সন্তান। কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে এদের ওপর অত্যাচার করবার?

বাগ্দীদের স্মৃতিতে এই তারা প্রথম ও শেষ বার পায় মায়ের করুণা। এস্টেটের খরচে নতুন ঘর ওঠে, সকলে পায় দশ টাকা হিসেবে খয়রাতি। খাজনা মকুব হয়। ধান গোলা খুলে ঢালাও দান করা হয় খোরাকি। এ যেন দান যজ্ঞ। সকলে ধন্য ধন্য করে। মহানন্দ এটাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে ধরে নেয়। কি কারণে সে একদিন আবাদ পরিদর্শনে হেঁটে রওনা হয় কেউ বলতে পারে না। মহানন্দও নয়। কেন না সে বাজ পড়ে মারা যায়।

তালন্দি গ্রামে বাই ভয়চকিত হয়। দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে গঙ্গা কি দুর্গা হয়ে দেখা দেবেন ? মহানন্দের বউ ছেলে কোলে মায়ের মহলে এসে আছাড় খায়। মা বলেন, ওই ছেলে বেঁচে থাকুক। বংশ রাখবে।

মায়ের ভক্ত বদ্রীপ্রসাদ উকিল এসে এস্টেট দেখতে থাকেন। মহানন্দের ছেলে যোগানন্দ যখন বড় হয়, তখন তিনি ছুটি নেন। এ সময়েই মায়ের হয় পেটের রোগ। পেট ধরাবার জন্যে ডাক্তার শিষ্য সামান্য ঔষধের বন্দোবস্ত করেন। বন্দোবস্তটি বহাল থাকে। এই যোগানন্দের ক্রমে হয় সাত ছেলে।

ধনুকধারীরা জানে, ছেলেরা সাত দাদা যে-যার তালুক মুলুক গোছাচ্ছে। কিছু করার নেই। মা আজ কতদিন জীর্ণ দেহ, জরা আর বার্ধক্য নিয়ে অনড়। একশো পার করেছেন। আরো দেড়শো বছর থাকবেন। ধনুকধারী বলে, তকন দেখা ঝাবে কোতাও কিচু নি। সকল ঢু চা।

এই বিবরণীটিও মুখে মুখে চলে। ধনুকধারীদের সমাজে তবু তারা দেবীর দেবীত্বে বিশ্বাস করে।

জাহ্নবী মায়ের ঘরে বিপিন ঢুকেই দরজা বন্ধ করে। তারপর দরজা খোলে। বলে, মোক্ষদা, মুখ ধোবার জল, গামছা দে। সকালা সাবু খায় তো ?

মোক্ষদা এনে দেয় সব ও ঢুকতে যায়।

ঢুকচিস কেন ?

ঘর মুক্ত করব না ?

না না। আমি করব।

তুমি করবে কি গো?

আমি করব। দেবতার ঘর। মুক্ত করলে পুণ্যি হবে। ঋত পুণ্যি তোরা করবি?

মায়ের কপাল ফিরেচে।—মোক্ষদা বিরস মুখে বলে ও ঝাঁটা ন্যাতা-বালতি আনে। বিপিন ঘর ঝাঁট দেয়, মোছে। তারপর ধূপকাঠি জ্বেলে দেয়। গন্ধ উঠছে, উঠবেই। ঝাঁটা বালতি বাইরে রেখে বিপিন মশারি খোলে। তারপর দরজা বন্ধ করে আবার।

মোক্ষদা ও গোপালী অশেষ কৌতূহলে বারান্দা দিয়ে চলাফেরা করে। কথা শোনে কান খাড়া করে।

এই যে, মুখ মোচলুম? আঁ? কি বলচো?

বুড়ির গলা শোনা যায় না।

সাবু ভাল লাগে না? একটু খাও।

বাঃ, এই তো খেয়েচ।

বিপিন এবার সাবুটকু ফেলে দেয় জানালার বাইরে। তারপর বলে, বাতাস করচি। আঁ? আঁধার কেন? বড্ড যে বাদলা করেচে গো মা।

জাহ্নবী মা এক ভাবে পড়ে থাকেন। এখন দেখা যায় চোখের কোলে জলের দাগ।

বিপিন এদিক-ওদিক চায়। ট্যাঁক থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে। টাকার থাকে হাত দেয় না। নিচের থাকে হাত দিয়ে টেনে আনে একটি থালা। তা থেকে তুলে নেয় সোনার সিঁদুর কৌটো। সিন্দুক বন্ধ করে। জাহ্নবীর আঙুল থেকে একটি আংটি টেনে খোলে। ভচ্ করে চামড়া ছিঁড়ে রস গড়ায়। দুর্গন্ধ।

বিপিন মনে মনে গর্জায়, সারাদিন মড়া আগলাবে। বাস ছাড়বে না?

বিপিনকে ভীত ও চকিত করে অন্ধকার হয়। এ সকালেই আকাশ কালো। বৃষ্টি নামছে। বিদ্যুৎ ঝলকে দেখা যায় জাহ্নবী মায়ের দাঁতে ঝিলিক।

সোনার দাঁত গো !—মনে মনে বলে বিপিন। মুখে হাত দিতে সাহস হয় না। চারদিকে চায় ও। হাতির দাঁতের কাজ করা পালঙ্ক। কত দাম! ঘরের কোণে কাঠের আলমারিটা? ওতে না জানি কত শালা দোশালা আছে। রূপোর আফিমের কৌটোটা নেয় বিপিন।

গোপাল আসে বিপিনের পর। গোপাল শক্ত ছেলে, বুদ্ধিও ধরে। সেই মোক্ষদা ও গোপালীকে বলে, ডাক্তার বললে, উনিকে মাগুর মাছের ঝোল দিতে। মাচটা গলিয়ে নিতে হবে। ঝোল টুকু খেলেই শক্তি। তা মাগুর পাব কোতা? তোরা দুজন চলে যা জমুনীরা, তাজপুরের হাট থে একেবারে বড় বড় মোটা দেকে মাচ আনবি। নতুন মাটির হাঁড়ি কিনে নিবি।

ঝেতে আসতে সময় ঝাবে?

নয় ও বেলা দোব?

ডাক্তার আসতেচে?

বলে এই চি।

তাকেও একবারটি বলে ঝা। তোরা মায়ের ডান হাত-বাঁ হাত তাই ঝাই, আজ কি চ্যান করবে উনি?

না না। বাদলা করেচে?

ওটা কি গো শিশিতে?

দিয়ে গেল ললিত সা। বলে মায়ের নাম করে এনিচি। নয় বিচনায় দিও। সুগন্দ ওনার মন ভালো থাকে। যা মা, ঝপ করে ঝা। দশটা টাকাই নে। তোরা মায়ের কাজে যাবি, কিচু কিনে খাস।

মোক্ষদা ও গোপালী অবাক হয়ে টাকা নেয়। জয় মা! মা গো! বলে ঢুকে যায় বিপিন। দরজা বন্ধ করে। বন্ধ করেই অডিকোলনের শিশি খুলে ঢেলে দেয় জাহ্নবী মায়ের গায়ে-কাপড়ে-চুলে।

তারপর পেশাদারী দক্ষতায় বিপিন জাহ্নবী মায়ের আঙুলের বাকি আংটিগুলি খুলতে থাকে ও বলতে থাকে—

জাহ্নীব জননী দেবী আইলেন এই ভুবি
এ তিন ভুবনে প্রতিকার।
সুর-নর-নিস্তারিণী পাপ-তাপ নিবারিণী
কলিযুগে হেন অবতার ॥
ধন্য ধন্য বসুমতী যাহাতে গঙ্গার স্থিতি
ধন্য ধন্য ধন্য কলিযুগে।
শতেক যোজনে থাকে গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে
শুনি যমে চমৎকার লাগে ॥

স্তোত্র বলতে বলতেই ও গেঁজে থেকে চাবি বের করে, সিন্দুক খোলে, টাকার থাকের দিকে চায় না। সিন্দুকের মাথার দিকে খোপ খোলে ও হাত ঢুকিয়ে কয়েকটি সোনার বেলপাতা বের করে নেয়, গেঁজেতে ভরে। তারপর সিন্দুক বন্ধ করে ও জোরে গঙ্গাস্তোত্র পড়তে থাকে।

মোক্ষদা ও গোপালী বেরিয়ে এসে আগে যায় মলয় ডাক্তারের কাছে। বলে, তাড়াতাড়ি ঝাও গো. উনির দেহ ভাল নি।

মলয় বলে, যাচ্ছি বাছারা।

মলয়কে নিয়ে রঘু ও রাখাল ঢোকে জাহ্নবী মায়ের ঘরে। পেছনে পেছনে ঢোকে অন্য পাঁচ দাদা। রঘু দরজা বন্ধ করে। বন্ধ করে রাখালকে বলে. তুমি সামলে নাও দাদা। আমি বারান্দায় পাইচারি করি। কে কখন এসে দাঁড়ায়।

তাই যা।

টাকা এনোচো?

নিশ্চয়।

রঘু বারান্দায় বেরোয়। এখন দুপুর। বাইরে মন্দিরে মায়ের ভোগ হচ্ছে। পুরোহিত জগন্নাথ পাণিগ্রাহীর চীৎকার শোনা যায়, বাজা, ওরে বাজা।

ঢোল-ঢাক-কাঁসর-ঘন্টা বাজে। পেতলের মা ভোগ নিতে থাকেন। আজ মঙ্গলবার। ভোগে থাকবে ব্যঞ্জন পাঁচ ভাজা, পায়েস। সোমে তিন পদ, মঙ্গলে পাঁচ, বুধে সাত, বিষ্যুতে নয়,

শুক্রে এগারো, শনিতে তেরো, রবিতে পনেরো পদে ব্যঞ্জন, সেই মতো ভাজা দিয়ে ভোগ? ভাজা এত পদে কি দেওয়া যায়? এই নিয়ে খুব চিন্তা।

ভোগ হয়ে গেলে জাহ্নবী মায়ের গলা ভাত আর কাঁচকলা সেদ্ধ আসবে।

ঘরে মলয় হাঁ করে তাকায়। রাখাল ফিসফিসিয়ে বলে, এও নাও।

কি?

পাঁচশো টাকা। বিচনার ধারে যেতে হবে না। কাল রাতেই হয়ে গেচে।

হয়ে গেচে?

হ্যাঁ বাবু। তোমাদের হিসেব হয়ে গেচে। ওনার হিসেবে আরো কোতা যেয়ে কলেবর ধরলেন। তোমাকে বাবু, বলতে হবে ভাল দেকিচি।

তারপর?

সে আমরা বুজব।

কিন্তু...

মুখ খুলোচো কি মলয়, লাশ ফেলে দেবে। পালাতে পারবে না। একেনে বাড়ি কোরোচো, বাস কোরচো।

না না, পালাব কোথায়?

তবে সেই কতা রইল।

আমাকে ডাকলেই বা কেন?

ওই মোক্ষদা আর গোপালী যে রব তুলল, ওনার হয়ে গেচে! একন তুমি যেয়ে প্রচার দাও গে দেকে এইচি, মা ভাল আচেন। বুজলে? বিপিন! ওর সঙ্গে যা।

বুঝলাম।

মলয় মায়ের পায়ে প্রণাম করে। তারপর নিচু হয়ে দেখে বলে দাদা! তাড়াতাড়ি করবেন।

কেন?

রস কাটচে। অনেকদিন ভুগেচেন।

তুমি এসো।

মলয় চলে যায়। খুবই বিভ্রান্ত সে, বিষণ্ণও। ঘরের মলিন চেহারা, জাহ্নবী মায়ের ময়লা বিছানা চোখে ভাসে। সে তো জানে, আরেকটু খেতে দিলে, আরেকটু যত্ন করলে...দেবতার মৃত্যু এমন কেন? যে কোন অদরকারী, আবর্জনাস্বরূপ বৃদ্ধার মত?

বেরিয়ে এসেই দেখা হয় ধনুকধারীর সঙ্গে। ধনুকধারী বলে, কি রকম দেকলে গো?

কাকে?

মাকে?

কি রকম? কেন? এ কথা কেন?

ভয় পাচ্ছো যে?

ভয়? না না।—মলয় চেষ্টা করে হাসে ও বলে, নতুন ওষুধ দেব তাই ভাবছিলাম।

কাকে?

মাকে।

কেমন আচে?

ভালই তো।

মোক্ষদা পিসি তো ভয় পেইছিল।

ভালই আছেন। তবে বড্ড বাদলা হয়েছে না? শরীরটা এ সময়ে ম্যাজমেজে হয়।

নতুন ওষুধ দেবে?

কাকে?

মাকে?

এখন ওষুধ হ্যাঁ হ্যাঁ দেব।

উল্টোপাল্টা কথা বলে ধনুকধারীর মনে সন্দেহ ও সংশয় রোপিত করে মলয় চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আসে বিপিন। বলে, কি ধনুকধারী?

দাঁড়াও দাদা।

কেন ?

কতা আচে।

পরে শুনব। ডাক্তারের কাচে যাই আগে।

কেন যাচ্চ ?

কাজ আচে রে।

বিপিন মলয়কে ধরবে বলে পা চালায় ধনুকধারী বলে, দাঁড়াও। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।—ও হনহনিয়ে হাঁটে বাগ্দী পাড়ার দিকে। বলে, মেয়েছেলেদের নে আসতেচি। তারা ঢুকে দেকে আসুক।

খাওয়াদাওয়া সেরে সাত দাদা আবার ঢোকে জাহ্নবী মায়ের ঘরে। বিপিন ধনুকধারী ও মলয়ের সংলাপের বিশদ বর্ণনা দেয়।

রঘু বলে, ধনুকধারী ? এঃ, ছি ছি।

কেন ? সে কি হেত্তা ঢুকবে ?

তোমার ভেমো বুদ্ধি মেজদা। সে নিচ্চয় মেয়েছেলেদের কে আনবে। তারা তো আসে মাজেমদ্ধ্যে।

তাহলে ?

উপায় এক্টা কত্তে হবে।

কি করি ?

শোনো। ধুনো দে ঘর আঁধার করি, ওই কোণে পিদিম জ্বালি, তোমরা ছ জনা গঙ্গা কেত্তন গাও। ওরা যকন আসবে, দেকবে আমরা কেত্তন শোনাচ্ছি! দালানে দাঁড়াবে।

যাক, বৈকালী ? সন্ধ্যারতি ?

আমি রইচি না ?

মোক্ষদা ও গোপালী মাগুর মাছ নিয়ে ফেরে যখন, তখন জাহ্নবী মায়ের ঘরে ছয় ভাই গঙ্গাকীর্তন গাইছে। রঘু বাইরে দাঁড়িয়ে। সে বলে, মাচ জাইয়ে রেকে হাত মুক ধুয়ে কীত্তন শুন্ গে যা।

কীত্তন কেন গো ?

উনি শুনতে চাইল। না, মলয় আমাদের চিকিচ্ছে করে ভালো। কেমন খেলে, কেমন ঘুমুলে, তারপর পাশে বসে গাইছিলুম, দেকলুম

ঠোঁট নড়চে। নিচু হয়ে শুনি, এই দেক্‌, গায়ে কাঁটা দিচ্চে। নিচু হয়ে শুনি, বলতেছে গান-গান—গান।

জয় মা! জয় মা!

গান হচ্চে?

তুমি হেতা?

যে আসবে, বলব।

ধনুকধারীরা এসে পড়ে। রঘুর কূটনীতির কাছে সবাই হার মানে। রঘু তাদের দেখে সাহাস্যে এগোয়। বলে, আয় আয় তোরা। মেয়েছেলেরা আয় গো। ভেতরে আয়। অ ধনুকধারী, আজ সকাল থেকে মায়ের মুখে জ্যোতি বেরুচ্চে। দেকে মলয় তো যেন বিবশ হয়ে গেল। একন দেক স্বমুকে বললেন, গান শুনব।

উনি কইতে পারে?

স্বর ফোটে না, কতা তো বোজা যায়।

বলল?

নিচ্চয়। গানই তো হচ্চে। মেয়েরা আয় গো।

ধনুকধারী বলে, যা যা সবাই।

মেয়েরা এসে দালানে বসে। না, মা শুয়ে আছেন, মাথার কাছে পিদিম, চুল দেখা যাচ্ছে। ছয় ভাই গান গাইছে, ঘর ধূপের ধোঁয়ায় অন্ধকার। সাত বউ, ছেলেপিলে, সব বসে আছে দূরে দূরে, দালানে। গ্রামের মেয়েরা জয় মা! বলে বসে পড়ে। কীর্তন চলতে থাকে।

রঘু এ সময়ে তার ছেলে, দাদার ছেলেদের সঙ্গে ধামা ধামা বৈকালী নিয়ে বিলোতে থাকে নারকোল, মোয়া, মুড়কি, নাড়ু, ফল, সব চেলে দেয় কোঁচড়ে। একা ধনুকধারী নেয় না।

রঘু অন্দরে এসে মেয়েদেরও দেয়। বলে, এবার তোরা আয় বাছা। মাকে পথ্যি দেব, শোয়াব।

মেয়েরা চলে যায়। রঘু বলে, মোক্ষদা! গোপালী! আমরা তো রইলাম। তোরা আজ খেয়ে নিয়ে ওপরের দালানে ঘুমুগে যা বাছারা।

বউরা, ছেলেপিলে চলে যায়। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। ক্রমে

বাড়ির লোকজন শুতে যায়। রাত হ'তে থাকে। লণ্ঠন নিয়ে আসে রঘু। দরজা বন্ধ করে।

তারপর বলে, এবারকার ব্যবস্থা দাদা করুক।

কেন, আমি একা কেন?

দু তাড়া নোট সরিয়েচ বলে। ওঃ, ও দু তাড়া রেকে যাওয়া গোক্ষুরি হইছিল।

যত তাড়া, সব যে সাদা কাগজের, তা সে কি আমি একা সরিয়েচি?

না। তা সরাওনি। যার যেদিন পালা পড়ত রেজগি বদলে নোট করে এনে রাকবার, যে সিদিনে সরাত। তুমি হুট করে ও দু তাড়া নিলে কেন? ও আমাদের সকলার। বুজলে?

বেশ! তাই হবে।

গলায় হার?

সে আমি দেকিনি।

আংটিগুলো?

অত হিসেব নিসনি রোঘো। সোনার কোষাকুষি আর পিদিম তুই বদলে নিয়ে পেতল গুঁজেচিস।

মেজদা। তুমি রুপোর ঘণ্টা নাওনি?

রাঙাদার কতা তো বলচ না। উনি যেয়ে সদরে আটা ভাঙা চাকি বসিয়েছেন চারটে।

নিজে বাসের পারমিট বের করেচিস রতি।

নিবারণ বা কম কিসে?

রঘু ঝপ করে বলে, দাঁড়াও, খুলে দেকি কেউ কিচু রেকেচে কি না।

সিন্দুক খুলে রঘু ওপরে হাত চালায়, নিচের তাকের থালাটি বের করে। তারপর বলে, অঁা? সোনার বিল্বপত্র, রুপোর রুদ্রাক্ষ, সব কম কম? তাই সই।

ঝপ করে সে সব গেঁজেতে ভরে। তা দেখে রতিকান্ত বলে, নিচ্চিস নে? আমি শুধু এই পালঙ্কখানা নোব, বাস্। বাজার বুঝে ছাড়ব একন।

শাল দোশালা আমার।

বাসনগুলো?

রাখাল বলে, সে তো হল। কিন্তু একন কি করা। একন চুলোচুলি করলে সব্বনাশ।

হ্যাঁ। ধনুকধারী সন্দ করচে।

বৈকালী নিলে না।

লোক জুট্যে এনিচিল।

রঘু হঠাৎ বলে, চুপ।

তারপর লাফ মেরে গিয়ে পড়ে জানলার কাছে। বলে, কে, কে ওকেনে?

পাঁচিলের ওপাশ থেকে পায়ের শব্দ সরে যায়। রঘু কান পাতে ও বলে, কেউ এয়েচে।

ধনুকধারী?

সে ছাড়া এমন সাহস কার?

ধনুকধারী!

দাদারা বিবাদ ভুলে কাছে আসে পরস্পরের। স্বভাবতই সকলে চায় রাখাল ও রঘুর দিকে। রাখাল বলে, আমাদের ওপর ভরসা রাকো। দেক, বাপ-পিতামো বাড়িয়ে রেকে গিচল। বলতে পার পিতামো অব্দি। বাবা ছিল দূরদর্শী। সে জানত, একদিন ওই ধনুকধারীদের হিসেব বুজো দিতে হবে। তাতেই তিনি নিজের কতা আর আমাদের কতা ভেবে চাট্টি চাট্টি······

তুমিও যেমন দাদা। সে কবেকার দানপত্তর কে মনে রেকেচে? তুমি রাকো দিকি?

অ. তুমি বেশি বুজতেচ। মিটিং করা, কেলাগ তোলা ছোঁড়াদের কতা ভুলে গেচ? তারাই না ধনুকধারীকে উশকোচ্চে? এই বর্গাদারীর ঠেলায় সদরের দলিল দস্তা-বেজ ঘাঁট পড়ল। গুখেগোরা ঠিক বের করেচে দানপত্তর।

বল কি?

নিচ্চয়। আমার গলায় গামচা দে একশো টাকা চাঁদা নিলে।

বলচে, দেবত্তরের সেবায়েতের এত মালিকানা—হেন তেন হয় কি করে? পাই পয়সা বুজ্যে দিতে হবে। স—ব যাবে পাবলিকের কাজে। হুঁ হুঁ। তোমরা যে যা নিয়েচো আমি কিচ্চু ধরি না। নেবেই তো, নেবেই তো। হেপাজতদার হয়ে দেক্যে রাকব, দিন ফুরলে ওদের হাতে তুলে দোব। সে কি সম্ভব? বলি আমরা তো মনিষ্যি বই নই?...

একন? একন এনার দেহান্তরী খবর যদি রটে, জয় মা! তাহলে সব বোজাবে কি করে? সিন্দুকে চোতা কাগজ, সোনা রুপোর চিন্ন নি, জমিগুলো বেনামী? তারা তো জানে ইদিকে কিছু না হলেও কিচু জমতেচে।

সেই তো কতা। দেহস্তরা হলে! কিন্তু দেহন্তরী হতে দোব কেন? উনি তো আর এ দেহে নি। একন বুদ্ধি করে এই দেহটা...

সাত দাদা একন এক হয় ও নিচু গলায় শলা আঁটে।

রতিকান্ত সক্ষোভে বলে, এত সেবা নিলেন, তা আর দেড়শো বচর রইলেন না? কতা ছিল।

ওদের পাপে। বাগ্দী তিওরের পাপে। দিনরাত তাক্যে আচে, কখন চোখ বোজে কখন এসে ওরা সব দকল নেয়।

সেই তো!

এমন কৌশল কত্তে হবে যে তোদের হাসপাতাল আর ইস্কুল, রাস্তা আর পুকুর, সব জলাঞ্জলি যায়। যাতে তোরা জম্মো জম্মো আমাদের মুখ চাওয়া হয়ে থাকিস। দোব না কেন, দোব তোদের। যকন দেকব গুড়ে আর মিষ্টি নি, তকন ছেড়ে যাব। নিস তোরা।

কি কৌশল করবে?

মাদুরে মুড়ে চারজনা ওনাকে নিয়ে বেরোও। দুর্জোগের রাত। মাইল খানেক যেতে হবে, এমন রাতে শ্যাল-কুকুর বেরোয় নি, কেউ দেকবে না। সোঁতা যেতা খবো বইচে, সেতা ফেলে দাও। মহাশ্মশানও বটে। ওনার দেহ, বড় গঙ্গা ঠিক টেনে নেবে।

ইদিকে?

আমরা তিনজনা সব সামলে রাকি। যাবে আর আসবে। এ

হল জীবন মরণ সমিস্তে। মনে ভাববে ইটি হল কাজের কাজ। না করলে নামে ফোজদুরি মামলা ঠুকে দেবে কেউ। মামলা কত্তে বুকে বলভস্‌সা পাও তো? মামলার কতা মনে করলে বুকে ভস্‌সা পাবে।

ইদিকে কি হবে, হ্যাঁ দাদা?

ঝপ করে ফিরবে। আরো কাজ আচে। এ হল গে, আমাদের, যাকে বলে, অগ্নিপরীক্ষে।

ইদিকে কি হবে, বলবে তো?

জয় মা! মার কতা ভেবেই বুদ্ধি পেলাম। ইদিকে বলব, কি বলব জানো? মা উঠে বসলেন, ওরে একশো দেড়শো বচর থাকব, তা নুতুন হয়ে থাকতে সাদ হচ্চে, বলে মা ওই পেতলের ঠাকুরে সশরীরে মিলিয়ে গেলেন।

অ্যাঁ?

তাই বলব।

আমি থাকি, নেপাল আর বিপনে। তোমরা চারজন যাও। মাদুর নাও, দড়ি আনো। সিঁড়ির নিচ হতে একটা বাঁশ নিও। চুনকামের বাঁশ রয়েচে। মায়েরও সেই ইচ্ছে গো। আকাশ কেমন ঢালচে?

বাইরে কারা দাঁড়িয়ে তা দেকব না?

দূর দূর। ভিজুক না। তোমরা তো খিড়কি দে বেরুচ্চ, বাঁশবাগানের পগাড় পেইরে, বাগান পেইরে যাচ্ছ। যাও যাও লেগে পড়ো।

মাদুর, চট ও দড়ি আসে। এখন জাহ্নবী মাকে উলঙ্গ করে ওরা। আতিপাতি দেহ খোঁজে। আঙুলে রূপোর চুটকি ছিল, খুলে নেয়। সোনার দাঁতের কথা সকলেরই মনে হয়, কিন্তু জিভ ফুলে মুখের গহ্বর ভরে ফেলেছে। সমস্ত শরীর ফোলা ও রসস্থ। চামড়া টান টান। বিসর্জনের প্রাক্কালে নতুন কান্তি যেন। চোখের কোন দিয়ে কি গড়ায়। জল? যেন কাঁদেন মৃতা জননী। এরা তাঁকে ব্যবহার করে করে আজ উলঙ্গ ও নিঃশেষ করে ফেলে দিচ্চে। আবার তাঁর

নাম ভাঙিয়ে আরো খাবে, আরো লুটবে বলে। এ তিনি চান নি। শস্যক্ষেত্র ও বিল. আবাদ ও আহারের, সব দিতে চেয়েছিলেন সকল মানুষকে জাত ধর্ম নির্বিশেষে। তা হল না।

চোকে জল ?

পচ ধরেচে, রস কাটতেচে।

জল ! কান্তেচে !

চোপ ! তোল মাচুরে !

দুর্যোগের রাতে ঘোর অন্ধকারে, চোরা পথে বিদায় হয়ে যান জাহ্নবী মা। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে, রস কেটে কেটে শবদেহটি বাহকদের সাধ্যমত বাধা দিতে চেষ্টা করে। সক্ষম হয় না। রাখালরা নাকে কোন গন্ধ পায় না।

আকাশ হা হা করে, বাতাস। মেঘ পালে পালে প্রমত্ত হাতির মত মাতামাতি করে ও জল ঢালে। বিদ্যুৎ বার বার দাঁত বের করে। জাহ্নবী মা বিসর্জনে যান।

মরা সোঁতার পাড় ধরে সুকৌশলে ওরা চলে। ভার হয়, ক্রমে ভার লাগে কাঁধে। লোহার ভার যেন। বাঁশগাছ আছড়াআছড়ি করে। সোঁতায় আজ কলকল করে জল বয়। এই সোঁতার পাড়ে, এমনি এক দুর্যোগের রাতে হয়েছিল জাহ্নবী মা। ভীরু এক মানুষের মেয়ে, সে হল দেবী। দেবী হয়েও সে ছিল মানুষের জন্য। কেমন করে গিয়ে পড়ল এদের খপ্পরে। তার পরেও সে চেয়েছিল সব তুলে দিতে মানুষের হাতে। তাতেই তার এই পরিণতি। সোঁতার জল যেন সবই বোঝে। জাহ্নবী মায়ের নগ্নতার লজ্জা ঢেকে দেবে বলে ছুটে চলে ওদের সঙ্গে।

শ্মশান কাছে আসে। ওরা কাঁধ থেকে শবদেহ নামায়। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন, দেহটি তোলে। ঝপাং করে জলে ফেলে।

কি আশ্চর্য শবদেহটি সেখানেই পাক খায়। পরদিন বেলায় আকাশ ছাড়লে শ্মশানের ডোম সেটি আবিষ্কার করে। কাছে

গিয়ে ও খুঁচিয়ে দেহটি স্রোতের মাঝে সরাতে চায়। জলে পড়ার ধাক্কায় বা নিয়ে আসার ঝাঁকিতে শবদেহর দাঁতের পাটি এগিয়ে এসেছে।

সোনার দাঁত!—ডোমটি সাগ্রহে বলে. সকালে যথালাভ। কিন্তু হেতা সোনার দাঁত বাঁধানো মড়া জলে ফেলল কে?

বউ বলে, দেকে নি।

এঃ, ন্যাংটো করে ফেলে গেচে।

বুড়ো মানুষ. জঞ্জাল মনে করেচে?

ডোম দাঁতের পাটি খুলে নেয়, বউকে দেয় ও বলে. কে তুমি জানিনি মা, গঙ্গাসই হও!

দক্ষ হাতেব খোঁচায় শবদেহ যায় মাঝ সোঁতায় ও এখন সাঁ সাঁ করে গঙ্গায় বিলীন হতে ছোটে।

তালন্দিতে ভোররাতে পতিতুণ্ড গৃহে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজে। ভীষণ হট্টগোল সে বাজনায়। গ্রামবাসীরা ছুটে আসে বৃষ্টি মাথায় করে। ধনুকধারী বিনিদ্র লাল চোখে সবার সামনে।

আশ্চর্য. পরম আশ্চর্য। আজ অন্দরের দরজা খোলা। আজ সকলকে আহ্বান। সবাই এসো। উঠানে দাঁড়াও। দরজা খুলে দিই. দেখ চোখ ভরে।

কি দেকব? ব্যাপারটা কি?

সাতভাই গরদ পরে জোড় হাতে দাঁড়ায় ও বলে, কাল ঘটে গেছে অলৌকিক দেবী মহিমা। মাঝ রাতে দেবী সশরীরে উঠে বসেন ও বলেন, এখনো তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ হয়নি। জীর্ণ দেহটা চায় এক পাকাপোক্তা বাসা। তাই নিজেই তিনি সে ব্যবস্থা করছেন। এ কথা বলেই জাহ্নবী মা সশরীরে মিলালেন। দেখা গেল বিছানায় পেতলের প্রতিমা।

না। আর কোনো সন্দেহ নেই। ফুল ঢাকা বিছানায় তাঁর পেতলের প্রতিমা। মন্দিরে সিংহাসনে রাশি রাশি ফুল। এ যদি

অলৌকিকতত্ত্ব না হয়, তবে অলৌকিক কি? অবিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে জননীর এই মহিমা প্রদর্শন।

বিশ্বাস করি না।—গর্জে উঠল ধনুকধারী।

রাখাল ক্ষমা সুন্দর হাসল। বলল, নাস্তিক যুগে যুগে থাকে রে। তাদের কারণেই দেবতা আসেন।

তিনি মরেচে, তোমরা কিচু কোরোচো।

মরেচে? তাঁর কি মরণ আচে? কলেবর থেকে কলেবরে তাঁর লীলা। যতদিন গঙ্গা বইবে, ততদিন তিনি থাকবেন।

তুই বলাব কে?

এ ঠাকুর তো অনন্তকাল রইবে।

তাহলে তিনিও অনন্তকাল থাকলেন? একন শোনো। এই যে মহিমা হল, সে জন্যে তিনদিন সবাই একেনে পেসাদ পেও। তিনদিন সব অরন্ধান।

না-না-না।—ধনুকধারীর প্রতিবাদে চাপা পড়ে যায় প্রমত্ত উল্লাসে। জনতার। ঢাক-ঢোল কাঁসর বাজতে থাকে। রাখাল বলে, একন ইনি অন্দরে সেবা নেবেন। পুজো চলবে অন্দরে বাইরে। কত কাজ; তারপর সিংহাসনও বসাতে হবে প্রতিমা।

ধনুকধারী মরিয়া সাহসে চেঁচিয়ে বলে, তোমার পেসাদ আমি খাই না। শোসান যাব আমি. সোঁতায় তালাস কবে দেকব। তোমরা রাতে তেনাকে পার কোরেচো। নিয্যস, নিয্যস্।

সে ছুটে চলে যায়। একাই দেখবে সে, কোন পথে, কোন উপায়ে রক্তমাংসের মা বিদায় হয়, নিষ্প্রাণ ধাতব প্রতিমা রাখালদের হাতের পুতুল হয়ে নিষ্প্রাণ চোখে দেখে চলে রাখালরা কি কৌশলে ধনুকধারীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা ক্ষীরে সয়ে থাকে।

ভীষণ প্রজ্বলন্ত ক্রোধে ধনুকধারীর মনে হয় তার সে কাজ করার ক্ষমতা আছে। রাগ মানুষকে এ রকম সাহস জোগায়। ধনুকধারীর মত মানুষকেও।

সাঁঝ-সকালের মা

বৈশাখের তাতে মাঠের ছাতি ফাটে, সাধন কান্দোরীর মা জটি ঠাকুরনী মরে গেল।

মরে যাবার আগে জটি ঠাকুরনীর পেট গলা ফুলে ঢাক হয়েছিল। বাঁশের দোলা বেঁধে সাধন কান্দোরী মাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল।

'মোকে আঁসপাতালে দিস না সাধন আঁসপাতালে ডোমে লাড়ীভুড়ি টেনে ছিঁড়া করবে বাপ।'

'ডাক্তারে বলে আঁসপাতালে লিয়া করতে।'

'অ বাপ, মোর সাধন বাপ, ডোম দিঞে লাড়ী ছিঁড়া করাস না বাপ!'

'লাড়ী ক্যাও ছিঁড়ে না মা।'

'ছিঁড়ে বাপ। তু কি জানবি বল? দুধের ছেলা তুই। ডোমে লাড়ী ছিঁড়ে, আঁত ছিঁড়ে। ডাক্তারে বুতলে আঁত রেখে দেয় বাপ।'

'কেন গো মা?'

'তু কি জানবি বাপ? দুধের ছেলা তুই। এ মনিষ্য শরীর ই কলিকালে পুড়াবার লয়, গোর-গাড়ার নয়, জানলু?'

'হেই মা! ই কি কথা?'

'হক কথা বাপ! কিন্তু আত্মীয় বন্ধু মনিষ মরলে সামাজ দেয়, চিলুতে উঠায়, লা কি বল?'

'হক কথা।'

'উ ডাক্তার-বদ্যি-ডোম-ধাই সভে শুগুন পানা চিয়ে দেখে।'

'মা।'

'চিয়ে চিয়ে দেখে। তা বাদে যাতক্ষণ বেওয়ারিশের মড়া পায় তখন উ-রা ভাগীদার হয় বাপ। ডোমে লাড়ী আঁত ডাক্তারকে দেয়। ধাই কাপড়জামা ল্যায়। ডোম মড়াটি পচা করিয়ে হাড় বিচে পয়সা ল্যায়।'

'ধ্যুর, তা আমি হতে দিই ?'

'দিস না বাপ। আমি তোর সাঁঝ-সকালের মা। মোকে তু হাঁসপাতালে মারা করাস না।'

'চুবো যা মা।'

সাধন কান্দোরী ধমক দিয়ে উঠেছিল। জটি ঠাকুরনী ওকে পেটে ধরেছিল একদিন। ওরা বড় প্রাচীন জাতি, জরা-ব্যাধের বংশধর। ওদের সম্প্রদায়ের নাম পাখমারা সম্প্রদায়। সেই বংশের মেয়ে জটেশ্বরী সাধনকে পেটে দশ মাস ধরে প্রসব করেছিল।

কেমন করে গর্ভধারিণী মা সাঁঝ-সকালের মা হয়ে গেল সে এক আশ্চর্য বৃত্তান্ত। সাধনের দেড় বছর বয়েস থেকে জটেশ্বরীর ওপর দেবতার ভর। সেই থেকে জটি দিনেমানে জটি ঠাকুরনী। সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা অবধি ঠাকুরনীকে কেউ মা-বউ-বোন ভাবতে নিষেধ। ডাকতে নিষেধ।

সাধনকে জটি নিষেধ করেছিল।

'মা বোলে ডাক্যে না বাপ, বাপো আমার।'

'কখুনো লয় ?'

'লা বাপো, খুব বিয়েনবেলা, সূয্যি না উঠতে মা বলে ডেকে লিবি। সূয্যি ডুবতে মা বলে ডাকবি।'

'শুধু সাঁঝে আর সকালে, তাই লয় গো মা ?'

'হ্যাঁ বাপো!'

সাঁঝে আর সকালে তু মা। আর দিনেমানে তু ঠাকুরনী ?'

'হ্যাঁ বাপো। আমি তোর সাঁঝ-সকালের মা।'

এই সাঁঝ-সকালের মা জটেশ্বরী কেমন করে যাদবপুরে লাইনের পারে এল, কেমন করে ওর ছেলেকে রিক্সা করে দিল—সে অনেক কথা।

মা ছাড়া সাধন কান্দোরী কিছু জানে না। সাধন নির্বোধ, তিরিশ বছর বয়সেও ওর বুদ্ধিসুদ্ধি অপরিণত। মোষের মত শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ফুসফুস, রক্তজবার পাঁপড়ির মতো হৃদযন্ত্র, সাপের মতো পিচ্ছিল নাড়ী, ভোরের দোপাটির মতো

কুসুমকোমল জীবকোষ, কিছু নেই ওর শরীরে। শুধু একটা পাকস্থলী আছে।

আর আছে খিদে। শুধু খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে ওর মনিবের যুবতী বউ কাঠ চ্যালা করায়, টিউবকলের জল টানায়। মণ মণ কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।

মনিবের যুবতী ঘোমটা টানা সুন্দরী বউ।

'মনিবানীর দিকে চেয়ো না সাধন।'

'লা মা।'

'য্যাখন চাইবি, মাত্তিভাবে দেখবি, জানু বাপ।'

'হ্যাঁ মা।'

মা যা বলে সাধন তাতেই হ্যাঁ বলে। মা ওর জগৎ-সংসার, মা ওর চাঁদ-সূর্য। সেই মা যখন জ্বরে, আমাশায়, পিত্তরসে, কফে ভুগে ভুগে ফুলে গেল, তখন সাধন মনিবকে বলল, 'টাকা দেন মশায়, মোকে টাকা দেন।'

'কেন সাধন?'

'মোর মা মরে যায় মশায়।'

'কি হয়েছে, অসুখ?'

'হ্যাঁ মশায়। মা দিনেমানে ছেঁয়া দেখতে লেগেছে, লুন খেয়ে বলে বাতাসা খেলাম। আজ দুপুরে মশায় মা বলে মোকে 'মা' বলে ডাক সাধন।'

'বললে!'

'হ্যাঁ মশায়। ডাক্তার আনা করব আপনি টাকা দেন।'

সাধন কান্দোরীর মনিব ওকে দশটি টাকা হাতে দিয়ে বলল, মাকে চিকিচ্ছে করা সাধন। শত হলে গর্ভধারিণী।'

'আমার মা মনিষ্যি লয় গো মশায়। মা ঠাকুরনী।'

'তুই ডাক্তার ডাক।'

অনাদি ডাক্তার যাকে চিকিৎসা করে সে-ই মরে যায় বলে কলোনীর লোকেরা ওকে মেরে তাড়িয়েছিল। অনাদি ডাক্তার এখন রেলপারে খালধারে দোকান খুলেছে। বর্তমানে তার প্রচুর পসার।

ইদানীং বহু খুনজখমের লাশকে ও মোটা টাকার বিনিময়ে 'ডায়ো অফ হার্ট ফেলিওর' লিখে শ্মশানে পাচার করে। শ্মশানের লোকদের আজকাল টাকা দিয়ে কেনা যায় এই যা সুবিধে।

অনাদি ডাক্তারের যে বাড়বাড়ন্ত হবে তা জটি ঠাকুরনী বলেছিল হয়তো সেই জন্যে, হয়তো বহু ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাত, মিথ্যা সার্টিফিকেটে পাপের ভয়ে, ব্রাহ্মণ অনাদি ডাক্তার জটি ঠাকুরনীর পা ধরে তেল নারকেল-চাল-লবণ দিয়ে প্রণাম করে।

অনাদি ডাক্তার তাই তাড়াতাড়ি জটি ঠাকুরনীকে দেখতে গেল ভয়ানক দুর্গন্ধ জটির ঘরে। তক্তপোশে টকটকে লাল রংয়ের ময়ল চেলি পরে জটি ঠাকুরনী রূপকথার রাক্ষসীর মতো চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। পেট ফুলে উঁচু, হাত পা চিতিয়ে ফেলে রাখা। জটি ঠাকুরনীর চোখে শুধু আশ্চর্য, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল। পিচুটিভরা রক্তাভ চোখের দৃষ্টি এত সুন্দর হতে পারে তা অনাদি ডাক্তার জানত না।

অনাদি ডাক্তারের টেবিলে মাঝে মাঝে যে-সব যুবতী মেয়ের অসহায় বেদনায় শুয়ে থাকে, তাদের চোখের চেয়েও জটি ঠাকুরনীর চোখ সুন্দর। আসন্ন মৃত্যু ছাড়া আর কেউ এমন সৌন্দর্যে মানুষের চোখ রাঙিয়ে দিতে পারে না।

অনাদি থমকে গেল। নাড়ী দেখে, পেট দেখে অনাদির চোখে জল এল।

আহা, জটি ঠাকুরনীর কাছে সে বছরে পাপ স্খালন করতে দু-একবার আসত।

'মা, পাপ হয়ে গেল মা।'

দিনমানে জটি ঠাকুরনীকে কেউ মা বলত না, ঠাকুরনী বলতে হত। অনাদি আসত রাতের কালোয় মুখ ঢেকে।

'কি পাপ, অ আমার বাপ, কি পাপ?'

'মেয়েটা মরে গেল মা।'

জটি ঠাকুরনী নিশ্বাস ফেলে বলত 'মহাপাপী ছিল যি উ। তুমি কি জানবে বাপ, উ-র আঁতাটা (আত্মা) লিয়ে৷ এমন যমদূত ডাঙশমারা করবে। মহাপাপে বাপের মুখে কালি দেয় নাই উ?

ভদ্দর ঘরের মিয়ে তু, তুর এমন বেভ্রম ?'

'কি হবে মা ?'

'এই লাও বাপ। গোসাপের কণ্ঠহাড়টি মাদুলীতে আছে। বালিশের তলে রেখে লিদ যাবে। আর তে-সন্ধে গঙ্গাজল দেবে ঘরে, কেমন ?'

অনাদির মতো পাপী-তাপীদের জন্যে আঁতুড়ের মরাছেলের নখ, গোসাপের কণ্ঠহাড়, ধনেশ পাখির তেল কে সংগ্রহ করবে ? পয়সা নয়, কড়ি নয়, শুধু একপালি চাল নিত জটি ঠাকুরনী। সন্ধ্যা হলে ঠাকুরনী হয়ে যেত সাধনের মা। ঠাকুরনী হয়ে যে চাল পেত, মা হয়ে তার ভাত রেঁধে ওর হাবা ছেলেকে খাওয়াত।

এখন অনাদিকে কে দেখবে ? দুঃখে অনাদির চোখে জল এসে গেল। অনাদি বলল, 'সাধন, হাঁসপাতালে লিয়ে যেয়ে দেখা। ঠাকুরনীর শরীল আমি ভাল বুঝি না।'

অনাদি টাকা দিল। বলল, 'ট্যাক্সি চাপিয়ে লিয়ে যাবি।'

সাধনের মহাপ্রাণী ভয়ে উড়ে গেল। টাকা নিয়ে ও তাড়াতাড়ি মিঠাইয়ের দোকানে গেল। মনের দুঃখে মুড়ি-বাতাসা-গজা কিনে দোকানে বসে বসেই খেল সাধন। ঘটি ঘটি জল খেল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার জটিকে নিল না। বলল, 'মুর্দা হ্যায়। গাড়িমে মর্ যায়গা।'

তখন সাধনের মনিব বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ দিল। খাটুলী তৈরি করে জটি ঠাকুরনীকে নিয়ে সাধন বাঙ্গুর হাসপাতালে গেল।

হাসপাতাল বড় অচেনা জায়গা। এত বড় বাড়ি, এত মানুষ-জন, সাধন বলল, 'ভাই বলরাম ! ডরে মোর হাত পা পেটের লাড়ীতে সান্ধায়। ঐ আঁসপাতালে এত দরজা, কিন্তক কুন পথে ঠাকুরনীকে ভিতরে লিয়্যে যাই তা বল ?'

'তুই এক জেতের মানুষ সাধন।'

বলরাম, জগদীশ আর উদ্ধব ডাক্তারকে ডাকল। জটি ঠাকুরনীকে ওরা ভর্তি করবেই করবে। ডাক্তার যত বলে 'বুড়ি এখনি মরবে',

সাধন তত কাঁদে 'ঠাকুরনীকে বাঁচিয়ে দেন গো! ঠাকুরনী বিনে মোর জগত আন্ধার! আহা! ঠাকুরনী যি সাঁঝ হলে মা হয় গো। মোর মাথায় সাদা চুল, তবু মোকে লিয়্যে কত সুহাগ করে ঠাকুরনী! লিজে না খেয়্যে মোকে খাওয়ায় গো!'

'কি বলছ তুমি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

'ডাক্তারবাবু গো!'

সাধন মাথা-কাটা বলির মোষের মতো মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে ছটফট করতে লাগল।

বলরাম এই কুতঘাটে বিয়ে করেছে। কলোনীর মানুষ ও. ভদ্রলোক দেখে ভয় পায় না। যতদিন বলরাম গরিব ছিল ততদিন ভদ্রলোক দেখে ওর রাগ হত না। তখনো ওর গায়ে ধলেশ্বরীর নদীর শীতলতা, স্বভাবে ধানক্ষেতের নম্র শ্যামলিমা ছিল।

এখন কলোনীতে বাড়ি, নিজের রিক্সা ও বারুইপুরে ধানজমি করবার পর থেকে বলরাম বদলে গিয়েছে। ভদ্রলোক দেখলে, নম্র ব্যবহার পেলে, মিষ্টি কথা শুনলে ওর থুতু ছেটাতে ইচ্ছে করে। বলরাম জানে বর্তমানে এই বাংলা বাপের নয়, দাপের।

বলরাম এগিয়ে এল। কাটা-কাটা কথায় বলল, 'উনি সামান্য মানুষ নয়, জানলেন? উনি দেবাংশী মেয়েছেলে, আমরা ওঁকে মান্য করি, ধর্মপূজোয় ওঁকে ডালা দিই। সিট থাকলে ভর্তি করে নিন না সার। সিট আমার নয়, আপনারও নয়, সর্বসাধারণের, তাই না?'

অবশেষে জটি ঠাকুরনী ভর্তি হল।

সাধনের কান্নাকাটি দেখে ডাক্তারের কষ্ট হয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিল ডাক্তার! এতবড় সা-জোয়ান পুরুষকে মায়ের জন্য এমন করে কাঁদতে দেখেনি ডাক্তার।

'ঠাকুরনী বাঁচবে না ডাক্তারবাবু?'

'দেখি সাধন। অস্থির হয়ো না।'

'কুন ওগ ওয়ার লাই মশাই! উনি মনিষ্যি নয়, উনি দেবতা গো!

ওগ উয়ার কাছে আসতে ডরায়।'

'তা তো বটেই।'

'এই তো উনি দিনেমানে ঠাকুরনী থাকে গো মশায়! সাঁঝে সকালে আমার মা হয়। গঙ্গাজলে চ্যান করলে, আঙা কাপড় পরলে উনি ঠাকুরনী। ত্যাখন তার সভার তো আমিও উয়াকে মান্য দেই গো!'

'তাই নাকি?'

'কিন্তু মা বুলবার লেগ্যে আমার জীউটা ফাট্যে গো মশায়! তাই! য্যাখন সাঁঝ হয়, আমি যেয়্যে উয়ার কোলে মাথা রাখব আর মা! মা! মা! বলে সাধ মিটয়্যে ডাকব।'

ডাক্তার অবাক হয়ে সাধনকে দেখছিল। নার্স একটু হেসে বলল, 'তোমার অতবড় মাথাটা ওঁর কোলে রাখ?'

সাধন গভীর আন্তরিকতায় বলল, 'মাথা আখব, মা বলে ডাকব, তা বাদে কত অঙ্গ করব মোরা! উয়ার দিনেমানে ভক্তজনা আছে। কিন্তক এতের বেলা আমি বিনা উয়ার ক্যাও নাই।'

'দিনে কি খেত তোমার মা?'

'আমি কি জানি মশায়? এই ধরেন গা, চা খাবে, গাঁজা খাবে, গঙ্গাজল খাবে। দেবাংশী শরীলে কি ভাত-জল চায়?'

'সন্ধ্যেবেলা?'

'ভাত রান্ধবে, মোকে দেবে, লিজে খাবে ত্যাতটুকুন। য্যামন কচিছেলা খায়।'

'সেই জন্যেই রোগটা হয়েছে সাধন।'

'লা গো! ওগ উয়ার লাই। ওগ কি দেবাংশী শরীলে পশে? লোকে মনে হয় ক্যাও রিষ করে বাণমারা করল বুঝি?'

'দেখি, আমরা দেখি।'

'ডাক্তারবাবু!'

'বল?'

সাধন মাটিতে পা খুঁড়ে বলল, 'আপোনাদের ঘরে তো লক্ষ্মী বান্ধা গো। ভাতের পাহাড়, ডালের সাগর। তা উয়ার ভাগের

ভাতটা মোকে দিতে পার ? উতো এখন খায় না !'

'তা হয় না সাধন।'

ডাক্তার অবাক হয়ে সাধনকে দেখতেই থাকল। মানুষের শরীরে পশুর মত সরল প্রবৃত্তি এমন করে ডাক্তার আর কখনো দেখেনি।

কিন্তু জটি ঠাকুরনীর চিকিৎসা হল না। 'উয়ার কি হয়েছে. বলেন মাশায়,' বলে ডাক্তারের মাথা খেয়ে ফেলল সাধন।

ডাক্তার কি বলবে ? জটি ঠাকুরনীকে ওরা গ্লুকোজ দিল. স্যালাইন দিল, গলার নলী শুকিয়ে গিয়েছে বলে নল চালিয়ে পেটে খাবার দিতে চেষ্টা করল। চেষ্টার ত্রুটি হল না।

জটি ঠাকুরনীর অবস্থা ভাল হল না। মাঝে মাঝে যখনি ওর জ্ঞান হয় তখনি ও বলে. 'হাঁসপাতালে মোকে এখো না বাপ মোর। মোর সাধন বাপো। উ ডাক্তার মোর নাড়ি ছিঁড়বে, ডোমগুলান মোর খুলি-হাড় বিচে ফার্সা করবে। মোকে ঘরে লিয়া কর।'

তিনদিনের দিন ডাক্তার জটির রোগ ধরতে পারল। জটির রোগ বড় ছোঁয়াচ। আজও ভারতভূমিতে তার চিকিৎসা বেরোয়নি কোন। এ রোগের নাম অনাহার। না খেয়ে না খেয়ে, খুদকুঁড়ো সাধনকে খাইয়ে জটি ঠাকুরনীর নাড়ী শুকিয়ে গিয়েছিল।

'এ দেব-রোগ সাধন, এর চিকিৎসা আমি জানি না।'

ডাক্তার একটু ঠাট্টা করল।

'তবে লিয়ো যাই ?'

'নিয়ে যা।'

জটি ঠাকুরনীও চোখ চেয়ে বলল. 'আরে মড়া, আরে বোকা সাধন ! মোর জন্মবিত্তান্ত তু জানিস না ? জানিস না আমি কুন সামাজের মিয়ে ? মোকে ঘরে লে. ঘরে আমি শরীল রাখব।'

বলরাম. জগদীশ. সাধন, আরো পাঁচজন সমারোহ করে জটি ঠাকুরনীকে ঘরে নিয়ে এল। জটির ঘরের সামনে একটা নিমগাছ। তার ছায়াতে জটিকে শোয়ানো হল।

'নিমগাছের ছায়া ভাল সাধন। আমরা পাঁচজন আছি। তুই যেয়ে ওনার কাছে বস গা।' বলরামের কথায় সাধন গিয়ে

জটি ঠাকুরনীর কাছে বসল।

'একোজনা বামুন ডাক গো!'

'আছে, বামুন আছে।'

'কে গো?'

'অনাদি ডাক্তার।'

'উনিকে ডাক। ঠাকুরনীর কাছে বসাও।'

অনাদি ডাক্তার জটি ঠাকুরনীর কাছে বসল। সাধন অভিভূত কাতর।

'কথা বুলে যাও গো কিছু, ও আমার সাঁঝ-সকালের মা!'

'বুলব।'

জটি এখন শেষ সময়ে চেতনা ফিরে পেয়েছে।

'বুল গো!'

'তোমার বাপ কান্দোরী। তোমরা জেতে বেদিয়া। বনে ঘুর, বাদাড়ে ঘুর, আর আশ্চাজ্জা চিকনপাটি বুন!'

'তুমি?'

'আমি?'

এখন আকাশে সূর্য, বেলা এখন দশটা। জটি যখন ভাল ছিল এই সময়ে ও ঠাকুরানী হয়ে ঘরে বসে থাকত, মানুষজনের পূজো নিত। এখন সাধনের খুব ইচ্ছে মা হয়ে যায় জটি, বলে— সাধন আমার কাছে আয়।

জটিরও ইচ্ছে হল সাধনকে কাছে ডাকে। বলে অ সাধন, কাছে আয়।

জটি তা বলতে পারত। জটি তা বলল না। এখন তার চারপাশে কত ভক্ত, কত মানুষ। এরা ওর কাছে আসে, প্রণাম করে, সম্মান জানায়। ওরাই তো বছরভোর নিত্য চাল যুগিয়ে যুগিয়ে সাধনকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজের ইচ্ছেয় জটি একদিন ঠাকুরনী হয়েছিল। আজ ওকে ঠাকুরনী হয়েই মরে যেতে হবে।

'তুমি কি গো?'

সাধন সরল ভক্তিতে জিগ্যেস করল। মা কে? জটি কে?

সাধনের বাবা যদি কান্দোরী হয়, জটি কি অন্য সমাজের মেয়ে? সাধন, বলরাম, জগদীশ সবাই কাছে ঘিরে ঘন হয়ে এল।

'তুমরা ছুট নও বাপো! তুমরা জেতে বড়, অ্যানেক বড়।'

'তুমি?'

'আমাদের বেত্তান্ত বড় আশ্চাজ্জ গো! মোর আদি পুরুষ সেই জারা ব্যাধ। নাম জান?'

'জরা ব্যাধ?'

'মোরা বলি জারা ব্যাধ। মোদের জিহ্বায় তুমাদের সাড় লাই ডাক্তার।'

'ঘোর বিকার।'

অনাদি ডাক্তার সভয়ে বলল। এমন বিকারের রুগীকে হাসপাতাল ছেড়ে দিল কেন? এমন রুগীকে ঘিরে এত মানুষের ভিড় কেন? জরা ব্যাধ তো মহাভারতের মতই পুরনো, গল্প-কথা।

'বিকার লয় ডাক্তার। মোর কথা সত্যি লা মিছা তা বলতে লারব। শুনেছি···'

জটি এক আশ্চর্য কথা বলতে লাগল।

'কুন দেশে য্যান সাগর, কুথায় য্যান দ্বারকাপুরী। জারা ব্যাধ সি দেশে যেএ্যে বাণমারা করেছিল।'

'কাকে?'

'কিষ্ণকে। পুঁথি পড় নাই?'

'সবাই জানে।'

'ই তো পাপের রাজা মহাপাপ! ভগমানকে বাণমারা করে ই হতে বড় পাপ লাই। সি বাদে জারার বংশ সি দেশ তেগে ই দেশে এল।'

'কোথায়?'

'হিজলী—কাঁথি—তমলুক—মেদিনীপুরে।'

'তারপর?'

'মোদের সামাজ বড় ছোট। মোরা শ্মশানে-মশানে ঘুরি, সাপ ধরি, শ্মশানের কলসীতে জল খাই।'

'ছি!'

'মোরা পাখপক্ষী ধরি, মোদের বলে পাখমারা।'

'পাখমারা কোন জাতি গো? নাম তো শুনিনি?'

মোদের আনসামাজে সাঙা হয় না। কিন্তুক আমার মন যেয়ে উ সাধনের বাপে বসল। সামাজে কথা হত, তাই মোরা চলে যেয়ে সাঙা করি গো।'

জটি গুছিয়ে বলতে পারল না। প্রথম বিয়ের নাম বিয়ে। দ্বিতীয় বিয়ের নাম সাঙা। পাখমারাদের জাত ধর্ম অনুযায়ী জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে ওদের দেবতার বিয়ে হয়। আগে দেবতাকে জল-নারকেল দিয়ে তবে ওরা মানুষের ঘর করতে আসে।

'তারপর, অ্যানেক, অ্যানেক দিন বাদে আমি ঠাকুরনী হলাম গো। আমার 'পরে সাঁজ-সকালে দেবতার ভর।'

জটি ঠাকুরনী, জল খাবে, জল?'

'না বাপো সকল। এখন আমি মহানন্দে স্বর্গে যাব। কিন্তুক সাধন···'

জটি হেঁচকি তুলল।

'কি? মোকে কি বল তুমি?'

'আমি ঠাকুরনী হয়েছিলাম। দেখ, মাথার 'পরে সূর্য।'

'এখন দিনমান।'

'তুর মা লয় সাধন, ঠাকুরনী স্বর্গে যায়। তুকে অ্যানেক দেব্য দিতে হবে যি।'

কি দেব্য?'

সকলের মনে মহা কৌতূহল। সাধনের মাটির উঠোনে পাড়া-পড়শীর ভিড়। যেন এক অন্ত্যজ, গরিব, হতভাগিনী মারা যাচ্ছে না, যেন কোন মহামানী দামী মানুষ মারা যাচ্ছে তাই এত ভিড়।

সবাই চুপ করল। নিশ্বাস টানল। কি চাইবে তাদের জটি ঠাকুরনী শেষ সময়ে।

'সাঁঝে মরতাম বিয়েনে মরতাম, তুর কানাকড়ি লাগত না। এ্যাখুন তু মোকে হাতী দিবি! ছরাদে হাতী দিবি।'

'কিরে কাড়লাম।'

শোকে দুঃখে পাগল, ঘটনার অস্বাভাবিকতায় হতবুদ্ধি সাধন বলল, 'সভে শুন, উনির ছরাদে আমি হাতী দান করব।'

'ঘো…ঘো…ঘো…ঘোড়া দিবি।'

'দিব।'

'অন্ন-বস্ত-ভুঁই-সোনা-উপো অযচ্ছল দিবি।'

'দিব।'

সাধন ডুকুরে কেঁদে উঠল, 'সব দিব গো! তুমি মোরে ছেড়ে যেয়ো না। মোর কাণ্ড লাই!'

'তুর বো…বো… বো…'

জটির গলায় কথা আটকে গেল। সাধনের যে বউটা পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ি আছে তাকে নিয়ে আসবার কথাটা জটি বলে যেতে পারল না। তার আগেই ওর মাথা টলে পড়ল।

কোরা কাপড়ে সাজিয়ে, ফুলচন্দনে মুড়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে ওরা জটি ঠাকুরনীকে পোড়াতে গেল। সব খরচ অনাদি ডাক্তার দিল। জটির মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনাদি ডাক্তারের প্রথমেই মনে হল, যাক্, আর নিত্য নিত্য চাল দেবার দায়-দায়িত্ব রইল না। চালের দাম যখন তালগাছের মাথায় ওঠে তখনো অনাদি জটি ঠাকুরনীকে চাল দিয়ে পেন্নাম করতে যেত। অনাদির বউ বড় রাগ করত, বলত, 'দেবাংশী মানুষ, কিন্তু ভক্তজনের কষ্ট হয়, তা বোঝে না?'

বড় দুঃখ হল অনাদির। বলরামের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে অনাদি বলল, 'তোরা যা খাবি খাস। কিন্তু ঠাকুরনীকে চন্নন কাঠে পোড়াবি। হ্যাঁ, কাঠ শুঁকে নিবি। ফুল দিস, খই ছেটাস, পয়সা ছেটাস, কেমন? তোর বোনাইয়ের না কেত্তন দল ছিল?'

জটির মৃত্যু এখন বলরামদের কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার। মরণকালে, ঘোর বিকারে জ্বরাচ্ছন্ন মাথায় জটি যা যা বলেছে সব কিছু এখন বলরামদের কাছে দৈববাণী। তাই বলরাম বলল, 'না আইলে মাথা ছিঁড়িয়া ফালামু।'

ক্বচিৎ বলরাম এ ধরনের কথা বলে। এই কথা শুনেই ওর

ভগ্নীপতি এসে হাজির হল। নামে সদানন্দ, স্বভাবেও তাই। সরকারী আপিসে পিওন ও।

'গুলি মার চাকরিতে। ক্যাজুয়াল লীভ নাই' কামাই করলে কখনো সরকারী আপিসে কাজ যায় না।'

এই কথা বলে ও কোমরে গামছা বাঁধল। মাথার চুল আঁচড়ে, গলায় কাগজের বনমালা পরে সদানন্দ আর ওর সেখোরা 'হরিনাম অঙ্গে লিখে হরিপদে যাও' গাইতে গাইতে জটি ঠাকুরনীকে নিয়ে চলে গেল।

॥ ১ ॥

সাধনের সাঁঝ-সকালের মা কেমন করে মানবী থেকে দেবী হল সে বড় আশ্চর্য কথা।

ওরা মেদিনীপুরের পাখমারা, ওরা যাযাবর। ওরা বলে ওরা জরা ব্যাধের বংশধর। ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল বলে ওরা অভিশপ্ত। সুদূর দ্বারকা থেকে ওদের চলে আসতে হয়েছিল।

ওদের ঘর থাকতে নেই। ওরা পাখি ধরে, পাখি বেচে। শ্মশানের গাছে রান্নার হাঁড়ি টাঙিয়ে রেখে ওরা সংসার করে। শবশয্যায় ওদের বর-বউ অবহেলে ঘুমোয়, ভালবাসে। চিতার আগুন দেখে ওদের মনে দেহতত্ত্ব জাগে না। মা ছেলেকে সোহাগ করে, স্বামী স্ত্রী বসে গান গায়।

মেদিনীপুরে লবণ খালাড়িতে, কাজুবাদামের বাগানে দক্ষিণ ভারতের এমন অনেক লোক আসে, যায়, কাজ করে।

ওদের সমাজের বাইরে বিয়ে করতে নেই। কিন্তু জটির শরীরে আশ্চর্য রূপ ছিল। তামাটে রং, নীল চোখ, কটা চুল। চুল চুড়ো করে বেঁধে জটি তাতে লাল পাথরের মালা জড়াত। বড় ভাল লাগত জটির নদীর জলে মুখ দেখতে, গাঢ় নীল কাপড় পরে নিজের শরীরটি সাজাতে।

শীতকালে জটিরা তখন সুবর্ণরেখার চরে। চরের বালিতে তখন যাযাবর পাখিদের ভিড়। শরবনে ফাঁদ পেতে জটি শিস দিয়ে দিয়ে পাখি ধরত।

সেখানেই একদিন উৎসবের সঙ্গে ওর দেখা। উৎসব জাতিতে কান্দোরী। ওর জাতব্যবসা চিকনপাটি বোনা। উৎসবের তখন বছর তিরিশ বয়স। বেঁটে, বলিষ্ঠ, শ্যামল চেহারা। কাঁধ অবধি বাবরী চুল। উৎসব গান বাঁধত, গান গাইত।

জটিকে দেখে ও গান বেঁধেছিল

'ও নীল শাড়ি, আঙা মেয়ে
দেখ্ চেয়ে
তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায় ॥'

জটির হাতে তখন জালে জড়ানো নীলকণ্ঠ পাখিটা ছটফট করছিল।

জটি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পিচ কেটে বলেছিল, 'পরাণ জ্বলে যায়! খালভরার গান শুন। দিলে তো মোর পাখিগুলান্ উড়ায়ে?'

'ও পাখি ধরে কি হবে সখী
মোর প্রাণপাখি
এনে ফেলে দিব তোর পায়ে
হা তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায় ॥'

উৎসব গেয়ে উঠেছিল।

খুব মজা লাগছিল ওর। ওদের সমাজের মেয়েগুলো তো এমন বন্য হয় না! এমন করে চোখ টানে না! মেয়েটার চোখ, ঠোঁট, নাক যেন পাথর কেটে বের করা।

'খালভরা!'

জটি গাল দিয়ে চলতে শুরু করেছিল। উৎসব লাফিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরেছিল।

'তু আমায় গাল দিলি কেন?'

'তু গান বাঁধলি কেন? আমার পাখি উড়ালি?'

উৎসব হা হা করে হেসেছিল। তারপর অতর্কিতে ওর হাত থেকে জালটা কেড়ে নিয়ে নীলকণ্ঠ পাখিটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। হতচকিত, ক্রুদ্ধ জটির ওপর জালটা ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'তু

আমার পাখি। পালাবি? তু আমার প্রাণপাখি।'

জটি কাঁদতে শুরু করেছিল। তারপর জাল ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জটি। উৎসবের হাসি ওকে অনেকক্ষণ তাড়া করেছিল।

পরদিন উৎসব চলে এসেছিল ওদের ডেরায়। জটির ঠাকুমাকে গড় করে বলেছিল, 'টুকো ওষুদ দেন দেখি। বনেবাদাড়ে ঘুরি, বুকে আমার বেথা করে গো। আপোনারা তো গুণী মানুষ, ওষুদের কারবারী, তা টুকো ওষুদ দেন।'

জটি ফোঁস করে বলেছিল, 'উ খালভরাকে পেটন ওষুদ দিলে ভাল। উ মোর পাখি উড়ায়্য দিল, তা জানু?'

জটির ঠাকুমা হেসেছিল। জটিকে গাল দিয়ে বলেছিল নিজের কাজে যেতে। এ সমাজের ছেলেমেয়েকে বাইরের দিকে চাইতে নেই, নিজের সমাজে থাকতে হয়। জটির চনমনে ভাব দেখে ঠাকুমার ভয় হয়েছিল।

উৎসব ওদের ডেরায় আর আসেনি। জটির পেছন পেছন ঘুরে ঘুরে ও জটিকে নতুন নতুন অচেনা সব স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ঘরের স্বপ্ন, মাচায় ধানের ডোল, বেতের দোলায় শিশু-সন্তান। সে ঘরে জটি আয়নায় মুখ দেখে, রূপোর গয়না পরে, লাল-নীল নানা রঙের শাড়ি সে ঘরের উঠোনে মেলা থাকে।

চিকনপাটির চেয়েও মনোহারী নকশায় স্বপ্নটার জাল বুনে বুনে উৎসব জটির ওপর জালটা ফেলে দিয়েছিল।

জটি আর জাল ফেলে পালায়নি।

ওরা পালিয়ে গিয়েছিল।

খড়্গাপুর থেকে দীঘা। কাজুবাদামের মরশুমে দিনমজুর, মাছের মরশুমে মাছ শুঁটকি করার কাজ।

অনেকদূর না পালালে কাওয়ামারারা অভিশপ্তদের সমাজ ছেড়ে যাবার অপরাধে ওদের তীর ফুঁড়ে ফেলত।

উৎসব স্বপ্নটাকে ঠিক সত্যি করতে পারেনি। কিন্তু জটি বড় সুখী হয়েছিল। কি জীবন! শুধু দুটি দুটি রাঁধ আর খাও আর ভালবাস। হাতে টাকা পেলে কাপড় কেন। কুঁচের মালা, গালার

চুড়ি, রুপোদস্তার গোটা। অন্যরকম করে চুল বাঁধ, অন্য ছাঁদে কাপড় পর। এখন তো আর তুমি কাওয়ামারা নও। এখন তুমি জাতে উঠেছ, শ্রেণী বদলিয়েছ।

'মোদের জাত ফেলনা লয় জটি! মোরা পণ দিয়ে মেয়ে লিই, সমাজকে ভাত খাসী দিই।'

'উ কথা থাক!'

জটি সভয়ে বলত, ওর শুধু মনে হত এই ঘর, এই ভালবাসা থাকলে হয়! চির-অভিশপ্ত ওরা, ঈশ্বরকে যারা হত্যা করে গোড়ালিতে বাণ মেরে, তাদের বুঝি ঘুরে ঘুরেই জীবন শেষ করতে হয়।

জটি তো তা করেনি!

যদি সেই রাগে ঠাকুমা বাণ মারে! মা জটি আর উৎসবের খড়ের পুতুল তৈরি করে শলা দিয়ে এ ফোঁড় ও-ফোঁড় করে!

বড় ভয় পেত জটি, গুন গুন করে বলত, 'উদের কথা রাখ দেখি, মোর সাথে আন কথা বল।'

'তু ডর খাস?'

'খালভরা!'

মৃদুস্বরে বলত জটি। পেছন ফিরে চুল বাঁধতে বসত। একেই কি বলে জাত হারানো, নিচু থেকে উঁচুতে ওঠা? কই, গলায় তো জোর খুঁজে পেত না জটি! বলতে তো পারত না 'মর গা যা।'

মাঝে মাঝে শুধু ডুম-ডুম, ডুম-ডুম ঢোলের শব্দ শুনলে জটি চমকে উঠত।

পাখমারারা অমনি করে ঢোলে নরম চাঁটি মারতে মারতে আসে। দল বেঁধে ঘোরে ওরা, মৌমাছিদের মত এক জায়গায় চাক বেঁধে থাকে।

ঐ একসঙ্গে থাকাটা ওদের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস।

ওরা তো সামান্য নয়, ওরা যে জরা ব্যাধের বংশধর। ব্যাধ তো সামান্য নয়, সে যাঁকে মেরেছিল তিনি যে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান। গাঁই-জ্ঞেয়াতি-সকল মানুষ এত পাপ করেছিল, এত শাস্তি পাচ্ছিল যে মনে দুঃখে কৃষ্ণভগবান নির্জনে গিয়ে দুদণ্ড জিরোচ্ছিলেন।

রাঙা টকটক পদ্মফুলের মত পা।

'আঙা টকটকে, পদ্মফুলের মত পা!' জটির ঠাকুমা মাথা নেড়ে নেড়ে বলত, 'সি শরঝোপ হতে দেখে উয়ার বুদ্ধি হরে গেল যেমন! দিলে টং করে বাণ মেরে! ব্যস! অমুনে কি হল জান?'

আকাশ অন্ধকার হল, সূর্য মুখ ঢাকল। সমুদ্র মনের দুঃখে জলের প্রাণীগুলিকে উগরে দিল। মাছের ডোঙা মারা পড়ে যারা জলের নিচে গেছে তারা অবধি প্রাণ পেয়ে কেঁদে উঠল। গোয়ালারা গাই দুইতে গিয়ে দেখে দুধের বদলে রক্ত পড়ছে। ফটফটে সকাল। কিন্তু রাতের মত কালো আকাশে তারা জ্বলতে লাগল।

তখনি সেই দৈববাণী হল।

ভগবানকে যারা মারে তাদের ঘরদোর থাকতে নেই। তাই দৈববাণী বললে, 'জারা হে জারা! ব্যাধ হে ব্যাধ! ই ভোবনে ভগবান বার বার আসে। তুমার মত একেকটা কসাই ভগবানকে বাণফুঁড়া করে। যারা ই কাজ করে, তাদের ঘরে থাকতে মানা। তুমি এখন তোমার জাঁতের লোক, গাঁতের লোক লিয়ে বে-উদ্দিশা হও গা। জানলে?'

কুথা যাই?'

'যেদিকে দু'চক্ষু যায়।'

'সামাজ লিয়ে যাব?'

'সামাজ লিয়ে যাবে লয় তো কি থুয়ে যাবে? তোমার সামাজ এখুন মাহাপাপীর সামাজ। উ সামাজে যে ছেলেমেয়েরা বিয়া দিবে তার মরণ। তা দেখ বিয়াসাদী যা হবে নিজেদের সামাজে। সামাজ ছেড় না। আর দেখ, জারা হে জারা! ব্যাধ হে ব্যাধ! মোর কণ্ঠ কানে যায়?'

'যায়।'

'আর দেখ, তুমার সামাজের প্রতিটি ছেলা বল, মেয়া বল, যেন সামাজ না ছাড়ে। তুমার পাপে উরাও তো পাপী, তাই। জন্মকালে উদের সাথে দেবতার বিয়া দিবে।'

'দিব।'

জরা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল। আহা! দ্বারকা ছেড়ে যেতে কে চায় গো! কি সুন্দর দ্বারকাপুরী! নীল সমুদ্রের তীরে কি সুন্দর সোনার চুড়ো দেওয়া ঘরদোর। জরা অবশ্য বনেবাদাড়ে থাকে, দূর থেকে দেখে, কিন্তু পরের সুখ, পরের রমরমা, দেখেই কি সুখ কম?

তারপর কি জরার কম শাস্তি হয়েছিল? গাঁতের লোক আঁতের লোক, পোঁটলাপুঁটলি, শিকারী কুকুর, সব নিয়ে কি কম ঘুরতে হয়েছিল?

কোথায় সত্যপুত্র, কোথায় কেবলপুত্র, কোথায় চোল, কোথায় পাণ্ড্য, শুধু ঘুরে ঘুরেই মরল জরা। ঠাঁই আর পেল না।

'হ্যাঁ! ভগবানকে বাপমারা করে এলেন মোদের দেশকে সর্বনাশ করতে। ওরে আমার চালাক শিয়াল! দ্বারকাপুরী শ্মশান করেছ, এখন আমাদের মারবে?'

জরা জায়গা আর পায় না। থিতোতে আর পারে না। এদিকে ওপরে বসে দেবাদিদেব নিশ্বাস ফেলেন। দ্বাপর যুগ যায়, কলি যুগ আসে। ঘুরে-ঘুরে জরার বয়েস হল অযুত নিযুত। পায়ে গোদ হল। অঙ্গে ব্যথা। কে যেন একদিন দয়া করে বললে, 'রাঢ় জান? বঙ্গ জান? গৌড় জান? যাও! গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশে, সেই দেশে যাও। সে দেশে সকল পাপী তাপী লোভী-তঞ্চক-শয়তান আশ্রয় পায়। সে দেশ কারেও ফিরায় না। সেই দেশে যাও তুমি।'

জরা এই দেশে এল।

সমাজের মধ্যে বিয়ে, শ্মশানের শয্যায় ফুলশয্যা, শ্মশানের কলসীতে বউ ভাত রাঁধে, গাঁই-জ্ঞেয়াতির পাতে দেয়। খুব স্বাধীন ওদের মেয়েরা পুরুষরা। ওদের মেয়েদের রূপের শেষ নেই। তামাটে চুল চূড়ো করে বেঁধে ওরা পলাকাটির মালা দিয়ে জড়ায়। ওদের চেহারায় পাথরের মূর্তির মত স্বচ্ছ সৌন্দর্য। বহু পুরুষ ওরা কুল ভাঙেনি। স্বজাতে বিয়ে করেছে। রক্তের পবিত্রতা ওদের মহাপ্রাচীন। তাই ওদের চেহারা এত সুন্দর।

কমতে কমতে, মরতে মরতে, এখন ওরা মাত্রই শ'খানেক জন

আছে। কখনো ওরা দল ছেড়ে সরে যায় না।

শহরের রাস্তা ধরে, গ্রামের পথ ধরে ওরা চলে যায়, ড়ুম-ড়ুম-ড়ুম-ড়ুম ঢোলক-বাদ্য বাজিয়ে।

পাখমারা যায়! পাখমারা যায়!

শহরে ওরা পারতপক্ষে আসে না।

মাঝে মাঝে, বছরে একবার দু'বার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার আপিসে ওরা নাম লেখাতে আসে। কেউ মরে গেলে নাম লিখিয়ে রেখে যায়।

সরকারী খাতায় ওরা বুঝি সংরক্ষিত উপজাতি।

জটি তাই, এক কানে আধেক মনে উৎসবের কথা শুনত। আরেক কানে, আধেক মনে বাজনা শুনত ড়ুম-ড়ুম-ড়ুম-ড়ুম।

ওরা যদি আসে?

মা-বাবা, পিতামহী, গাঁই-গাঁতের মানুষ?

যদি বলে, 'চল মোদের সঙ্গে? বনে চল, সামাজে ফিরে চল?'

জটি কি করবে?

উৎসব ওর ভয় দেখে হাসত। গান বাঁধত।

'ওরে তোর মিছে ভয়।
পিরীত ফাঁদে ধরা দিতে কেন এত ভয়!'

জটি বলত, 'খালভরা!'

উৎসব বলত, 'আমার জান থাকতে তোকে ল্যায় কে? তোর উ বুনো বেটারা? তারা উৎসবকে চিনে? একবার দারোগাকে বলা করালে সব বেটাকে শায়েস্তা করে ছেড়ে দিবে।'

তবু জটির ভয় যেত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, উৎসব ওকে অনেক ভয় ভুলিয়ে দিল। জটির কোলে এল এই মোটাসোটা, একমাথা চুল এক কালোকালো ছেলে। দেখে আর বলে দিতে হয় না এ ছেলে উৎসবের। বাপের মুখ যেন অবিকল বসানো। শুধু চোখ দুটি মায়ের মত। স্বচ্ছ, নীলাভ, টলটলে।

জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা খুব বেড়ে গেল উৎসবের। জটিকে তো

ও নিজের জাতে তুলেছিল। উৎসব মনে মনে জানে সে চিকনপাটি বোনে, সে পাখমারা-পাখধরাদের চেয়ে জাতে উঁচু। আবার এই যে এখন মজুর খাটা—এও আরেক ধাপ জাতে ওঠা।

ছেলের বাপ হয়ে উৎসবের মনে হল সে আরো উঠতে চায় জাতে। সে আর গরীব-গুরবোর বৃহৎ সমাজে থাকতে চায় না। ভদ্রলোকের ছোট্ট সমাজের এক কোনায় আসন পেতে চায়।

জটিকেও উৎসব তাই-ই বলল।

'জটি লো জটি, জটেশ্বরী! বিডিড আপিসে যেয়েছিলাম, তা বি-ডি-ও বাবুরা কি বললে জানিস?'

'কি?

'একুন আর কুন বাধা নাই। আমি টাকা খর্চ করে কাছারীতে যেয়ে একুনি নাম পালটাতে পারি। কান্দোরী-মান্দোরী যে শুনে সেই বুঝে জেতে মোরা ছোটি গো!'

'নাম পালটাবি?'

'কেন লয়? উৎসব কান্দোরী কেমন শুনতে? উৎসব দাশ, সাধনচন্দ্র দাশ কেমন শুনতে? তা বাদে অন্য কাজ লিয়ে বড় শওরে চলে যাস যদি, তাহলে তো কাজ সারা!'

'কেন?'

'বড় শওর জগন্নাথের ছিক্ষেত্তর। সেথা ক্যাও কারো খোঁজ ল্যায় না। নাম দেখলে চিন্তা করবে এ বেটা লিশ্চয় জেতে উঁচু, লইলে নামের পিছে দাশ কেন?'

উৎসবের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আনন্দ হয়েছিল জটির। কোমরে হাত দিয়ে ও নাচতে শুরু করেছিল। 'চল, চল-তাই চল। এখুনি যেয়ে জেতে উঠি।'

উৎসব সস্নেহে বলেছিল, 'পাগলি! এখন কি? ছেলার বয়সে হোক্! মুখে অন্নপ্রসাদ দেই। দেব-ঠাঁইয়ে পূজো পাঠাই!'

জটির একবার মনে হয়েছিল যার পূর্বপুরুষ একবার ভগবানকে হত্যা করে, সে কি নিজের সমাজের নির্দিষ্ট দেবতা ছাড়া অন্য কাউকে পূজো করতে পারে? যদি পাপ হয়? যদি ক্ষতি হয়?

তারপর মনে হয়েছিল উৎসব ঠিকই বলছে। সব ছেড়ে পালিয়ে গেলো. সরকারের কাছারীতে লিখে-পড়ে জাত পালটালে তাহলে আর ওর মা-ঠাকুম ওকে ধরতে ছুঁতে পারবে না।

'তাই ভাল!' জটি চোখ বুজে বলেছিল।

পাখমারাদের পূর্বপুরুষ জরা ব্যাধকে যে দেবতা দৈববাণী করেছিলেন, তিনি হেসেছিলেন?

হল, সাধনের মুখপ্রসাদ হল। উৎসব তখন খড়্গপুর স্টেশনে মোট বয়। কুলীদের সমাজকেও ও ভাত-খাসী দিল। তারপর চোরাই বিক্রির চোলাই মদ খেয়ে বমি করে হাসপাতালে মরে গেল।

নিজের দেখানো স্বপ্ন, প্রাণভরা ভালবাসা, কণ্ঠভরা গান, সব নিয়ে চলে গেল উৎসব। জটি আবার একা। জটি এখন স্বাধীন। জটি এখন ইচ্ছে করলে যেখানে মন চায়, চলে যেতে পারে। কিন্তু দোলায় শুয়ে ঐ যে ছেলেটা কাঁদে আর মিটিমিটি চায়?

জটি বুঝতে পারল এখন ওকে কি করতে হবে। চলে যেতে হবে ওদের সমাজে। পা ধরে কাঁদতে হবে পিতামহীর। জটি তো জানে উৎসব মরেছে পিতামহীর বাণে। ডাক্তার যা বলুক আর পুলিস যা বলুক।

ভয়-পাওয়া পাখির মত ছেলেকে বুকে নিয়ে জটি চলে গেল ওদের সমাজে।

হা ভগবান! কোথায় ওদের গাই-জ্ঞেয়াতি-জাতের মানুষ? কোথায় সেই বিচিত্রবর্ণের পোশাক, কুকুর-ছাগল গাধার পিঠে জিনিসের বোঝা, পিতামহীর খলখল হাসি?

শ্মশানে নেই মশানে নেই, কোথাও নেই ওরা। জটি ছুটে ছুটে শহরের ট্রাইবাল বোর্ডের আপিসে গেল।

'পাখমারাদের ঠিকানা দেন মহাশয়, আপোনোর ব্যাগ্যতা করি', জটি পিওনের পা ধরতে গেল।

'শ্মশান-মশানে দেখ্‌গা যা! কোথা যেয়ে পড়ে আছে দেখ্‌গা!'

জটির চোখ ফেটে জল এল। এ সমাজ ছাড়া ও সমাজে, এ জাত ছেড়ে ও জাত, কত লোভ দেখিয়ে উৎসব তো সব স্বপ্ন কেড়ে-

কুড়ে নিয়ে চলে গেল।

জটি এখন কি করে?

অনেক রূপ, অনেক স্বাস্থ্য, অনেক যৌবন নিয়ে জটি গিয়ে স্টেশনে বসল। কোলের কাছে ছেলে। জটি গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে আর ভাবে।

জটি ভাবে ওর ছেলের কথা। আর পাঁচজন ভাবতে শুরু করল জটির কথা।

জটি এখন কি করে, কোথায় যায়? জটি গিয়ে কুলী লাইনের হনুমানতলার সন্নেসীর কাছে পরামর্শ চাইল।

'এখানে থাক্।'

সন্নেসী চোখ বুজেই বলল। প্রৌঢ় সন্নেসী। অনেক ঠাকুর দেবতার পর এই হনুমানজীকে আঁকড়ে আছে বলে এখন ওর অবস্থা ফিরেছে খানিকটা।

জটি এসে এখানে বসবার সঙ্গে সঙ্গে হনুমানতলার ভিড় বাড়তে লাগল। সন্নেসী মনে মনে প্রমাদ গনল।

কয়েকদিন বাদে তিন-চারজন লোক জটির কাছে এল। বলল, 'ঐ বুড়োর আশ্রয়ে থেকে কি হবে? চল্ আমাদের সঙ্গে। আমরা তোকে শহর দেখাব।'

মিছেমিছি জটি শিরায় শিরায় বহু বছরের প্রাচীন রক্ত বয়ে বেড়ায়নি। বন-জঙ্গল, বনের প্রাণী তার যেমন চেনা, অচেনা মানুষে তেমনি ভয় ওর।

'দূর হ, খালভরা', বলে জটি ওদের গালাগালি করেছিল।

হয়তো তারাই গিয়ে নালিশ করে থাকবে।

কয়েকদিন বাদে পুলিস এসে সন্নেসীকে শাসিয়ে গেল কড়া গলায়। বলল, 'সব খবর পাওয়া গেছে।'

'খবর, খবর কি পাবেন বাবামশায়? আমি সন্নেসী মানুষ। ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকি।'

'ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাক না ঠাকুরনী নিয়ে?'

'ছি ছি, মুখ পচে যাবে তোমার…।'

'এখানে মেয়েছেলে রাখ। এখানে বজ্জাতি, বদমায়েসী হয়। মদ চোলাই হয়, তাসের জুয়া খেলা হয়।'

'সব ঝুট।'

সন্নেসীর ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

পুলিসের লোকটি গেরস্ত মানুষ। সে বলেছিল, 'কথা যে মিছে তা তুমিও জানচ, আমিও জানছি। ঐ মেয়েটার জন্যে যত গোলমাল! তা ওকে কেন সরিয়ে দাও না?'

'সরিয়ে দিলে তো ওদের খপ্পরে যাবে। ওরা তো তাই চায়।'

'তবে মরগা যা!'

পুলিসের লোক রেগে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় বলেছিল, 'কেন ওসব গুণ্ডা বজ্জাতকে চটাচ্ছ? গুড় যতক্ষণ রেখেছ, ততক্ষণ মাছি আসবে। ও মেয়েটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মানুষ আসবে এখানে। ওদের তো রাজত্ব এখন। এসে যদি মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যায় তখন কোন বাপের সুমুন্দি এসে ঠেকাবে শুনি?'

সন্নেসী মহাচিন্তায় পড়েছিল। তবে জটি বুঝেছিল এখানে আরো থাকলে সন্নেসীর বিপদ, ওরও বিপদ।

'লাও, আমার য্যাখন সোমসার ছিল, এই বাসনকুসন। সব গচ্ছিৎ রাখ ঠাকুর, আমায় টাকা দাও কটা!'

'কোথা যাবি? ছেলেটা কোথা যাবে?'

'জানি না।'

'তোর কেউ নাই?'

'জানি না।'

সন্নেসী শেষে নিশ্বাস ফেলে ওকে একটা লাল চেলী কাপড় দিয়েছিল। এমন রাঙাচেলী দিয়ে বিহারের মানুষ মড়া ঢাকে।

লালচেলী আর একটা ছোট ত্রিশূল দিয়েছিল সন্নেসী। বলেছিল, 'একদিন তোকে শেয়ালে-শকুনে ছিঁড়ে খাবে তা মনে জানতে পারছি। তবু তুই এই বস্তরে-অস্তরে চলে যা মা। এ ঘোর কলিতেও থাড় কেলাসে সাধুসন্নেসী চলে যেতে পারে, কেউ মাথায় পা দেয় না।'

'যদি শুধায় কিছু?'

'বলবি আমি জটি ঠাকুরনী।'

'ঠাকুরনী'

'আহা বলবি, বলতে মানা কি?'

'ঠাকুরনী!'

সত্যিই ট্রেনে কেউ কিছু বলেনি জটিকে। ওর রূপ, রাঙা কাপড়, পিঠের পোঁটলায় ছেলে, হাতে ত্রিশূল, দেখে সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

জটি জানলা দিয়ে চেয়ে ছিল বাইরের দিকে। দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল ওর। এই তো মানুষ ওকে মান্য দিল, সমীহ করল। এরই নাম কি জাতে ওঠা? আহা উৎসব যদি থাকত, তবে দেখতে পেত কাছারী নয়, আদালত নয়, শুধু একখানা কাপড় আর ত্রিশূলের জোরে জটি কেমন জাতে উঠে গিয়েছে।

আরেকটি লোক ওকে লক্ষ্য করছিল। লোকটি ট্রেনে গান গায়, কখনো শ্যামাসঙ্গীত কখনো হরিনাম। লোকটি বয়স্ক, রোগা, সংসারে ওর কেউ নেই।

জটিকে দেখে ও বলেছিল, 'হাওড়া তো পৌঁছলে বাছা। এখন যাবে কোথা?'

জটি কথা বলেনি।

জটি চোখ বড় বড় করে হাওড়া স্টেশন, জনারণ্য দেখছিল। এই বুঝি সেই ছিক্কেত্তর। যার কথা উৎসব বলছিল! এত মানুষ এখানে, অসংখ্য, অগণন। জঙ্গলে বুঝি একটা গাছে এত পাতা নেই। এত মানুষের মধ্যে জটি কোথায় যাবে?

'বলি যাবে কোথা?'

লোকটি আবার জিগ্যেস করেছিল।

জটি বলেছিল, 'তা তো জানি না'

লোকটি বলেছিল, 'আমার সঙ্গে যাবে?'

'কুথা?'

জটি ওকে ভয় পায়নি। তখনো জটির ভেতরে সেইসব আদিম সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করছে। মানুষ দেখলে ও পলকে বোঝে কাকে

ভয় করবার কাকে ভয় করবার নয়। এই লোকটিকে দেখে ওর ভয় হয় নি। তাছাড়া সামনের আশ্চর্য সব দৃশ্য ওর চোখ টেনে রাখছিল।

'আমার সঙ্গে।'

'কুথা গো কুথা?'

'আমার বাসা। আমি গাড়িতে গান গাই।'

'গান গাও?'

'হ্যাঁ গো!'

লোকটি বুঝিয়ে দিয়েছিল সব। গান গেয়ে ও ভিক্ষে করে। যদি জটি সাধনকে কোলে নিয়ে ওর সাথে-সঙ্গে ঘোরে তাহলে ভিক্ষে পাওয়া সোজা হয় আরো।

'তুর ঘর কুথা?'

'তু মু বলিস না বাপু, যাবি তো চল।'

বেশ চলল এক বছর। জটি সঙ্গে থাকে, লোকটি গান গায়। পয়সা নিয়ে বাসায় গিয়ে সন্ধেবেলা জটি চাল কিনে ভাত রাঁধে, লোকটি দাওয়ায় শোয়, জটি ঘরে ঘুমোয় দোর আটকে।

'সাধন রে সাধন! বাপো রে বাপো!'

জটি বন্য আদরে ছেলেটাকে অস্থির করে দেয়। তা ছাড়া স্টেশনের কাছাকাছি নেপালী ও ভোটবুড়ীদের মালা-তাবিজ-শেকড়-পাখির পা-ব্যাঙের ছাল বেচতে দেখে ওরও শহুরে বুদ্ধি হয়েছে।

যখন কেউ জিগ্যেস করে, 'হ্যাঁ গো, তুমি সাধ্‌নী হয়েছ। তা গেঁটে বাতের টোটকা কিছু জান?'

জটি মুখ ভেংচে গালি দেয় না। পিতামহীর কাছে দেখা টোটকাটুটকি মনে আনতে চেষ্টা করে, মাঝে মাঝে ওষুধ দেয়।

বেশ চলছিল, বেশ চলে যেতে পারত, কিন্তু লোকটি একদিন দাওয়া ছেড়ে ঘরে এসে ঘুমোতে চাইল। কতদিন আর দাওয়ায় ঘুমোতে পারে ও? জটি কেমন করে জানবে দাওয়ায় ঘুমোবার কষ্ট কত?

জটি ত্রিশূলটা তুলে ধরল। বলল, 'জানু আমি কে? কুন সামাজের মিয়ে? জানু মোর বাপ কে, মা কে, গোঁতি-জ্ঞেয়াতি

আঁতের মনিষ কে ? তু আমায় কুপস্তাব করিস ? বাণ মেরে ফেলাব না !'

পরদিনই জটি চলে এল আশ্রয় ছেড়ে। অনেক ভেবে-চিন্তে ও ঠাকুরনী হল। ঠাকুরনী না হলে জটি ওর হাবা ছেলেকে বাঁচাতে পারত না। নিজেকে বাঁচাতে পারত না মানুষের নজর থেকে।

জটি বুঝেছিল অলৌকিকতা দিয়ে নিজের চারদিকে বর্ম না আঁটলে নিজেকেও বাঁচাতে পারবে না।

'সোন্দর মুখের মরণ।' জটি অস্ফুটে বলল।

॥ ৩ ॥

'সাধন! এখন তো তোমায় ছরাদ্দ করতে হবে বাপ।'

পাঁচজন এসে বলল।

'করব হে পাঁচজন। মা-কে আমি হাতী দিব, ঘোড়া দিব, ভুঁই দিব, সোনাদানা সব দিব। কিরে কেড়েছি।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সাধনের কথা পাগলের প্রলাপ। কিন্তু সাধন যে কিরে কেড়েছে তাও তো মিথ্যে নয়।

তাছাড়া জটি তো সামান্য মানুষ ছিল না। সে যে ঠাকুরনী, অলৌকিক, আধি-ভৌতিক জগতের দোরধরুনী।

'কি যে করলি সাধন! তুই যা বললি তা কত টাকার খেলা তা জানিস ?' বলরাম গভীর আন্তরিকতায় বলল।

'কিরে কাড়লাম যি।'

'এখন যা, ভিখ মাঙতে যা। দোরে দোরে ভিখ মেগে আয়।'

সাধন গলায় কাছা নিয়ে ভিক্ষে করতে বেরুল।

মা নেই, এখন আর কেউ সন্ধ্যে হলে তপ্ত ভাত রাঁধে না। শোলমাছ পুড়িয়ে, ছাল ছাড়িয়ে, আদার রস, লেবুর রস, লঙ্কা, লবণ, তেল দিয়ে মেখে বলে না 'বাপো, মোর কুলের কাছে বসে খাও।'

চোখে জল, গলায় কাছা, কোমরে ছেঁড়া কম্বল, সাধন ভিক্ষে করতে গেল।

কেউ দিতে চায় না। ঘুরে ঘুরে, পায়ের নড়া খসিয়ে সাধন একুশটি টাকা পেল। আর এক পালি চাল। এক পালি চাল দিয়ে অনাদি ডাক্তার জটির সঙ্গে জন্মের সম্পর্ক কাটাল।

অবশেষে বলরাম গেল কালীঘাট। সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে হতভাগ্য চেহারার এক পুরুতকে সাষ্টাঙ্গ পেন্নাম ঠুকে বলল, 'বড় বিপদ ঠাকুর। আমার নয়, আমার বন্ধুর। এমন একটা উপায় বাতলাও দেখি, সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে।'

'কেমনধারা? বলি বিপদটা কি?'

বিপদের বহর শুনে তো বামুন হেসে বাঁচে না। বলরাম বললে, 'আপনারা তো চিরটা কাল মধুর ঠাঁইয়ে গুড় দেন সোনার ঠাঁইয়ে পাঁচসিকা। দেখুন দেখি শাস্তরে কোন বিধান আছে কিনা।'

বামুন নাকে নস্যি টিপে বলল, 'মূল্য ধরে দেবে বলি তা পারবে তো?'

'কত মূল্য?'

'ধর গা একশো টাকা!'

'একশো টাকার যোগাড় যদি থাকবে, তবে তোমার মতো পাঁচ-সিকের বামুনের কাছে আসি?'

'আশী টাকা?'

বামুন লোভাতুর চোখে চাইল। এই সময়ে ইস্কুরুপ আঁটলে ক'টা টাকা আসে। কিন্তু কোন সাহসে বামুন দর কষবে? কালীঘাটের বামুন এখন উপোসী ডাবপোকা। পাঁচ টাকা হাতে পেলে সসাগরা ভারতভূমি দান করিয়ে দেবে। বলরাম একটু ভেবে নিল। যাওয়া-আসার খরচ, একটু নেশার খরচ, কত কাটবে, কত রাখবে। তারপর, কড়া গলায় বলল, 'দেখ ঠাকুর, তোমার হাতে আমি আঠারোটি টাকা দেব। কাজটি তুমি করিয়ে দেবে। নচেৎ আমি অন্য ঠেয়ে চললাম। পয়সা ফেললে পুরুতের অভাব? গুড় ছড়ালে পিঁপড়ে আসে না? 'হ্যাঁ' বলবে না 'না' বলবে ভেবে দেখ।

আমার হাতে টাইম কম। তোমার সঙ্গে কেজে-কোঁদল করতে আমার টাইম নেই।'

'নিয়ে এস তোমার বন্ধুকে। তা বাবা, মার্কণ্ডেয় কাপড়, পিতৃপুরুষের কাপড়, ঘি, ফুল, কাঠ, তিল, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য—সব তোমরা আনবে তো?'

'শুধু আমার চালাক মাথাই। তাই যদি আনব তবে আর তোমার ময়লা গামছার গন্ধ শুঁকতে আসি?'

বলরাম সাধনকে নিয়ে এল।

সব যোগাড় করে রেখেছিল পুরুত। পুরুতের বাড়ির বারান্দায় বসেছিল সব যোগাড় করে

'দক্ষিণ মুখে বস বাপ।'

পুরুত খনখনে গলায় বলল ও পাশে ছাঁটা চুল, লাল চোখ, ছাতার মতো ভুষোরঙের একটা লোক বসে আছে।

'উটি অগ্রদানী। দান নেবে।'

অগ্রদানী চোখ খুলে বললে, নাও দেখি মামা। হাজার টাকার ছরাদ তো? দশ মিনিটে সেরে দাও দেখি, একবার চাকদ যেতে হবে।'

'এই তো। নাও বাপু, আচমন কর।'

আচমন হল। শ্রাদ্ধ শুরু হল। একেকটা জিনিস সাধনের হাতে ছোঁয়ায় পুরুত আর বিদ্যুৎবেগে কেড়ে নেয়। আঠারোখানা এক টাকার নোট নিয়ে বলরাম বসে আছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল প্রেতক্রিয়া। একখানা চার আনার গামছার একেকটা সুতো ছিঁড়ে সাধন অজানা সব লোক ও লোকাতীতকে অজস্র বস্ত্র দান করল। তারপর পুরুত বলল, 'বল মা-কে কি দিতে চেয়েছিলে'

'এঁগ্যে, হাতী'

'নাও বাপ, পাঁচসিকা ফেল। ইটিও তোমার হাতীদানের পুণ্য হল, জানলে' বিকল্পে গলা ধরলে, এই ভাবে দান করা চলে, জানলে?'

বলরাম কাগজে লিখলে হাতী, তার পাশে লিখলে পাঁচসিকে।

সাধনের মুখ এখন বিহ্বল, বিমূঢ়। এ কি আশ্চর্য কথা! পাঁচসিকে মূল্য ধরে দিলে প্রতিশ্রুত গজদানের ফল হয়? এমন জানলে কি সাধন…

'পাঁচসিকা ধর, অশ্বদান হল।'

তখন অদ্ভুত এক প্রতিযোগিতা শুরু হল। সাধন বলে অশ্ব-ভূঁই-সোনা-ধান-বস্ত্র-তৈজস। পুরোহিত বলে পাঁচসিকা—পাঁচসিকা। বলরাম শুধু দেখে এই অপরিমিত দান-যজ্ঞ আঠারো টাকার মধ্যে থাকছে কিনা।

'বামুনকে গো-দানটা পাঁচ আনায় সেরে দেন ঠাকুরমশায়', বলরাম হেঁকে বলল।

প্যাঁকাটির ধোঁয়ায় চোখ কুঁচকে অগ্রদানী বলল, 'পাঁচ আনায় গাই-গরু হয়?'

'না হলে মামা-ভাগ্নাকে আঙুল চুষে মরতে হবে। দক্ষিণা দিতে হবে না?'

সাধনের পরনে মা-র একখানা ছেঁড়াখোঁড়া লাল চেলী। সাধনকে দেখতে এখন ক্ষ্যাপা মোষের মতো। প্যাঁকাটির আগুনে মাটির এতটুকু খুরিতে কয়েক দানা চাল সেদ্ধ করা হয়েছে, শ্রাদ্ধান্ন। ভাতের গন্ধ নাকে যাওয়াতে সাধন এখন ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে।

'লেঃ সাধন, আচমন করে বামুনকে পেন্নাম ঠুকে উঠে পড়।'

সাধন উঠে পড়ল। সাধনের চোখ মাটির দিকে। সাধনের গামছায় বাঁধা অনাদি ডাক্তারের দেওয়া এক পালি চাল। চালটা বামুন সবটা রাঁধল না কেন? চালটা তো মাকেই দেওয়া হল, তাহলে কয়েক দানা রাঁধবার অর্থ কি? সাধনের সন্দেহ হল। নাক দিয়ে ঘোঁত করে শব্দ করল ও।

'তুই ব্যাটা আমার হাতে আঠারো টাকা ধরিয়ে দিয়ে হরিশ্চন্দোর হয়েছিলিস?

বলরাম হাসতে গিয়ে থেমে গেল। সাধন উপুড় হয়ে পড়েছে,

চাল গামছায় বাধছে।

'কর কি, কর কি বাপ? ও চাল যে আমার পাওনা।'

চুবো শালা!'

সাধন বামুনকে গাল দিল। এই বামুন না ওকে দিয়ে জটি ঠাকুরনীকে অগাধ, অতুলন ঐশ্বর্য দান করিয়েছে? জটি ঠাকুরনী না এখন সোঁ সোঁ করে স্বর্গে যাচ্ছে? যে দেবতাকে ওর পূর্বপুরুষ মেরেছিল, তারই পায়ের কাছে? গোলকধামে? সাধন সব ভুলে গেল কেন?

'সাধন, কি করিস?'

'চাল লিয়ে যাই, ভাত আঁধব।'

'আরে ও ছরাদের চাল রে, তোর খেতে নাই?'

'চুবো বলরাম!'

মত্ত হাতীর মতো চেঁচিয়ে উঠল সাধন। বলল, ঘরে কানাকড়ি লাই যে ই চাল কিনে আঁধব। চাল আমি হাতছাড়া করি!'

'বেটা মূর্খ, গজমূর্খ!'

'চাল আমার! বলরাম! আমার পাছু আসিস না।'

পুরুত নিষ্ফল আক্রোশে বলল, 'শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে বেঁধে খাওয়া? এ শ্রাদ্ধ তোর নষ্ট হল বাটা।'

'কেন নষ্ট হবে, আমি হাতী দিই নাই? গরু দিই নাই? সোনা-রূপা, বস্ত্র দিই নাই? কোন শালা আমার মায়ের ছরাদ নষ্ট করে শুনি?'

বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত বাঁধবে।

ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত বাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, ততদিন ওর কাছে, সাঝ-সকালের মা বাধা থাকবে।

মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত বেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিয় না।

যমুনাবতীর মা

বড় আদরের নাম, কিন্তু মেয়েটা একেবারে ফালতু। ও না জন্মালেও চলত, পৃথিবীতে কোথাও এসে যেত না কারো। মেয়েটা অবশ্য তা জানে না। সবে দু-বছর বয়স ওর, পৃথিবীতে আসতে পেরেছে বলে ও মহা খুশি।

বাবা ওষুধের দোকানে বোতল ধোয়। মা শহরের দোকানে দোকানে ধূপকাঠি বেচে। সংসারে ওরাও ফালতু, এই মানব-সংসারে। কেননা ওর বাবা-মাকেও সমাজ বা সংসারের কোন প্রয়োজন আছে কি না বোঝা যায় না।

মেয়েটা ফালতু, বাবা-মার অবস্থা সবল অঙ্কের বন্ধনী চিহ্নের মতো। বন্ধনী চিহ্নগুলো ফেলতে ফেলতে না গেলে সরল অঙ্ক মেলে না।

যমুনাবতী রোগা, গায়ের রঙ মেটে, চুলগুলো পাতলা আর কোঁকড়া, কোমরে একটা পয়সা বাঁধা। ওর বাবা রোগা, ভীতু, হাতে একটা মাদুলি। মা আরো রোগা, আরো ভীতু, দু-হাতে দুটো মাদুলি।

দেখেই বোঝা যায় একসময় ওদের প্রয়োজন থাকলেও এখন, এই সব অঙ্ক মিলে যাবার সময়, ওরা ফালতু। এখন ওদের ফেলে দেওয়া দরকার।

ওরা আছে বলেই ফারাক্কার জল হুগলীতে আসছে না, সি. এম. ডি. এ. শহরটা সুন্দর করতে পারছে না, প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠছে না।

ওদের মতো কয়েক লক্ষ মানুষকে এখনি ফেলে দেওয়া দরকার, ত' এই দেশ, এই শহর সুন্দর হবে।

শত শত সিদ্ধান্ত আর লক্ষ লক্ষ প্রতিশ্রুতি রাখা যাবে। ওরা সার্থকতার পথে একটা অবাঞ্ছিত জঞ্জাল।

ওর বাপ-মা সে কথা জানে না। তাই ওরা মেয়েটাকে খুব ভালোবাসে। বোধহয় নিজেদেরও ভালোবাসে।

কে যেন মাকে বলেছে, বাঃ, বেশ নাম তো?

মা অপ্রতিভ হেসেছে।

বেশ কবিতা কবিতা নাম। কে রাখলে?

ওর মাসি রেখেচে।

ওর মা অবশ্য বলেনি ওই নামটা ওদের ঠিকে ঝি রাখালীর দেওয়া। রাখালী যখন মেয়ের মাকে দিদি বলে তখন তো ও মাসিই হল বাপু।

ওর জন্ম হওয়া ইস্তক রাখালী এ বাড়িতে। যমুনাবতীর মা ঠিক দুপুরে যখন বাড়ি ফেরে তখনি শোনে রাখালী বিস্বরে গাইছে—

যমুনাবতী সরস্বতী ভায়ে বোনে ভাগ্যবতী
বকুল গাছে সোঁদাল ফুলটি টাপুর-টুপুর করে॥

ওই রাখালীই একদিন বলেছিল, ওকে যমুনাবতী বল না গো?

তা যমুনাবতী নামই রইল।

যমুনাবতীর মা সকালে উঠে কোনমতে মেয়েটাকে একটু বালিতে দুধের গুঁড়োতে জ্বাল দিয়ে খাইয়ে দেয়। তারপর গত রাতের বাসি রুটি নিজে দুখানা খায়, মেয়ের বাপকে দুখানা দেয়। রাখালীর জন্যে চারখানা রুটি রাখতে হয়। মেয়ের মা বেরোয় সাতটায়। বাপ বেরোয় নটায়। রাখালী যত তাড়াতাড়ি পারে ঠিকে কাজ ক-টা সেরে এসে যমুনাবতীকে দেখে। এইটুকু করে বলে ওকে দুটো টাকা বেশি দিতে হয়।

তাই তো যমুনাবতীর মার লক্ষ্মীর ভাঁড়ে মোটে পয়সা জমে না।

জমে না বলেই ও আরেকটা কাজ করে।

রাখালীর সহযোগিতায়।

এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে রাখালী পুরনো কাগজ কিনে আনে। মেয়ের মা রাত জেগে বসে বসে ঠোঙা তৈরী করে। রাখালী সেগুলো লালার দোকানে দিয়ে আসে। পয়সার ভাগ রাখালীও নেয়।

পয়সা জমে জমে এবার আট টাকা হল। যমুনাবতীর মা ভাবল এবার পুতুলটা কিনবে।

সন্ধ্যেবেলা মেয়েকে নিয়ে মা বাজার করতে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা

বাজারের পেছনের নোংরা নোংরা রাস্তায় হাঁটলে কম দামে ফাটা ডিমটা, একদিকে পচ-ধরা আলু, কানা বেগুনটা মেনে।

আর কাচের বাইরে থেকে দোকান দেখা যায়। খেলনার দোকানটা এই বাজারেরই মোড়ে। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা পুতুলের দিকে আঙুল তুলে মেয়ে বলল, নেব।

পুতুলটার গাল লাল, ঠোঁট লাল, চুল সোনালি। উজ্জ্বল আলোর নিচে পুতুলটার চুল থেকে সোনা ঝলকাচ্ছে। দাম ন টাকা ষাট পয়সা। বাড়ি এসেই মা ভাঁড় ভেঙে দেখেছিল। তখন মোটে ছ টাকা জমেছিল।

সেই সময় যমুনাবতীর মা একটা দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখেছিল। ওর ভাঁড়ে টাকা জমেছে। ও ওই পুতুলটাই যমুনাবতীকে কিনে দিয়েছে। মেয়ের বাপ বলছে, সোংসারে ও টাকাটা একটা বল ভরসা। তুমি পুতুল কিনলে তা দিয়ে ?

পুঁতুল কিনলুম।

খুব তেজের সঙ্গে জবাব দিচ্ছে যমুনাবতীর মা। আরো কত কথা স্বপ্নেই মনে হচ্ছে ওর। এই দোরে দোরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করা, এই কষ্ট, এ কেন বাপু? তুমি একটা যোগ্য মানুষ নও, সে জন্যেই তো?

কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও ও সত্যিকথাগুলো লোকটাকে বলতে পারছে না।

লোকটা এমন ভীতু, রোগা, মার-খাওয়া।

জেগে ভেবেছে ওই পুতুলটাই কিনবে। ঠোঙা বেচা পয়সায় কিনবে। সেইজন্যেই ও যেতে আসতে মেয়েকে বলেছে, ওই দেক মা। আর ক দিন যাক, কিনে দোব।

কিন্তু একদিন মেয়েটার জ্বর হয়েছে, জ্বর সহজে ছাড়েনি। বড় দুর্বল মেয়েটা, বড় রোগা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে, কি খাওয়ান ?

বার্লিক দিই, দুটো ভাত, একটু রুটি।

বার্লি খেলে মেয়ে ভালো থাকে ? ভালো জিনিস খাওয়ান।

কি দোব ?

ডাক্তার নামটা বলেছে। শুনে যমুনাবতীর বাবা মুখ কালো করে

বাড়ি ফিরে গিয়েছে। মা বলেছে, কি দিতে বলল গো ?

সেই যে ? সিনেমায় দ্যাকনি ? এক কৌটো জিনিসে তেইশ রকম ভিটামিন থাকে ?

তার দাম কত গা ?

চোদ্দ টাকা।

চোদ্দ টাকা !

যমুনাবতীর মা একটুক্ষণ কি ভেবেছে। তারপর লক্ষ্মীর ভাঁড়টা ভেঙে পয়সাগুলো এনে স্বামীর সামনে রেখেছে। বলেছে, আটটা টাকা আছে। বাকি ছ-টা টাকা যোগাড় করতে পারবে না ?

ওর বাবা পয়সাগুলো নিয়েছে। কিন্তু ওর চোখের কোলে জল চিকচিক করেছে।

তারপর মেয়ের জ্বর ছাড়লে যমুনাবতীর মা একদিন দেখেছে দোকানের কাচের ভেতর পুতুলটা নেই। দেখে ও বড় স্বস্তি পেয়েছে। এখনো পুতুলটা থাকলে ওর মনে কষ্ট হত। যতদিন পুতুলটা কিনবে বলে জানত, ততদিন ও মনে মনে পুতুলটাকে আদর করত, কোলে নিত। পুতুলটা কখন যেন ওর মেয়ে হয়ে যেত। সুন্দর, ফর্সা, সোনালি চুল একটা যমুনাবতী। সেই সঙ্গে স্বপ্নে ও নিজেও সুন্দর হয়ে যেত। যমুনাবতীর বাপও। সুখী, সুন্দর, সম্ভ্রান্ত। মা, বাবা ত্বজন সুন্দর না হলে কি মেয়ে সুন্দর হয় ?

আবার ও পয়সা জমাতে লাগল। এবার শুধু ঠোঙাবেচা পয়সা নয়। এবার রাখালী ওকে কাঁচা সুপুরি এনে দিল। বলল, 'কুচোতে সুবিদে। তুমি সরু করে কুচোও দি' নি ? আমি যেয়ে দোকানে দিয়ে আসব।'

যমুনাবতীর মা এখন সুপুরিও কুচোয়, ঠোঙাও তৈরী করে। এখন ও নিজেই দোকানে একটা লাল জামা দেখে রেখেছে। জামাটার দাম বারো টাকা। একটা কিছু কিনব বলে রোখ করলে তবে যমুনাবতীর মা কুপি জ্বেলে বসে বসে ঠোঙা তৈরী করতে পারে। সুপুরি কুচোতে পারে। নইলে শরীর আর চলে না। পিঠ ভেঙে পড়ে। বুক কনকন করে। চোখের সামনে রঙীন রঙীন ধোঁয়া দেখে।

এখন ওর চেহারা আরো রোগা। আরো জীর্ণ আর ক্লান্ত দেখায়। ফুটপাথে সকল জাতের ভিড়ের ভেতর দিয়ে ও যখন হেঁটে যায় তখন ওকে দেখেই বোঝা যায় ওর মতো কত লক্ষ মানুষ এখনো আছে বলেই খাচ্ছে দেশ স্বয়ম্ভর হতে পারছে না, ক্লাস এইট অবধি শিক্ষা অবৈতনিক হচ্ছে না, রেশনে চাল বাড়ছে না।

এখন যমুনাবতীর মা জেগে জেগে একটা দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখে। এই শহরে ওরা ফালতু, অবাঞ্ছিত নয়। শহরের ভিড়ে সবাই যখন ট্যাক্সি চড়ে, তখন ওরা তিনজন পা টেনে টেনে হাঁটে না। ওরাও ট্যাক্সি চড়ে। ওরাও আলোর নিচ দিয়ে হাঁটে। এই স্বপ্নটায় যমুনাবতীর পরনে লাল জামাটা থাকে। ওর মা-বাবার গায়ে কি সুন্দর জামাকাপড় ঝলমল করে। সব দোকানে কেনা। ফুটপাথের আধা অন্ধকার থেকে দেড় টাকা—সাড়ে তিন টাকা—আড়াই টাকার নিলামে কেনা জামা কাপড় নয়।

ভাঁড়ের পয়সা জমে জমে এবার ন টাকা হয়।

কিন্তু এবার যমুনাবতীর অসুখটা আরো গুরুতর হয়। আবার ওরা ডাক্তারের কাছে যায়।

এখন জানা যায় ওর ফুসফুসে জোর নেই, ওর লিভারটা খারাপ। ওর হাড়ের ভেতর অব্দি ঠিক মতো মজ্জা তৈরি হচ্ছে না।

বাবা বলে, একটা টনিক খাওয়াব?

খাওয়াতে পারেন।

ডাক্তার খসখস করে টনিকের নাম লিখে দেয়। এবার ভাঁড়টা ভাঙবার কথা ওর বাবারই আগে মনে হয়। টনিকটা কেনা হয় এগারো টাকা দিয়ে। যমুনাবতীর মার অনেক কথাই মনে হয়। ও একটা কথাও বলে না। শুধু যে ওর স্বপ্নেই লোকটা ভীতু আর রোগা আর নিরীহ তা তো নয়। সত্যিই যে লোকটা ভীতু আর রোগা আর নিরীহ।

এখন যমুনাবতীর মারও নিজেদের তিনজনকে একটু একটু ফালতু বলে মনে হয়।

ও শুধু বলে, হ্যাঁ গো? মেয়ে ভালো হবে তো?

দেখা যাক।

তুমি অমন করে বলচ কেন? ডাক্তার কি বললে?

বললে····।

কি?

ওর কি কি দরকার তা জানো? ওর মতো বাচ্চাদের সকাল থেকে রাত অব্দি দুধ, ডিম, মাখন, মাছ, দই, আপেল, কলা, মাংস, সব্জি, আরো কত কি খাওয়া উচিত। তা না খেলে····'

কি হয়?

শরীরের পুষ্টি হয় না। ওর হয়নি। কোলে নিলে বোঝো না ওর ওজন কত কম? ওর চোখ দেখে বোঝো না ও কত নির্জীব?

এখন খাওয়ালে ও সেরে ওঠে না?

কোত্থেকে খাওয়াবে? নাও, পাগলামো করো কেন?

রাখালী মুখ অন্ধকার করে বলে, অমন নানা নিধি খাওয়ালে যদি শরীল সারত তাইলে আর বাবুদের ছেলেগুলো অমন হটক্কারে অসুখে পড়ত না। নাও! এবলা কাজটা ঝপ করে সেরে নাও দিকিনি। আমি অমনি যেয়ে গঙ্গায় এট্টা ডুব দে' মায়ের খাঁড়া ধোয়া জল এনে দিই। তাই খাইয়ে দাও। মা বাপ রোগা রোগা, মেয়ে কি থুমথুমে মোটা হবে?

রাখালীই কিন্তু কালীঘাট থেকে অমনি একটা ছোট্ট টক আপেল নিয়ে আসে। দেখে মেয়েটা কি হাসে! ও কি মনে করে মাসি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে?

রাখালী ওকে খেলা দেয় আর স্বরহীন, কর্কশ গলায় গান গায়—

যমুনাবতী সরস্বতী ভায়ে বোনে ভাগ্যবতী ॥

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ওই গানটা শুনলেই যমুনাবতীর মার মনে হয় ওর বিশ্বসংসার ঠিক আছে।

এখন যমুনাবতীর বাবা, ওর মা, ওর জন্যে একটা ফল, একটা সন্দেশ, মাঝে-মধ্যে আনে। মেয়েটা যত দেখে তত খিলখিলিয়ে হাসে। ও কি ভাবে মা বাবা ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে?

এখন ওর মা আর একটা পুতুল, একটা জামার কথা ভাবে না।

এখন ও বাজারসুদ্ধ ফলপাকুড়ের কথা ভাবে। এখন ও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে না, জেগেও না। এখন ও বলে, ভালো সামিগ্রী তুমিও খাওনি, ও পেটে রইতে আমিও খাইনি। তাইতে সব শরীরটা এমন হয়ে গেল ?

এখন যেন ওর সব কেড়েকুড়ে খেতে আর খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কেন ওর হাতে টাকা আসে না ? টাকা থাকে না ? যদি নাই থাকে তাহলে বাজারে কেন এত সোনালি লাল ফল, উজ্জ্বল মরকত সবুজ তরকারি, রুপোলি মাছ, তরতাজা মাংস ? এত চাল, এত পথ্য, এত বেবিফুড, একটা ক্যাডবেরি চকোলেটে এক গেলাস দুধের গুণ ? আমুল মাখন নিয়ে শিশুদের কাড়াকাড়ির ছবি ?

দেয়ালে, লাইটপোস্টে এত ছবি, এত কথা ? সুখী পশ্চিমবঙ্গ গড়ে দেব। যুগসূর্য তুমি ! সমাজবাদের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া ? গরীবি হটাবার হুমকি ?

ও বুঝতে পারে না ও আছে বলে, ওর মত কয়েক লক্ষ মানুষ আজো ক্ষেতে, খামারে, পথে ফুটপাথে, রেলের পাশে আছে বলে এইসব কাজগুলো করা যাচ্ছে না।

কিছুতে সুন্দর হচ্ছে না এই নগরী। সার্থক হচ্ছে না প্রত্যহের সিদ্ধান্ত।

ও বুঝতে পারে না ওর চোখের চাউনি কি রকম বদলে যাচ্ছে আজকাল।

আজকাল ওর চোখে রাগ থাকে, হিংসে থাকে, প্রশ্ন থাকে। আর তাই দেখেই ওর মালিক ওকে প্রশ্ন করে, কি হইল আপনার ?

মনটা ভালো নেই, মেয়েটার অসুক।

কি অইছে ?

জানি না। নানা নিধি জিনস খেতে বলচে।

অ !

মালিক কিছুক্ষণ কান চুলকোয়। তারপর বলে, কি খাইতে বলে ?

নানা নিধি হাতে পয়সা নেইকো, তাই····

ধূপ বিক্রির কমিশন পান না ?

পাই। তাতে চলে না।

ওর গলাটা রুক্ষ। মনিব অবাক হয়। তবে বহুদিন অবধি যমুনাবতীর মার গলাটা মিয়োনো ছিল, চোখ ছিল কাতর, করুণ, ভিখিরির চোখ। সেই চোখ দুটো মনে করেই মনিব দশটা টাকা দেয়। বলে, আমিও আপনাদের মতই। ছা পুষা।

নোটটা যমুনাবতীর মা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে রেখে দেয়। এখন ও ঠিক করে কিছুতে টাকাটা ভাঙবে না। ঠোঙা বানিয়ে, সুপুরি কুচিয়ে ও অনেক পয়সা করে ফেলবে। তারপর সেই পয়সা দিয়ে ওরা তিনজন দুধ, ডিম, মাছ রোজ খাবে। বারুইপুরের বেগুন, তারকেশ্বরের আলু, চন্দননগরের কলা, ক্যানিঙের মাছ, সব খাবে। ওদের শরীর ফিরে যাবে।

তখন ওদের হেঁটে যেতে দেখলেই বোঝা যাবে ওরা ফালতু নয়। ওদের ফেলে দিয়ে ভোটের আগের প্রতিশ্রুতি, ভোটের পরের সিদ্ধান্ত পূর্ণ করবার দরকার নেই। ওরা থাকলেও সব করতে পার তোমরা। এই শহরকে সি. এম. ডি. এ. সুন্দর করে তুলতে পারে। মাটির নিচে রেললাইন বসতে বাধা থাকে না কিছু। সবাই চাকরি পেয়ে যেতে পারে, চাষীরা জমি। পুজোর আগে গ্রাম বাংলা ছেড়ে শহরের ফুটপাথে জঞ্জালের মত জমে থাকতে হয় না কারুকে।

যমুনাবতীরা থাকলেও এর সব কিছু হতে পারে।

এই সাত-পাঁচ ভেবেই ওর মা টাকাটা রেখে দেয়।

কিন্তু একদিন ওর বিশ্বসংসার তছনছ হয়ে যায়।

যেদিন রাখালী আর পরিচিত ছড়াটা গায় না, যেদিন এই প্রথম ওরা ডাক্তারের কাছে যায় না, ওদের বাড়িতেই ডাক্তার আসে। যেদিন পরিচয় অপরিচয় ভুলে ওদের উঠোনেই অন্য ঘরের ভাড়াটেরা এসে দাঁড়ায়। যেদিন রাখালীর আর্ত, দীর্ঘ, অসভ্য কান্নার শব্দে আশপাশের ভদ্র ভদ্র বাড়ির সভ্য-সভ্য সকালটা নষ্ট হয়ে যায়।

যেদিন ওরা দুজন ঝুঁকে পড়ে শুধু বলে, অ যমুনাবতী, একবারটি চাও মা ! একবারটি হাসো ?

কিন্তু ক দিনের ডেঙ্গুজ্বরের তাপে রাঙা মুখে যমুনাবতী শুয়েই থাকে, চোখ বুজেই থাকে। যেদিন ওষুধ ওষুধ গন্ধমাখা ঠোঁট দুটো ও একবার ফাঁক করে না, হাসে না।

তারপর অনেক, অনেকক্ষণ বাদে ওরা হেঁটে হেঁটে ঘাটে যায়। যমুনাবতী আজ বাবার কোলে থাকে। মা, রাখালী, রাখালীর বোনপো পাশে পাশে হাঁটে।

রাখালীর বোনপো বলে, কাঠে অ্যানেক খরচ গো মাসি! তার চে····

যমুনাবতী রাঙা রাঙা চোখে অবাক হয়ে ঝকঝকে রুপোলি দরজাটা দেখে। দেখে দেখে ওর চোখে পলক পড়ে না। কত কত অ্যালুমিনিআম ওতে আছে গো? ও বলে, কত দিতে হয় কানাই?

দশ টাকা। সে ধরো ওতে আর····

এখন যমুনাবতীর মা ওর বাবাকে বলে, যেয়ে নিয়ে এসো ভাঁড় ভেঙে। দশটা টাকাই রয়েচে।

যমুনাবতীর বাবা চলে যায়। যমুনাবতীর মা বসে থাকে। এখন ওর চোখ আগেকার মতো মিয়োনো ভীতু-ভীতু নয়। এখন ওর চোখে প্রশ্ন নেই, রাগ নেই, হিংসে নেই। ওর চোখ কান্নায় ফোলা, লাল জবা, বিস্মিত, অস্বস্তিকর ভয়-জাগানো। এখন ওর চোখে বিস্ময়, অনন্ত অপার বিস্ময়। এখনও বুঝতে পেরেছে ওকে, ওর মতো মানুষগুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহরের, এ দেশের মুক্তি নেই। সকলের, সব প্রতিশ্রুতির পথে ওরা বাধা, জঞ্জাল।

ওর চোখের বিস্ময় দেখে বোঝা যায় ও ভাবছে তাই যদি হবে তবে কেন এখনো ওকে টিকিয়ে রাখা? দেওয়ালের শতোত্তর সহস্র নামের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। ফেলে দেওয়া তা যায়! ওই তো প্রমাণ রয়েছে।

এখন ওকে আর ফালতু মনে হয় না, দরকারীও মনে হয় না।

অসম্ভব অচেনা অচেনা, ভয়াবহ দেখায় ওকে, কেন না এ মহাতীর্থে, এই সকালে, এখনি, ও নিজের বিষয়ে, নিজের মতো লোকদের বিষয় সব কথা জেনে গেল।

এখন মনে হয় ওকে, ওর মতো মানুষগুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহর, এ জীবন, এ দেশ, কিছুই সুন্দর হবে না। ওরা আছে বলেই সকলের কাজের পথে এত বাধা। মনে হয় ওর মতো মানুষগুলোর জন্যে এখনি কোন, জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এত বৈজ্ঞানিক, এত পরিকল্পনা. এত গ্যাস, এত চেম্বার, ব্যবস্থা কি হয় না ?

মাদার ইণ্ডিয়া

মাদার ইণ্ডিয়ার বয়স আশি, রং তামাটে কালো, চুল কোঁকড়া, ছোট ছোট, সাদা। মুখের প্রত্যেকটি রেখা ফাটা ফাটা, যেন গঙ্গার জল, সরে যেতে কাদার ওপর দিয়ে লক্ষ লক্ষ কেঁচো চলে গেছে। ঘোলাটে চোখ দুটি মৃত নক্ষত্রের মতো। যেন দুটি নক্ষত্র কবে মরে গেছে, পৃথিবী সে খবর রাখে না বলে মনে করে তারা দ্যুতিমান। শতচ্ছিন্ন একটি ডুংরি শরীরে দুফেণ্ডা দিয়ে পিঠের দিকে কাঁধের কাছে গেরো দেওয়া।

ওর নাম মাদার ইণ্ডিয়া। সেই কত বছর আগে যখন কি একটা সিনেমার ছবি দেওয়ালে দেখা যেত, যখন ছেলেদের দুঃখে ও ফুটপাথে বসে রাত নেই দিন নেই কাঁদত আর কাঁদত, তখন সিধু বলেছিল, তুই মাসি মাদার ইণ্ডিয়া। সিধু ওকে এই ফুটপাথে জায়গা দিয়েছিল। কলকাতার ফুটপাথে বাঁধা জায়গা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। বছর বছর যারা দক্ষিণ থেকে আসে, তাদের তেমন জায়গা মেলে না।

তারা আজ এখানে, কাল ওখানে ভেসে ভেসে বেড়ায়। ও জায়গা পেয়েছিল সিধুর কল্যাণে। সিধু বলেছিল, আমি ওকে মাসি বলেছি, ও থাকবে। সিধু নেই, সিধু মরে গেছে। যাবার আগে ওকে নিজের প্যাকিং বাক্সের কাঠ আর চটের ছাউনিটা দিয়ে গেছে।

সিধু ওর পেটের ছেলে নয়। কিন্তু পেটের ছেলেরা ওকে যা যা দেয়নি, পর হয়ে সিধু তা দিয়ে গেছে।

ঘরটুকু, জায়গাটুকু, নামটুকু।

ভাতের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল সিধু। ও নিজে রাখতে পারেনি। সিধুর মতো চার-পাঁচজন ভিখিরি কাঙালীর জন্যে ও রান্না করত। বেলায় বাজার ঝেঁটিয়ে কপির পাতা, পাঁঠার মলনাড়ি নিয়ে আসত ও। তিনখানা ইট পেতে উনোন জ্বেলে তাই দিয়ে অমৃত রেঁধে দিত কাঙালীদের। সামনের বাড়ির গিন্নি ওর কাছ থেকে ভিক্ষের চাল কিনে নিতেন। আশ্রিত পরিজনদের সেই চাল রেঁধে দিতেন।

তিনি জানতেন না, তাঁর ঝি ওকে নুন লঙ্কা হলুদ দিত। ঝির কোমরব্যাথা ও ঝেড়ে দিত মাঝে মধ্যে।

তখন পেটভাতটা উঠে আসত। এখন বহুদিন ওঠে না। নতুন দিনের নতুন নতুন কাঙালী এখন ওর প্রতিবেশী। ওদের ভাত রাঁধে ফুল্লরা।

এখন ও গুলঘসি দেয়। কাঠগোলা থেকে কাঠের ঘেঁষ আনতে কোমর পিঠ ব্যথায় ভেঙে পড়ে। মাটি দিয়ে ঘেঁষ মেখে ও বড় বড় গুল দেয়। এখনো এ পাড়ায় ঘরে ঘরে কয়লার রান্না। ঘুঁটের চেয়ে কাঠের গুলে ধোঁয়া কম হয়।

গুল শুকোতে দিয়ে ও প্যাকিং বাক্সের সিংহাসনে বসে পাহারা দেয়। দেহটা খিদের আঁচে জ্বলে গেছে। ঘন দগ্ধ বনস্পতি। সেই সুদূর চিরতরে হারিয়ে যাওয়া শৈশবে ও ওর বাউলি বাবার সঙ্গে বনবিবির পূজো দিতে যেত। তিনখানা মাঠ, দুটো খাল পেরিয়ে। বাজে পোড়া একটা অশ্বত্থ গাছ ও বছর বছর দেখত। বছর বছর বর্ষার জল পেলে পোড়া গাছের গোড়া থেকে কচি পাতা মুখে নিয়ে নতুন কচি ডাল বেরোত। তাতের দিনে সে পাতা শুকিয়ে যেত।

বাবা বলত, বট-অশ্বত্থ দেবাংশী গাছ। তাই মরেও মরে না, এ এক আশ্বাজ্জ কথা।

ওর শরীর সেই গাছের মতো জ্বলে গেছে। খিদের আগুনে। কিন্তু স্মৃতির জল পড়লে আজও বিগত, চিরতরে ফেলে আসা জীবনের কত কথার অঙ্কুর মাথা তোলে।

স্মৃতিতে ডুবে গেলে ওর মুখের রেখাগুলি ডুবে যায়, শান্ত হয়। ও জানেও না ওকে দেখলে তখন জরতী মনসা-বুড়ির কথা মনে হয়। যেন খিদে-তেষ্টা-বার্ধক্য-দারিদ্র্যে জরজর কোনো শুধু দুটি পেটের ভাত, এক আঁজলা মাথার তেল, লজ্জাহর একখানা কানির জন্যে পুজোপ্রার্থী হয়ে বসে আছে। কেউ যাকে বোঝে না, সবাই যাকে দূর হ চেংমুড়ি কানি, অলপাইয়া, অশুভটা বলে তাড়িয়ে দেয়। তাড়িয়ে দেয়—শুধু তাড়িয়ে দেয় বলে যার দুটি ভাতের কাঙালপনা ঘোচে না।

এখন ওর চেহারা পাথর দেখায়। ঘোলাটে চোখ দুটিতে শুকনো কান্না ঠেলে উঠে আসে। তিন তিনটে ছেলে ছিল তার, সবাই ওর কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কারা—কোন শ্রেষ্ঠতর শক্তি তাদের টেনে নিয়ে গেল শশী ধাড়া আর তার বউ পাতুলের অন্য লোকদের সঙ্গে মান্নাবাবুদের জমি হাসিল করে আবাদী করতে আবাদে গিয়েছিল। কচিকাঁচা নে সেথা যায় কেউ? তা ছাড়া ওতে অধর্ম।

কেন? অধর্ম কেন?

জাননি?

জামাইয়ের মুখের দিকে করমচার মতো লাল, শিয়ড়চাঁদা সাপের মতো ক্রুদ্ধ দুটি চোখ তুলে ধরে গগন বাউলি বলেছিল এগারো বছর ধরে যারা অন্যত্তর ওদের জমি চাষ করে, তাদের উচ্ছেদ করে নাই গোলবদন মান্না? বারো বছরে দখল জন্ম তাই এগারো বছরে কোঁকে লাথি। তারা এ জমি হাসিলে অগগে অধিকারী নয়? তারা তোমাদের ছেড়ে দিবে?

শশী ধাড়া মাথা নেড়ে অসহায় হেসে চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের জেদ ছাড়েনি। বলেছিল, মোদের উচ্ছেদ করতে গারবে গো। মোদের পিছনে বাবুরা আছে।

কিন্তু শশীর কথা ফলেনি। অনাবাদী বন্যভূমি বড় হিংস্র, যুধ্যমান, আক্রোশক। সে ভূমি যারা একবার হাসিল করে চাষ করেছে, তারপর উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের ক্রোধ অতি ভয়ংকর। তাদের সঙ্গে আর অরণ্যের, বাদার, নোনাগাঙের সঙ্গে শশীদের দীর্ঘদিন লড়তে হয়। তারপর দীর্ঘায়িত এক রক্তোৎসব সাঙ্গ হলে বাতাসে আমনের গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল। উচ্ছিন্ন মানুষদের মতোই উচ্ছিন্ন অরণ্যও হার মেনে পিছু হঠে সরে গিয়েছিল।

সে সব কথা ওর মনে পড়ে। ওর মনের উপর দিয়ে কে যেন শশী ধাড়া আর শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনকথার পট খুলে ধরে আর টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। শশীর ঘরসংসার হয়েছিল, তিনটে কলবলে ছেলে। দেখে দেখে বাউলি বলেছিল, এগারো বছরে তুলে দিবে বাপ। তুমি যেয়ে মোর ঘরে বস।

সত্যি সত্যি শশীদের যখন উচ্ছেদ করে দেয়, তখন গগন বাউলি বেঁচে নেই।

অনাবাদী বন্যভূমি হাসিল করে তুলে, এগারো বছরে উচ্ছেদ হয়ে গেলে চিরকাল শশীরা লড়ে। এবারও লড়েছিল। হেঁসো বনাম বন্দুকের লড়াইয়ে চিরকাল শশীরা মরে। এবারও মরেছিল। শশীর বউও মরিয়া হয়ে হাতে হেঁসো নিয়ে বেরিয়েছিল। তারপর ও হাজতে যায়। হাজত থেকে বেরিয়ে যখন শাশুড়ির কাছে যায়, শাশুড়ি বলেছিল, আমার ছেলে নি। তোর বড়টাও বাপের সঙ্গে গেল, হেথা আইতে পাত্তিস। কিন্তুক তুই আইলে যন্তন্না বেস্তর। পুলুস পাছু ছাড়বে না।

তখনি শশী ধাড়ার বউ বুঝতে পারে ওকে কোটালে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ হল মাতলায় ষাঁড়াষাঁড়ির কোটাল। কোটালের টানে নদী সমুদ্রে হারায়। এ কোটাল ওকে ভাসিয়ে বৃহৎ পৃথিবীতে নিয়ে এসে ফেলে দিয়ে গেল। শশীদের লড়াইটা থেমেও থামেনি। তাই পুলিস হন্যে হয়ে পাপীতাপীদের খুঁজে ফিরছিল। তাই হারান সামন্ত বলেছিল, একো জায়গা না কি তুনিয়ায়? আর জায়গা নি? চল্ আতের আঁধারে পালাই।

ওরা অনেকে এসেছিল। কলকাতার বুড়ি ছুঁয়ে কত কত জায়গায় যে নিয়ে ওদের গিয়েছিল গ্রাম্য বৃদ্ধ হারাণ। কত জায়গায় শশী ধাড়ার বউ ডাঙা জমি হাসিল করেছিল, কত লক্ষ্মীমন্তের ধানখেতে ওর হাতে রোয়া ধানে আমন ফলেছিল, কতদিন পিঠ নিচু করে, শুধু পিঠ নিচু করে ভীষণ আক্রোশে ও শুধু ধান রুইত। কত আষাঢ়ের বিপত্তারিণী ব্রতের দিনে, কত শ্রাবণের লোটনষষ্ঠী ব্রতের দিনে, তুরন্ত ক্রোধে, ঝরোঝরো জলে ধানচারা নেড়ে দিত শশী ধাড়ার বউ। পউষে পউষলক্ষ্মী ব্রতের হিমেল বাতাসে সোনালী ধান কেটে তুলে দিত পরের উঠোনে, সব এখন গ্রামীণ পটুয়ার হাতে আঁকা অবহেলিত, অবমানিত পটের ছবির মত অস্পষ্ট চলমান ছবির মিছিল হয়ে গেছে।

কত কতবার এগারো বছর না হতেই নতুন খেতমজুর আসতে ওরা উদ্বিগ্ন হয়েছে তাও মনে পড়ে না। তবে শশী ধাড়ার বউয়ের বিগত

জীবনের, বার বার উচ্ছিন্ন হবার কথা মনে করতে গেলে মনে পড়ে সুদূর ও প্রাচীন শৈশবের কথা। বাউলি বাপ বনবিবি পুজো করতে যাচ্ছে। সঙ্গে মা-মরা একটা কালো মেয়ে। নৌকো চলেছে খাল বেয়ে, জলে গরান গাছের সবুজ ছায়া। মেয়েটা দেখছে জলফড়িং আশ্রয় খুঁজে যে পাতাটায় বসে, যে ভাসমান চলমান পাতায়, সেটাই পিছলে ভেসে সরে যাচ্ছে। মনে পড়ে জলের সোঁদা এঁশো গন্ধ, বাপরে গায়ের তেলতামাকের গন্ধ।

আর মনে পড়ে ভাতের গন্ধ। ভাতের গন্ধের লোভ বড় অমানুষ বড় লক্ষ্মীছাড়া করে ফেলেছিল শশী ধাড়া সেই যে বলেছিল, আমি যাই। তুই হেঁসো ছাড়িস না বউ, ওদের অসাধ্য কিছু নি!

শশী সেই সে হেঁসোটা ওর হাতে দিয়ে বড় ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শশীর বউ হেঁসোটা আর ছাড়েনি। হাজতে যাবার আগে শাশুড়ির গোলপাতার চালে গুঁজে রেখে যায়। বেরিয়ে এসেই নিয়েছিল।

সেই হেঁসোটা পেটকাপড়ে, সঙ্গে দুটো উঠতি ছেলে নিয়ে শেষ বার উচ্ছেদ হওয়ার পর শশী ধাড়ার বউ মেদিনীপুর থেকে কলকাতা এসেছিল। মিছিল করবি চল্ বলে ওদের এনেছিল বাবুরা। তখন হারাণ বলেছিল ই খুব ভাল বাবু। অকম অকম ফেলাগ নে অকম অকম মিছিল করবি। উটি খেতে পাবি, পয়সা পাবি।

মিছিল কি বারাবুরে হয়?

শশী ধাড়ার বউ ধমকে উঠেছিল। মিছিল রোজ হয়নি, রুটি রোজ আসেনি, কিন্তু ও ছেলেদের কথামত দেশে ফিরতেও রাজী হয়নি। বলেছিল, যে থুথু ফেলিছি, তা তুলে খাব? সেথা তোদের আছে কি?

হেথা কে আছে, কি আছে?

আর ভেসে বেড়াতে পারিনি রে! হেথা থাকব।

কি খাবি মা?

য্যামন জুটবে।

ছেলেরা আর কিছু বলেনি। মার ওপর ওদের অসীম নির্ভর। শশী ধাড়ার বউ ছেলেদের মানুষ করেছিল ক্ষুধিত ও হিংস্র ভালবাসায়।

ওর নাড়ীর বন্ধনে একদা যেমন, ওর ভালবাসার পাকেও এখন ওরা তেমনিই বন্দী ছিল। এত বড় ছেলেদের মার ওপর এত নির্ভরতা, এমন ভাসমান জীবনে কমই থাকে। শশীর বউ বলেছিল, তা বাদে—

কি, মা ?

মরলে তোরা মোকে গঙ্গা দিবি। হেথা গঙ্গার দেশ।

তখনো ওরা এই ফুটপাথেরই এক কোণে থাকত। সিধু ওদের থাকতে বলেনি, নিজের ছাউনিতে আশ্রয়ও দেয়নি, আবার তাড়িয়েও দেয়নি। অন্য কাঙালীদের বলেছিল, দোখনো। এরা বারাবুরে নয়। টেমপোরারি। চলে যাবে।

সেখান থেকে বেহালা বাজার। শশীর বউ দোকানে মশলা ঝাড়ত। ছেলেরা কাঠ-গোলায় কাঠ চেলা করত। সেখান থেকেই একদিন মাইক দিয়ে ডেকে কারা যেন ছেলেদের নিয়ে গিয়েছিল। মেজ ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে ওর হাতে ছ-টা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, খাদ্য নে খুব গণ্ডগোল হতেছে মা! তাই পালে পালে অসচ্ছল মানুষ আসতেছে কোতা কোতা হতে। আমরাও যেতেছি।

শশীর বউ বলেছিল, হাংনামা জবর পাকলে পাইলে এস, অ বাপ হাংনামায় থেকনি।

তাই থাকি ?

ছেলেরা ওর কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবার সেই এক পটের ছবি। মা দাঁড়িয়ে আছে বাস-রাস্তায়, ছেলেরা হেসে ওর দিকে মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছে। পথে কাতারে কাতারে লোক।

তারপর সন্ধ্যে হতে না হতে সব যেন চুপ, বোবায় ধরা, যেন শশী ধাড়ারা মরে যাবার পর পুলিসের চোখ এড়াতে বলে লুকিয়ে থাকার সময়কার মতো নিঃশব্দ, যন্ত্রণাময়, জন্মবোবা মেয়ের গর্ভযন্ত্রণার মতো প্রাণান্তিক, মূক।

রাতে কারা বিশৃঙ্খলে ফিরতে লাগল ছুটে ছুটে। কারা খবর আনল কোথায় গুলি চলেছে, চাষীরা পথ চিনত না বলে কোথা কোথা ছুটে গেছে, কোথায় গাড়ি করে লাশ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে চতুর্দিকে ঘেরাও। নেড়ী কুকুর ছাড়া আর কোন জীবন্ত প্রাণী বুটপরা

পায়ের বেড়া পেরিয়ে ঢুকতে পারছে না। খুব গণ্ডগোল।

সকলের মতো শশীর বউ প্রথমে ভয় পায়নি। ও ছেলেদের নিয়ে নিজেও হাঙ্গামায় পড়েছে। উদ্যত লাঠি বা ধাবমান বুট এড়িয়ে পালাতে হয়েছে ওকেও রাঢ়ে-গৌড়ে। ওর ছেলেরা পালাতে জানত।

কিন্তু ছেলেরা আর ফেরেনি। ও নিজে কি হেঁটে যায়নি সেই সব জায়গায়? কিন্তু সেখানে তো শুধু আকাশ ফুটো করে লাল লাল দালান-বাড়ির পাঁচিল। নিরাপদ ধাড়া, লখিন্দর ধাড়ার খবর সেখানে কেউ দিতে পারেনি।

বাবুরা, তোমরা সকলে ফিরলে, মোর নিরাপদ, মোর লখিন্দ কোথা অইল?

ওর এ কথার জবাবও কেউ দিতে পারেনি। তখন শশী ধাড়ার বউয়ের মতো অন্যদের নিয়ে বাবুরা আরেক মিছিল করতে চেয়েছে। কিন্তু সে মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই শশী ধাড়ার বউ সরে গিয়েছিল। দলের সবাই যে পথে চলেছে, সে পথ ছেড়ে অ নিরাপদো! অ লখিন্দো! কমনে গেলি হারামজাদারা? এই বলে, বুক চাপড়ে ও পথে পথে টাউর খেতে শুরু করে।

পটের ছবিতে সব পলায়মান, ছুটন্ত, মারীচী ক্ষিপ্রতায় সচল। শশী ধাড়ার বউ টাউর খেয়ে, ক্লান্ত-ডানা গুবরে পোকা যেমন চড়া আলোয় বিহ্বল হয়ে কান্নিক মেরে ঘোরে তেমনি করে ঘোরে এ শহরের পথে ঘাটে। কখনো বিয়েবাড়ির বাইরে ভোজের এঁটো খেতে তৎপর, কখনো বাতাসকে প্রশ্ন, ছেলে দুটো গেল কোথা?

বুঝি মরে গেছে একথা যে বলেছ, তাকেই শশী ধাড়ার বউ বলেছে, হেঁসো দে ফেড়ে ফেলে দেব। তখন অবশ্য ওর অজানতে বহুদিন ওর হাত থেকে হেঁসো খসে পড়ে গিয়েছিল। শশী ধাড়ার বউয়ের তখন মনের অবস্থা রক্তমাখা কাদার মতো ঘোলাটে। কিন্তু মরে গেছে এ কথা কানে গেলেই ও চমকে ওঠে। বাউলি বাপ বলত মত্তে না দেকলে মরেছে বলে মানি না। সেথা সন্দো আছে, সেথা এই মন্তর-পড়া কানি ঘরের বাতায় বেঁধে থুই। য্যাতদিন কানি থাকে, ত্যাত দিন আশ।

সেই সময় একদিন, ঘুরতে ঘুরতে শশী ধাড়ার বউ আবার সিধুদের ফুটপাথে ফিরে এসেছিল। সিধু ওকে চিনতে পেরেছিল। বলেছিল তোমার এমন দশা?

ভুরু কুঁচকে শশী ধাড়ার বউ বলেছিল, কেমন দশা?

এমন! ছেলেরা কোথা?

পাইলেছে।

সিধুই ওকে আশ্রয় দেয়। শশী ধাড়ার বউ তখন স্বচ্ছন্দে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়। ওর পেট-আঁচলে পয়সা ছিল। পয়সা ও সিধুকে দিয়ে দেয়। কেন দেয়, তা ও নিজেও জানে না। ওর তখনকার সব আচরণের ব্যাখ্যা পরে ও নিজেই করে উঠতে পারেনি। তারপর, হাইড্র্যান্টের জলে স্নান করে, পেটে দুটি খেয়ে, একদিন ও সহসা স্বস্থ হল। আবার ফিরে এল সম্যক জ্ঞানে। কিন্তু মাঝের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও যেমন হেঁসো, হাঁড়ি পাতিল, মাথার চিরুনি, গামছাখানা পথে পথে ফেলে এসেছে তেমনি, স্বভাবের সেই দুর্জয় রাগ, দুরন্ত আক্রোশ, অবাধ্য জেদও কোথাও ফেলে দিয়ে থাকবে।

সিধু বলল, শোক তাপে মাগী ভোঁ মেরে অয়েছে।

অন্য কাঙালীরা বলল, তোর ত্যাত মায়া?

সিধু বিড়ি টেনে বলল, এক কতা, একন ও টেমপোরারি নয়। বারাবুরে কাঙালী। বারাবুরে কাঙালীকে বারাবুরেরা ঠাঁই দিতে হবে। যে ফুটপাতরের যে নিয়ম।

তুই জানিস!

তা ভেন্ন উনি থাকলে মোদের সম্‌সারটুকু ছ্যাকে।

অন্য কাঙালীরা বড় নিশ্চিন্ত হল। হ্যাঁ, কাঁথা-কানি-চট-কাগজ-পিসবোর্ডের চটি—হাঁড়ি-পাতিল টিনের মগ-তোলা উনুন-কেরোসিন কাঠের বাক্স—ওদের সংসারও দিনে দিনে কম ভারি হয় না।

বড় নিশ্চিন্ত হল ওরা। সিধু ওকে ঠাঁই দিচ্ছে স্বার্থপর বুদ্ধিতে এ কি কম আশ্বাসের কথা? যদি হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়েছে বলে সিধু ওকে ঠাঁই দিত, তা হলে সিধুকে ওরা বিশ্বাস করত কি করে?

সিধ আবার বিড়ি টেনে বলল, চ্যায়রা খানা দেখেছিস? একেবারে

মাদার ইণ্ডিয়ার মেকাপ।

সিধুই বলল, মুলোটা রাদত। তুমি যদি রাদ তবে ও বেরুতে পারে বেশি বেশি।

ভিখিরিদের রান্না একবার। কয়েক দিনই শশী ধাড়ার বউ সে রান্না রাঁধতে শিখল। ভিক্ষের চাল সামনের বাড়িতে বেচে ভিখিরিদের পয়সা দেবার ভার ও নিজে নিয়ে নিল। কয়েক দিনেই বাজার ঝেঁটিয়ে ও পচা টমেটো, কপি পাতা, মূলো শাক, আধপচা আলু, পাঁঠার মল নাড়ী আনতে শিখল। একদিন, সিধু মরে যেতে ও যখন গুঁড়ি মেরে সিধুর চটের ঘরে ঢুকল, কেউ মানা করল না। ওর অধিকার আছে কি না সে প্রশ্ন তুলল না।

কেননা ততদিনে আদি গঙ্গার পাড় বাঁধা হয়ে গেছে, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করছে সি. এম. ডি. এ. দেওয়ালের শ্লোগান ও শ্মশানের দেওয়ালের নাম মুছে গেছে। অনেক অনেক দিন কেটে গেছে।

ঘরে ঢুকে ও একখানা বাখারির গায়ে দুটো ন্যাকড়া বাঁধল।

নতুন ঘরে ঢুকলি, পুজো দিবি না? মুলো বলল। বলল, আমরা মিষ্টি খাব না?

ও কথা বলেনি। বাউলি বাপ বলত, য্যাতক্ষণ আশ থাকবে, কানি খুলবি না। কানিটুকু জেয়নকাটি। হটককারে একদিন মরা বলে যারে জান, সে ফিরে আসবে?

নেকড়া বেঁধে ও বলল, যে খুলবে তারে আমি শেষ করে দেব।

কেন? ওতে কি আছে?

মোর ছেলেদের জেবন।

তারা আর আসে?

আসবে। মোরে গঙ্গাসই করবে।

গুল শুকোতে বসে ও শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনটা রোজ পরিক্রমা করে। যেন ওর মনটা সূর্য। শশী ধাড়ার বউয়ের জীবনাকাশে সে সূর্যকে ঘুরে আসতেই হবে। কিন্তু এখন ও বোঝে জীবন শেষ হচ্ছে। সে সূর্যের দ্যুতি রোজ রোজ ম্লান হচ্ছে। যে সূর্য তাপ হারাচ্ছে।

এখন ওর প্রতিবেশী নতুন কাঙালীরা। তারা ফিরে আসে

সন্ধ্যায়। তখন ফুল্লরা রাঁধে। সারাদিন ফুল্লরা বাস-স্টপে ঘোরে। মাঝে মধ্যে ওর কাছে এসে ওষুধ চায়। মেয়েটা নষ্ট, নোংরা। ও মেয়ে-কাঙালীদের দেখতে পারে না। কিন্তু ওই ফুল্লরাই, ও উলঙ্গ হয়ে হাইড্র্যান্টের জলে স্নান করার পর, ওকে ডুংরিটা পরিয়ে দেয়, ঘাড়ে বেঁধে দেয় গেরো।

আজ গুলগুলো ঝুড়িতে তুলে ও বলল, অ ফুল্লরা. মোক্ষদাকে ডেকে গুল নে যেতে বল।

তুমি যাবে নি?

না রে, শরীলটায় দিচ্ছে না।

সি কি। ওদের বাড়ি না যজ্ঞি হচ্ছে?

যজ্ঞি তুই খে গে যা।

ফুল্লরা ভারি অবাক হল। ও যে যে বাড়িতে গুল দেয়, সে সে বাড়িতে বিয়ে-শ্রাদ্ধ-পইতে-অন্নপ্রাশন ওর একখানা পাত বাঁধা। সেই অবাধ নিমন্ত্রণে ও যাবে না?

ফুল্লরা বলল, কাঁপতেছ কেন?

ঠাণ্ডা না বড্ড?

ঠাণ্ডা কোতা? দেখি?

জ্বর নেই, তবু শরীর কাঁপছে। ও বলল, নয় তুই দে আয়, পয়সা নিস গুনে গুনে।

সাবু বাতসা খাবে?

ধুস।

ও ঝাঁপ ফেলে দিল ঘরে। শুয়ে পড়ল কুঁকড়ে। চট এতটুকু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে রইল। মনের ভেতর যেন নোনা খালের জল বইছে। গরান পাতা খসে খসে পড়ছে সে জলে। ও যেন আজ একটা পাতায় বসতে চাইছে বার বার। কিন্তু যে পাতাটায় বসতে যায়, সেটাই সরে সরে যায়।

কত পাতায় যে বসতে চাইছে ওর মন। শশী ধাড়ার সেই বেরিয়ে যাবার আগেকার উত্তেজিত, আরক্ত মুখ একটা পাতা। সে পাতাটা সরে গেল। বাউলি বাপ বলছে, কানিটুকু খুলিস না মা, তোর কাকা

বাঘের মুখ থেকে নিয্যাস ফিরবে। সে পাতাটাও সরে গেল। নোনা খালে এত স্রোত। মুর্শিদাবাদে সাঁওতাল দাওয়ালরা ধান কাটবে, ও ছেলেদের নিয়ে পালাতে পালাতে জ্বলন্ত নুড়ো সাঁওতালদের ঝোপড়িতে গুঁজে দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেরা যে এখন বলছে, খেতে দেবে, টাকা দেবে, সোমজে হতে ফিরে আসব। এই পাতাটা স্রোত উপেক্ষা করে ঘুরে ঘুরে আসছে আর আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। ও গালাগালি দিয়ে বলল, ফিরে না এলে মোর গঙ্গা হয় না জানিস, মনে আখিস।

চমকে জেগে উঠল ও। সে কি, সেকথা তো ও বলেনি ছেলেদের? ও তো বলেছিল, হাংনামা জবর পাকলে পাইলে এস বাপ। অ বাপ, হাংনামায় থেকনি।

ও বলল, অ ফুল্লরা ডিবরিটা জ্বেলে দে।

ফুল্লরা ডিবরি জ্বেলে দিয়ে গেল।

সেই যে শুল ও বিছানা পেতে, আর উঠল না। পরদিন বেলা হল, রোদ উঠল। ফুল্লরা সারারাত ফষ্টিনষ্টি করে গঙ্গা নাইতে যাবার আগে চটটা তুলে বলল, অ মাসি আজও দেহ সুবিদে নয় না কি?

তারপর ও নিচু হতেই সব বুঝল।

ফুটপাতের কাঙালীরা, ঠিকে ঝি-রা মাথা নাড়ানাড়ি করল। সিধু বলত মাদার ইণ্ডিয়া। কিন্তু নিজ্জস কেন ভাগ্যিমানী গেরোমানী ঘরের মানুষ ছিল। পড়ল আর নিশ্চুপেমরল নেকড়া-বাঁধা বাঁখারির দিকে শীর্ণ আঙুল ছড়িয়ে, এমন মরা তো ভিখিরি কাঙালী মরে না? বড়লোকরা এমন হঠাৎ মরে। মাসি বড় ঘরের মেয়ে ছিল।

ওর শবযাত্রায় পুলিস গাড়ি আনল। সরকারী ব্যবস্থায় ওর সৎকার হল। গাড়িতে ডোমরা ওকে তোলার আগে ফুল্লরা আর অন্য কাঙালীরাই ওকে ধরাধরি করে তুলে দিল।

ফুল্লরা বলল, কোতা নে যেয়ে জ্বালাবে হ্যাঁ গো?

কাঙালীরা বলল, কেন শুদোচ্ছিস?

মাগী অ্যাত গঙ্গা পেতে চেইছিল, ছেলেরা নিউদ্দিশ, তা ওরা কি শ্মশানে ওরে গঙ্গা দেবে?

কাঙালীরা বলল, ধুস, গঙ্গার দেশে হলেই কি সকলে গঙ্গা পায় ?

ফুল্লরার মাসির জন্যে সহসা বড় কষ্ট হল। কাঁদতে গিয়ে ফুল্লরা দেখতে পেল না গাড়িটা চলে যাচ্ছে, মাদার ইণ্ডিয়ার পা দুটো খোলা দরজার ফাঁকে চিতিয়ে আছে, বিনা মৃতাচারে ছাই হবার জন্যে বেওয়ারিশ মড়া হয়ে চলে যাচ্ছে ও। আর মাদার ইণ্ডিয়া দেখতে পেল না ওর শোকে কেমন বিবশ হয়ে কয়েকটি কাঙালী ও এক বহুসেবিকা ফুটপাথে বসে কর্মবিরতি ও অশৌচ পালন করছে।

এক সময়ে আমোদীর গালে টোল পড়ত, সে চলতে-ফিরতে মাজা দোলাতো ও একখানা ঝকঝকে পেতলের থালায় জল রেখে মুখ দেখে গুনগুন করে গান গাইত—

বেউলোর মা বরণ করে
বামে হেলায় মাজা গো।

সে যেন কত লক্ষ, কত অযুত নিযুত যুগ আগেকার কথা। তখনো দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর থামেনি। তখনো আমোদীর বাপের বাড়ির জ্ঞাতগুষ্টি কলকাতা শহরের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মরেনি। তখনো দেশগাঁয়ে বিজলীবাতি আসেনি, সিনেমা হয়নি। চালের মণ দুই, আড়াই, তিন টাকা। সমাদ্দারদের যে ছেলে এখন ভোট পেয়ে নেতা হয়েছে, সে তখন ন্যাংটো ছেলে। মাওড়া ছেলে, সমাদ্দারদের বুড়ীদাসী তাকে এনে আমোদীর কোলে দেয়।

আমোদী তাকে দুধ খাওয়ায়। নিজের ছেলের সঙ্গে দুধ খাওয়ায়। আমোদীদের উঠোনে তখন এই এতবড় একটা পিটুলি গাছ। গাছের ছায়ায় অঙ্গ জুড়োয়। গাছের নিচে এতখানি জায়গা লেপে-পুঁছে পরিষ্কার। সেই জায়গাটুকু বাঁশের বেড়ায় ঘেরা থাকে। বাড়িতে ছেলেপিলে পাঁচজনের মিলিয়ে অনেকটি। যে ছেলেটি যখন ছোট থাকে, সবে হাত পা বেরিয়েছে, তাকে সেখানে রাখা হয়।

যে বউটির কোলে কচিকাচা থাকে, এখনো নাড়ী পোক্ত হয়নি, শক্ত কাজে যেতে পারে না, সেই পাশে বসে থাকে। নিজেও জিরোয়, ছেলেটিকেও পাহারা দেয়। ছেলের মা বলে যায়, খোঁয়াড়ে ছাগাল থুয়ে গেলাম গো! এই কথা বলে কাজে যায়। তখন আমোদীদের বাড়ি দিনেরাতে কাজ ফুরোয় না। ধান ভান, ধান সিজোও, খাল থেকে মাছ ধর, মাঠ থেকে যারা আসছে তাদের মাছঝাল, বিউলি ডাল দিয়ে চুড়ো করে ভাত বেড়ে দাও।

কচিকাচা খাওয়াও, কাঁথা সেলাই কর, উঠোনের কোণে লঙ্কা,

বেগুন, কুমড়ো গাছ কর। বাড়িতে এতগুলো বউ-মেয়ে থাকতে কি তরকারী কিনে খাবে না কি ?

বাড়ির বুড়ীরা কাঠকুঠো কুড়োও, গোবর চাপড়ি দাও, নারকেল জ্বাল দিয়ে তেল তৈরী কর।

এই যখন সংসারের অবস্থা, তখন আমোদীর কোলে কচি ছেলে। আমোদী পিটুলী গাছতলায় বসে থাকত, ছেলেকে দড়ির দোলায় দোল দিত আর গুনগুন করে গাইত—

তার দুঃখে দশদিশি কান্দে গো

দশদিশি কান্দে।

গানটি এক ঢাকা জেলার বেদেনীর কাছে শেখা। বেদেনী আমোদীকে দেখে সই পাতিয়েছিল ও এই পিটুলী গাছতলায় বসে বসে কত দুঃখই সে করত। বেদেনী এ গ্রামের সকলের চেনা। কাঁধে ঝুলি নিয়ে সে আসত, এক এক বাড়ির উঠোনে বসে আগে ডাকত, বাড়িতে রাইছ্যানী আসছে, মায়েরা কনে গো ?

তারপর সে গলা ছেড়ে গান গাইত—

ভালবাসা সর্বনাশা আগে না রে জানি
মায়ের চক্ষে হইলাম আমি কুলের কলঙ্কিনী
যার লাগিয়া কলঙ্কিনী তারে কি ভোলা যায় ?
কলঙ্কিনী হৈলাম ভবে তাতে নাই ক' দুঃখ
বন্ধুর বুকে বুক মিলাইয়া শীতল করব বুক
হা রে দেওয়ানা খইমানার দুঃখ পালরন না যায়॥

তার গানে একরকম হাহাকার থাকত, বুকফাটা হাহাকার, যা শুনলে আমোদীর গায়ে কাঁটা দিত।

বেদেনী ছোট ছেলেমেয়েদের ওষুধ দিত, বউ-মেয়েদের শেকড় কবচ, বুড়ো-বুড়ীদের দাঁতের ব্যাথার ওষুধ, পেটের রোগের মাদুলী।

তাকে দেখে আমোদীর শাশুড়ী বলত, এ বেদেনীর সংসারে এ্যাত আঠা আছে একে ঘরের বার কে করলে গা ?

বেদেনী আমোদী কাছে এসে বসত। পিটুলী গাছতলায় বসে নিশ্বাস ফেলে বলত, সবই আছিল আমার ঠাইরেন, সবই ছিল

জ্বলজ্বলা। ঘরে সতীন আইতে আমি দেশান্তরী অইলাম। আমার বুকের উপর বইয়া তারা হাসবো, খেলবো, আমি নি তাই বইয়া বইয়া দেখুম? তাই আমারে দেশান্তরী ছ্যাহেন।

আমোদী তার কাছে কত গান যে শুনে শুনে শিখেছিল। কত দেহতত্ত্ব গান, বুলবুলি গান, মুর্শিদা গান। বেদেনী গান গাইত, মাঝে মাঝে গান থামিয়ে বলত, ছ্যাহের মাঝে মন জ্বলে ঠাইরেন, মাটির তলায় না সান্ধাইলে এই জ্বলা যাইব না।

আমোদী ওর কথা শুনতে শুনতে সমাদ্দারদের ছেলেকে দুধ দিত। বেদেনী বলত, মাওড়া পোলারে দুধ দ্যান, ভালই করেন ঠাইরেন। এই পোলা নি আপনারে দুধ-মা ডাকব, কত আঞ্জাম কইরা সামগ্রী লইয়া দিব?

আজ ভাবলে মনে হয় সে যেন লক্ষ লক্ষ যুগ আগেকার কথা। বুঝি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের কথা। কবে তেমন দিন ছিল, তেমন দেশ ছিল? এই রাজপুরে, কামডহরিতে, গড়িয়াতে? মনে তো হয় না। সে তো পঞ্চাশের মন্বন্তরের দু'বছর আগেকার কথা। তবু কেন মনে হয় অনেক, অনেক দিন আগে?

সমাদ্দারদের ছেলে এখন দেশের নেতা, এদিকের অনেকগুলি গ্রামের মাথা। আমোদীদের এই জলদ্দল-মশাটপুর গ্রামে সে কচিৎ কদাচ আসে। তবু এখন তার তেলের কল, খড়কাটা কল, আটা ভাঙা কল হয়েছে। তাদের বাড়িতে বিজলী বাতি জ্বলে। সে মায়ের নামে সিনেমা হাউস দিয়েছে বড় রাস্তায়। এখন কি ভাবা যায় একসময় আমোদীর বুকের দুধে ও মানুষ হয়েছিল?

তবে এইটি ভাবলে আমোদীর বুক ফেটে যায়। সে মাঝে মাঝে বলে, অ পেল্লাদ, আমাদের পানকেষ্ট মা-কে জম্মে ছ্যাকেনি, তার নামে ইস্কুল দিলে, ছিনেমা বাড়ি দিলে, দুধ-মা-কে কিছু দিতে নেই?

প্রহ্লাদ তেমন মাতৃভক্ত ছেলে নয়। মা বল, বউ বল, দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলা, মাগী-ছাগী করা তার অভ্যাস।

সে দাঁত খিঁচিয়ে বলে, দিতে নেই! বিয়েনবেলা পানকেষ্টর বিত্তান্ত! ক্যান, বাসি উটি, পান্তা, কিছু পেটে পড়েনি বুঝি? পেট

কোঁ কোঁ করতেছে আর পেলাম বকতেছ ?

তা কেন, আমোদী দুঃখিত হয়ে বলে বাছার আমার দুধ-মা বলে টান তো আছে। তাই বলি, আমার একবার যেতে দে তোরা। আমারে ধর্, যদি কিছু এট্টা দেয়, তো নেড়ে চেড়ে তুই খেতে পারবি, পেসাদী খেতে পারবে, তাই বলি !

নেড়ে চেড়ে খাবে !

প্রহ্লাদের গলা ছাপিয়ে প্রসাদী, আমোদী, বিধবা মেয়ে টিটকিরি দেয়, যা না দাদা ! মায়ের পানকেষ্ট মা-রে আজ-আণী করে দেবে। উনি যশোমতী, উনি তাঁর কেষ্ট ছেলে কিনা !

প্রহ্লাদ বলে, বিয়েনবেলা বকনি তো ? তোমার কেষ্টছেলে এখন কংসরাজার অধিক হয়েছে, জানলে ? ভোটটি নেবার সময় এসে সকলের কাছে হেদিয়ে মরে। হক-না-হক তোমায় এসে মা মা করে, আমাদের গায়ে হাত দে কথা কয়। আর অন্য সময়ে ? পেসাদীর ছেলেটারে ওর আটা কলে কাজ করে দিতে বলিনি ? ধরিনি হাতে পায়ে ? ত্যাখন আকাশ পানে চোখ তুলে বলেছিল তুমি পাগল হয়েছ পেল্লাদ ? কাজ ? এই কাজ করবার জন্যে বলে নেকাপড়া শিকা ছেলেরা লাইন দে সাধতেছে ?

প্রহ্লাদ রেগে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক জোর দিয়ে কাঠ চেলা করেও বলে, এ্যাখন ভোটের সময় নয় তো ! তাই পেল্লাদের বোকা বুঝিয়ে দিল। আমি শালা এমন কানা বলদ যে মুখ বুজে চলে এনু। কাজটা দিল কাকে ? না গুরুপদ সরখেলের ভাইকে। কেন দিল ? না গুরুপদ সরখেল যে ওনার নাড়ীর খবর রাখে, এক গোয়ালের গোরু।

দুমদাম করে কাঠের গুঁড়িটা চেলা করে কুড়োলটা মাটিতে ফেলে রেখে প্রহ্লাদ গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে দাওয়ায় গিয়ে বসে ও বেশ গলা ছেড়ে বলে, কি দিবি দে পেসাদী, আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা প্রসাদীর উদ্দেশ্যে নয়, প্রসাদীর ভাজের উদ্দেশ্যে বলা।

প্রসাদী বিরক্ত হয়ে বলে, বউদি দাও না গো দাদাকে। নিত্য নিত্য বলতে হয় কেন জানিনি বাবু। এ্যাখন আমি বাসি পাট সারব

না হেঁসেলে ঢুকব? ওদিকে ঘোষবুড়ীর গলায় মোচ্ছ আছে মা। মোচ্ছ ঢেলে ক্যামন মিষ্টি করে বলবে বিয়েনের বাসিপাট যদি সেরে নেব পেসাদী, তবে আর নোক রেখে কাজ কি মা?

প্রহ্লাদ প্রসাদীর সঙ্গেই যা একটু ভাল করে কথা বলে। বোধ হয় প্রসাদী এ সংসারের দ্বিতীয় রোজগেরে ব্যক্তি বলেই। এখন সে বলে, দাঁড়া না। ভেড়ীতে আমাদের যে ভাগটা ছিল সেটা যদি এবার হাঁসিল কত্তে পারি তা'লে তোকে আর ঘোষবুড়ীর কাজ কত্তে হবে না।

প্রসাদী অন্য সময়ে হলে নিশ্চয় বলে বসত, আমায় কত্তে হবে না! নিজের ঘরে না হাঁসের পাল পুষে রেখেছ! তাদের কি গতি হবে?

এখন সে কথা মনে এলেও মুখে বলল না। মাঝে মাঝে দাদার জন্যেও কষ্ট হয়, বউদির জন্যে, মায়ের জন্যেও। কি জ্বল-জ্বলে সংসার ছিল তাদের কিন্তু খুড়ীমা যে বলে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পেছন পেছন দেশে সর্বনাশ ঢুকল? বলে, দেকিসনি পেসাদী, ক্রেমে ক্রেমে আমরা ভাগ হনু, আমাদের জমিজিরেত জবরদখল হল। যাদের হাজার বিঘে আছে তাদেরও গেল, আমরা পোকামাকড়, দু'বিঘে জমিতে এতগুলো পেরাণীর পেতিপালন, তা আমাদেরও গেল। তোর বাপ, খুড়োরা ঝপাঝপ মোল, এখন কে বলবে মা, আমি আর তোর মা মিলে এক এক দিনে আধমণ মুড়িও ভাজতাম? বাড়িতে বত্রিশটি মানুষ ছিলাম, দিনে পাঁচ পালি চাল রাঁধতাম?

প্রসাদীর সেইসব সুখের দিনের তলানিটুকু দেখেছে। দাদাকে সুসময়ে দেখেছে, অসময়েও দেখছ। তাই সে সহানুভূতির সঙ্গে বলে, সে যা হয় কোর। আর আমার গুঁড়োটার দিকে চেয়ে, ধবধবার ওদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে ঐ মাতো দুলের দরুণে জমিটা উদ্ধার কর তো দাদা!

করব রে করব, প্রহ্লাদ হেসে বলে, সে পেল্লাদকে কেষ্ট কয়বার পরীক্ষে করিছিল? আমাদের পানকেষ্ট তো আমাকে পরীক্ষের মধ্যেই রেখেছে? এই দেখ না, এই ভেড়ীটুকু আমাদের পিত্তিকেলে সামগ্রী। তা দেখ, নিংড়ের ওরা যে জবরদখল করে নিলে, তার পিতিকার কর! না তখন মুখ খিঁচিয়ে বললে, ওদের সঙ্গে তোমাদের পঞ্চাশ বছরের

শত্রুতা, আমি কি করব বল?

আমোদী অবাক হয়ে বলে, ইদিকে না কি পানকেষ্টরা ধানের জন্যে, মাছের জন্যে, এ্যাত্ত-এ্যাত্ত টাকা খরচ কত্তেছে, তা ভেড়ী থাকলে তবে তো মাছ হবে? এটা সে বোঝে না?

তবেই ছাখ মা, তোমার কেষ্টর পরীক্ষা কত্তরকম তাই দেখ! আমাদের ধেনো জমি নেই। চাষ-আবাদ নেই। পিত্তিপুরুষের জিনিসটুকু নেড়েচেড়ে খাব তার পথ নেই। ছোটখুড়ে তো সেইজন্যে বলে, পেল্লাদ, নিজের গাঁয়ে বাস, টেশনে কুলীগিরি করিস, সে তো ভিক্ষেরই সামিল! উদিকে ছাখগা যা, যাদের তেলামাথা তাদের অবস্তা চচ্চড়িয়ে উঠছে। তা আমি বলি চল না ক্যান, শহরে যেয়ে ভিখিরী হই?

আমোদী বলে, তা কি হয় বাবা?

প্রহ্লাদ বলে, আমি বলি কাকা, এ্যাদ্দিন দেখেছি, এবার ভোটের সময় পানকেষ্ট কি করে দেখি?

প্রহ্লাদ বেরিয়ে যায়, এ অঞ্চল থেকে ধান, মাছ, বেগুন, শহরে যায়, মোট বইবার কাজ করে।

প্রসাদী ঘোষবাড়ির কন্না সারতে যায়। আমোদী যায় ভেড়ীর ধারে। জলের ধারে এখনো শুশনীশাক, কলমীশাক, থানকুনির পাতা পাওয়া যায়। আমোদীদের বয়সী যারা তারা সেই শাকপাতা তুলে রাসমণির কাছে বেচে আসে। রাসমণি রোজ গড়িয়ার বাজারে যায়, শাক, ডুমুর থোড় বেচে। আমোদী এখনো শহর বাজারকে ভয় পায়, এখনো তার মধ্যে কোথায় যেন একদিনের গেরস্ত চাষী-বউয়ের লজ্জা লেগে আছে।

শাক তুলতে তুলতে তার কত সময়ে বেদেনীর সেই গানটি মনে পড়ে—

তার দুঃখে দশদিশি কান্দে!

এখন আর আমোদীর গলায় স্বর নেই। স্বামী, সন্তান, দেওর, শাশুড়ী, সকলের মৃত্যুতে বুক ফেটে কেঁদে কেঁদে সে গলার স্বরটি হারিয়েছে।

তবু মনে হয়, সে সব গান কেবলই মনে হয়। যেমন মনে হয় অরন্ধনের বাসি ভাত-ব্যঞ্জনের স্বাদ, রথের মেলার চাঁপা ফুলের গন্ধ, অম্বুবাচীতে মনসাতলায় দুধ-কলা দেবার সরার লাল উজ্জল রং। বেদেনীর গান সেইসব দিনের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যেই কি মনে হয়? কোথায় চলে গেল, কেমন করে চলে গেল সে সব দিন?

যে দিনটি যায় দিদি, সেই দিনটিই ভাল, আমোদী বাসিনী বলে। বাসিনী তার ছোট-জা। কিন্তু তবু আমোদী তাকে দিদি বলে।

যা বলেছিস দিদি! বাসিনী জবাব দেয়।

আজ মুড়ি খাবিনি? আমোদী ভয়ে ভয়ে জিগোস করে। মাঝে-মাঝে বাসিনী মুড়ি আনে, সে আর বাসিনী খায়। মাঝেমাঝে আমোদী রুটি আনে, দুজনে খায়। তবে আজ ক'দিন গম নেই, আমোদী রুটি আনতে পারে না।

মুড়ি নেই দিদি।

বাসিনী নিশ্বাস ফেলে বলে, এই এ্যাত্ত এ্যাত্ত মুড়ি ভেজে নে এনু, তা হরখেন গিন্নী তিনগণ্ডা পয়সা ঠেইকে দে বললে মুড়িভাজুনীকে আর মুড়ি দিতে পারব না মা। কলকেতায় মুড়ি এখন চার টাকায় বিকোয়। তিনগণ্ডা পয়সায় কি হয় বল? একখানা তরকারী রাঁধবার ড্যাটা কুমড়ো অবধি হয় না। তা মাগী বুজলে?

মুড়ি চার টাকা! আমোদীর শুধু মনে হয় সরখেলদের তাহলে কত টাকা লাভ হবে এবার।

হ্যাঁ গো। তাই তো শাউড়ী বলছিল, যেয়ে পেল্লাদের মাকে বল্‌গা পানকেষ্ট গাঁয়ে এসতেছে, তাকে বলে হোক, পায়ে ধরে হোক, আমাদের ভেড়ীটা হাসিল করে দিক। কি এক সব্বনাশা কথা তোমার দেওর শুনে এয়েছে। ভেড়ী না কি আর আইবে না।

হ্যাঁ, ভেড়ী অইবে না! হেঁটে চলে যাবে না কি?

না গো, নিয্যস কথা। ভেড়ী কেটে জল বইয়ে দেবে।

সে কি?

বিষ্টি হয়নি। কেনালে জল নেইকো, ধানজমি তাতে ফাটতেছে, সেই জন্যে।

সব ভেসে যাবে না ?

ভেসে যাবে ! ভেড়ীর জল দেখতেছ না কমতে কমতে কোথায় গেছে ? এবারকার শ্রাবণ মাসে আকাশ য্যানো চত্তিরের মত হা হা কত্তেছে। জল নেই কোথাও, ভেড়ী কাটলে কি বা হবে ?

তাতে ধান কতটুনি হবে বল্ দিকি ?

আমরা ভেমোচাষা আমাদের বুদ্ধি ওরা নেবে কেন ? ওরা বলে কত নেকাপড়া জানা লোক ! তাছাড়া, যা বুঝতেছি নিবড়ের লোকেরা এই কীর্তি করবে।

ক্যান গো ? ওদের তো হক নেই ?

হক নেই ! ওদের পেছনে ট্যাকার জোর আছে গো ! আমাদের আছে কে বল ? না আছে ট্যাকা, না আছে লোকবল ! তোমার ঘরে পেল্লাদ, আমার ঘরে পেল্লাদের খুড়ো ! সে মানুষ তো এক কথা জপতেছে। চ' শওরে চ', শওরে যাই। য্যানো শওরে আর কেউ যায়নি, য্যানো তারা পথে পথে ঘুরতেছে না !

আমি পানকেষ্টর কাছে যাব, আমোদী বলল।

আগে বা যাওনি ক্যান ?

দুঃখ হত দিদি, দুধ-ছেলে হয়ে একবার দেখে না, দুঃখু হত।

এখন দেখবে ?

কি জানি। তবে আমার মন বলে দিদি, মানুষে য্যাত কথা বলে পানকেষ্ট অত মন্দ নয়। বাজার বাড়-বাড়ন্ত দেখে সবাই অভিশাপ করে।

তার এখন গরম খুব !

পেল্লাদও তাই বলে। কিন্তু আমার মন বলছে আমি গেলে সে কতা শুনবে।

বাসিনী হঠাৎ হাসল। এক সময়ে আমোদীর সরু কোমরের গুমোর ছিল, বাসিনীর গুমোর ছিল মিষ্টি হাসির। সরখেল বাড়ির বুড়োকর্তার বাসিনী নামে মেয়ে মরেছিল, তাই বাসিনীকে মেয়ে করেছিলেন। পুজোয় কাপড় দিতেন, নারকেল দিতেন। এই এতটুকু করে আফিং খেতেন, আর বাসিনীদের বাড়ি এসে বলতেন,

হাস্‌ দেখি মা, হাস্‌ তো? হাসিটুকু দেখে বুড়োবাপ বাড়ি যাবে।

বাসিনীর এখনকার হাসি সে হাসির কঙ্কাল মাত্র। সে বলল, তুমি যাবে দিদি? তা যাও। কেষ্ট রাজা হলে নন্দরাণী তো যাননি, তা তুমি যাও। দেখ তোমার কেষ্ট ছেলে কি বলে।

আমোদী গেল।

সমাদ্দারদে ইস্কুল বাড়িতে তখন এক মহতী জনসভা। কম করে একশো লোক বসে আছে। এই একশো লোক ডাকতেই প্রাণকৃষ্ণ সমাদ্দারের কালঘাম ছুটে গিয়েছে।

এখন সে তাই বলছিল, বি. ডি. ও-কে।

গ্রামের লোক আর তেমন নেই, জানলেন? ওদের সরলতা-টরলতা সব এখন ভুয়ো হয়ে গিয়েছে। দেখুন না, বিশ্বাস অবধি করতে চায় না এতে ওদের ভাল হবে, ঐটুকু একটা ভেড়ী, তাই নিয়ে দু'গ্রামে লাঠালাঠির সম্পর্ক জীয়ে থাকবে তাই ভাল? না ধান চাষের দিকে....

বি. ডি. ও. কিছু বললেন না। কাজের জন্যে মিলতে হয়, নইলে এই সব মানুষ দেখলে এখনো তাঁর গা ঘিনঘিন করে। বোধ হয় চাকরিতে নতুন বলেই। এখনো গ্রামের নেতা, নানাজাতের দলের নেতা, অমুক নেতা, তমুক নেতা, তাঁর গা-সওয়া হয়নি।

এমনি সময়ে আমোদী এল। সোজা সকলের সামনে দিয়ে প্রাণকৃষ্ণ সমাদ্দারের কাছে উঠে এল। বলল, অ বাবা পানকেষ্ট!

কে?

আমি তোমার দুধ-মা বাবা! কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ সমাদ্দার এখন ভীষণ মোটা, একটুতেই হাঁপায়। তার দুধ খেয়ে প্রহ্লাদের চেহারা ঐ রকম পুঁয়ে পাওয়া, আর প্রাণকেষ্টর চেহারা ওরকম, ভাবতে গিয়ে আমোদীর বুদ্ধি হরে গেল।

আর, এমন আশ্চর্য, যে সে ঠিক সেই কথাটিই বলল।

তখন বি-ডি-ও শুধু ভাবছিলেন প্রাণকেষ্ট কেন এইসব ঘটনা, এই গরীব চাষীর ঘরের দুধ-মা, ইত্যাদি, জনসংযোগের জন্যে ভাঙায় না!

প্রাণকেষ্ট যেন হঠাৎ অন্তর্যামী হয়ে ওর প্রশ্ন বুঝতে পারল ও রেগে উঠল। আমোদীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে বিজ্ঞাপন দেবার ইচ্ছে তার

আগেও হয়েছে। কিন্তু প্রহ্লাদরা অতি ঘুঘু পার্টি, বজ্জাতের আঁধি। কোন দলেও ভেড়েনি, রাজনীতির খপ্পরেও পড়েনি, তবু কি কি চাই, সে বিষয়ে অতিশয় হল্লা করা স্বভাব। এইসব ভেমোচাষা বুদ্ধিতে ধুরন্ধর, এদের প্রাণকৃষ্ণ মোটে দেখতে পারে না।

কিন্তু আমোদী একেবারে সামনে, কিছু একটা তো বলতে হয়?

তার আগেই আমোদী মুখ খুলল।

তোমার কেমন কান্তি বাবা, কত নাম! আমার পেল্লাদের অবস্থা যে দিন হতে দিনে মন্দ হচ্ছে বাপ আমার! তা দুধ-মার জন্যেই তো মহাপেরাণীটা জীয়ে আছে বাপ, আমার জন্যে তো কিছুই করলে না? ঐ ভেড়ীটা দাও না বাপ উদ্ধার করে? তোমার দুধ-মা হয়ে ত্যানা পরে গোবর কুড়োই···মানুষ কত ঠাট্টা করে, আমি বলি আমার পানকেষ্টর গৈরবে আমার গৈরব।

বি-ডি-ও-র চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। প্রাণকেষ্ট অত্যন্ত হতভম্ব এবং অপ্রস্তুত। আমোদী ভাবল প্রাণকেষ্ট তার কথা বোঝেনি। সে বলল, ও ভেড়ী যে আমাদের পিত্তিকেলে সামগ্রী বাবা। নিবড়ের ওদের ট্যাকার গরম আছে বাসিনী বলে, তাই বলে তুমি অন্যাই কত্তে পার? আমি যে তোর যশোমতী মা, অ বাপ পানকেষ্ট?

কিন্তু তার প্রাণকেষ্ট বিরাট একটি হাঁ করল ও এমন একটি গর্জন করল যে আমোদীর মাথা ঘুরে গেল। প্রাণকেষ্ট তাকে অনেক কিছু বলতে লাগল। রাগের মাথায় দেশের ভাষাতেই কথাগুলো বলল, কিন্তু আমোদী তার কিছুই বুঝতে পারল না। তাদের ভেড়ী তাদের দিলে সবাই বলবে প্রাণকৃষ্ণ স্বজনকে তুষছে? দেশসুদ্ধ লোক জানে চাষের জন্যে জল দরকার আর আমোদী সে কথা জানে না? প্রাণকৃষ্ণ আমোদীর দুধ খেয়েছে বটে কিন্তু তা বলে সে কুপুত্র হতে পারবে না। সে কি প্রহ্লাদ না কি, যে স্বার্থপরের মত শুধু নিজের কথা ভাববে? আমোদীর শুধু মনে হল, বাপরে, তার বুকের দুধে এত শক্তিও ছিল?

একা তো সে আসেনি, সঙ্গে প্রসাদী এসেছিল। এখন লজ্জায়, ভয়ে, অপমানে কাঁপতে কাঁপতে আমোদী নেমে এল।

প্রসাদী বলল, বেশ গলা তুলেই বলল, আর চেঁচিওনি বাবু, মা-কে

আমার নে যাচ্ছি। বাপ-রে তোমার গলা! মায়ের দুধে শক্তি ছিল বটে। যে শক্তিটুকু ছিল সব তোমারেই কি দিইছিল? তাই ভাবি।

প্রসাদীর কথা শুনে প্রাণকৃষ্ণ কি বলল, তা আর শোনবার জন্যে দাঁড়াল না ওরা। কেননা এখন মঞ্চেও বেশ হই-চই, কে যেন ঝপ করে মাইকের মুখে রেকর্ড খুলে দিল একটা।

মা আর মেয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। দুজনের মুখেই কথা নেই, প্রসাদীর বরং বুকটা কেমন করছে। মা-কে অমন অসহায় দেখে তার ভাল লাগেনি। মা কেন গিয়েছিল তা-ও সে বোঝে না।

আমোদী একেবারে চুপ। একটি কথাও নেই। শুধু বাড়ির কাছাকাছি এসে সে বলল, তোর খুড়ীর খুব জ্ঞান আছে, জানলি পেসাদী? শাক তুলতে যেয়ে আমায় নিয্যস কথা বলেছিল।

কি বলেছিল?

যেতে মানা করেছিল। আমি কেন মরতে গেনু বল্ দি'নি? যশোমতী যায়নি মানে বুঝলি না? যেতে নেই, যেতে নেই, গেলে ওই দশাই হয়। সেই জন্যেই যায়নি।

এতক্ষণে চোখের জলে আমোদীর বুকের কাপড় ভেসে গেল।

ভাদ্রমাসে রান্নাপূজার দিন এসেছে, এ সময়ে গৃহস্থমাত্রেই মনসা-গাছ খোঁজে। রূপসী বাগদিনীর ছেলে চিনিবাস মনসাগাছ নিয়ে পূর্বস্থলীর গৃহস্থরা উঠোনে পোঁতে। মনসা বাস্তু। মনসা ক্ষেতে ধান, গাইয়ের পালানে দুধ, পুকুরে মাছ, গৃহস্থ বউয়ের কোলে ছেলে দেন। কিন্তু ঘরে ঘরে মনসাগাছ থাকে না। রান্নাপূজার পরদিন অরন্ধন।

মা, রান্নাপূজা করবি না? চিনিবাস জিগ্যেস করেছিল।

না বাপ, এবার আমাদের রান্নাপূজা নেই।

কেন মা?

ই সনে তোর কাটোয়ার জেঠা মরেছে না?

তোকে বললে কে?

আমি জানি।

চিনিবাস অবাক হয়ে ভাবল, এ কেমন কথা হল? গতবছর তো রান্নাপূজার দিন মা পিদীম জ্বেলে বসে কত কি রেঁধেছিল। শোল মাছের টক, নারকেল দিয়ে কচুশাকের ঘন্ট, তিতোপুঁটি ভাজা, সরল-পুঁটির ঝাল, ময়ামাছ আর বেগুনের ঝোল, চালবাটা দিয়ে ঢেঁকিশাক, পিটুলী দিয়ে পাট পাতার বড়া আর তালবড়া। পরদিন দু'বেলা ধরে চিনিবাস তাই খেয়েছিল।

এ-বছর বড় কষ্ট, এদিকে গঙ্গায় বান ওদিকে খোড়ে নদী টুবুটুবু। চিনিবাস শুনেছে অঞ্জনা নদীতে তিনখানা বাঁশ ওপর ওপর রাখলে ডুবে যায় এমনই ভাসাভাসি। সবাই বলাবলি করছে বান আসবে। বান কেমন জিনিস তা চিনিবাস দেখেনি। চিনিবাসের মা যখন ছোট ছিল তখন না কি কাটোয়ার গঙ্গাতে বান এসেছিল।

চিনিবাসের মা নারকেলপাতা চেঁছে কাঠি বের করছিল। অন্তত দশটি নতুন ঝাঁটা বেঁধে দিতে হবে, নইলে আচার্যবাড়ির কাজ চলবে না।

মা বান কেমন করে আসে গো? চিনিবাসের কথা শুনে রূপসী বড় বিরক্ত হল। বলল, দেখিস এখন।

রূপসীর মা গাবগাছের আঠা দিয়ে বাঁশের মাছধরা পলো পালিশ করছিল, সে বলল, দেখবি রে দেখবি, বান হবে, মড়ি হবে, মানুষ নয়ে শেয়াল-শকুন ছিঁড়ে খাবে।

উ কি কথা মা? রূপসী মৃদু ধমক দিলে।

নেয্য কথা লো নেয্য কথা! পিঁপড়ে পতঙ্গ ভেসে যাবে, হাতী-ঘোড়া জীয়ে থাকবে, এ হল শাস্তরের কথা।

তবে যে সবাই বলতেছে ই বানে কেউ মরবে না? চিনিবাস আবার জিগ্যেস করল।

ও গোরাপ্রেমের বানের কথা? উ আমি জানি না বাবু। আমি তো শুনলাম শান্তিপুর-কাটোয়ার জনমনিষ্যের আর আনকথা মুখে নাই। শুনে আমি হেসে বাঁচি না। হাটে যেতে দেখি সবাই এক কথা বলে। আমি যাকে শুধাই কথাটি কি গো? সেই বলে, আ লো বাগ্দীবউ, কি যে কথা সে তো আমরা বুঝি না। শুধু শুনি গৌরাঙ সন্ন্যাসী নাকি উঁচুকে নিচু আর নিচুকে উঁচু করবে বলে লেচে বেড়াচ্ছে। শুনে তো আমি শুধাই, হাঁ গো, তবে কি আমরা ঠাকুরদের পুকুরে জল সবব, উনাদের মত পালঙে শোব, খইমুড়ি যা মন হয় তাই খাব? তা যদি না হয় তবে আমি গোরাপ্রেমের বানে ভাসব কেন? আমায় সবে খুব মুখ নাড়লে, আমি বক্না বাছুরটা খুঁজে নিয়ে চলে এলাম। ই আবার কোন বান বাবা?

মা! রূপসী গলা তুলল।

আ লো দেখিস! অঙ্গ যে রসে গেল।

তুই তো মা গৌরাঙ্গ দেখিসনি?

দেখতে যাব কেন লো? গৌরাঙ কি আমায় রাজা করবে?

তবে যা মাছ ধরগা যা!

আ লো, রূপের গোমর করিস না। মাছ ধরা আজ মন্দ কাজ হল। এই মাছ ধরে ধরে তোকে এত বড়টা করেছিলাম।

চিনিবাস দেখল বাতাস বেগতিক। সে মনসাগাছ নেবে কি না জানবার জন্যে বাতাসের আগে আচার্যবাড়ি গেল।

পূর্বস্থলীর আচার্য পরিবার বড় ধার্মিক সচ্ছল গৃহস্থ। এই ১৪৩৫

শকাব্দে কম গৃহস্থেরই ক্ষমতা আছে যে, নিত্য কাঙালী ভোজন করায়। কিন্তু বড় আচার্যের উঠোনে বেলা দুপুর পর্যন্ত এখনো একশতটি পাতা পড়ে। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীর সংবাদ এখন বাতাসের আগে ধায়। এখন তিনি গৌড় থেকে শান্তিপুরে গিয়ে মাতৃদর্শন করে আবার নীলাচলে চলেছেন। বড় আচার্যের ইচ্ছা যে এ পথ দিয়ে নিমাই গেলে তাঁর বাড়িতে দুটি দিন রাখবেন।

আ গো কেন? তাঁর আচার্যানী জানতে চেয়েছিলেন। বড় আচার্য তো সিরস্তদার, পোতদার, ধনীমানী মানুষ দেখলে তবে সম্মান করেন। যুবক সন্ন্যাসীকে এ সম্মান কেন?

কেন! কেন কি গো? আমি দশজনকে ভাত দিই কেন?

পুণ্য কর।

পুণ্য কর! একে বলে স্ত্রী-বুদ্ধি। দশজনকে ভাত দেও, কাপড় দেও মানুষ তোমায় মাথায় করে রাখবে।

গৌরাঙকে সম্মান করো কেন?

ও গো, গৌরাঙ এখন নতুন নতুন গো! মানুষ এখন গৌরাঙের নামে সত্বর মজে। যে জন গৌরাঙ ভজে তার এখন সমাজে সম্মান। শান্তিপুরের তাঁতি বেটারা অব্দি গৌরাঙ যখন নগরে গেল, তখন কাঙালীরে কাপড় বিলিয়ে নাম করল। আমি যদি করি আমার ভাল হবে।

আ গো আপনি তো অধিক ব্যয় করতে ডরাও। তা গৌরাঙ সন্ন্যাসী আসবে, তার চেলাচামুণ্ডা এতগুলি! ব্যয় হবে কত আমি সে কথাটি ভেবে মরি।

আরে স্ত্রী-বুদ্ধি! গৌরাঙ এখন কৃষ্ণনামে মেতে রয়েছে। সে মানুষ একবার আসবে, একবার নয় ব্যয় করব। তুমি বোঝ না। এতে আমার নামডাক দশদিকে যাবে।

তিনি না কি মানুষ ডেকে ডেকে আচণ্ডালে কোল দেয়? এ কথাটি জেনে আমি অবাক যাই গো!

কোল দিলে কি? কোল তো উনির সঙ্গে যাবে। উনি গেলে তবে চাঁড়াল বাগদী আবার যেমন ছিল তেমন রইবে। তোমার এত

কথায় কাজ কি? যাও না, রান্নাপূজার কাজে যাও না?

বড় আচার্যানী নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলেন। আচার্য তো বলেই খালাস। বসে বসে শত শত লোকের রান্না করেন, এখন কি তাঁর সেদিন আছে? সকলের রান্না সেরে ভাত খেতে খেতে সন্ধ্যে হয়। উনোনে রাতের ভাত-ডাল বসিয়ে দিয়ে তবে তিনি খেতে বসেন।

কে রে?

উঠোনের এক কোণে চিনিবাস এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি চিনিবাস গো!

কে?

উপসী বাগদিনীর বেটা। আপনাদের কি মনসাগাছ এনে দেব মা, শুধোলে!

বড় আচার্যানীর সর্ব-অঙ্গ জ্বলে গেল। কি অলক্ষণ কি অপয়া তাই দেখ! এখন ঠাকুরের ভোগ দিতে যাবেন এখনি বাগদীদের ছেলেটা মুখ দেখাল?

এই এত বড় গাছ গো!

চিনিবাস হাত দুটি তুলে দেখাল। রান্নাঘরের দোর দিয়ে গরম ভাতের গন্ধ আসছে। বামুন-মা ডালের হাঁড়িতে কতখানি করেই না ঘি ঢালে। দুধ দিয়ে সাদা ধপধপে লাউয়ের শুক্তো রাঁধে আর মুলো-বড়ি-নারকেলের ঘণ্ট। সব ঘি-চপচপে, সম্বরার সুবসে ম-ম। কতদিন চিনিবাস গরম ভাত খায়নি। কতদিন বামুন-বাড়িতেও খায়নি।

সে পরে বলব'খন, এখন বাড়ি যা।

বামুন-মা, রান্নাপুজো কবে গো?

সোমবার।

কচুশাক এনে দেব?

না বাপু তুই যা!

এই ছেলে বামুন-মা বললে আচার্যানীর অঙ্গ জ্বলে। রূপসী বাগদিনীর মত গরীব এ পূর্বস্থলীতে কেউ নেই। খেতে পায় না, মাথার চুল জট বাঁধা, তবু রূপ মরে না ওর। ছেলেটাও চাঁদপানা। আচার্যানী ছেলে-ছেলে করে এত বার ব্রত পুজো করে কালোজিরের

মত কয়েকটি মেয়ে পেলেন বলেই না ছোট আচার্যানীকে আনলেন কর্তা!

যেন চোখ দিয়ে গিলে খায়।

আচার্যানী চোখ সরু করে দেখলেন চিনিবাস কোথায় দাঁড়িয়ে। উঠোনের কোণে ঐ আতাগাছটি হল লক্ষ্মণের গণ্ডী। বাগদী বল, জেলে বল, গেরস্ত সংসারের সকলেরই দরকার, তা, সবাই ঐ আতা-গাছের ওপারে এসে কথা কয়ে কয়ে চলে যায়। চিনিবাস বুড়ো-আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছে!

ছোট আচার্যানী ছেলে কোলে করে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে আবার টুপ করে ঘরে ঢুকে গেলেন। ছেলেটি বড় ভোগে। চিনিবাসের নজর লাগলে হয়তো আবার ভুগবে।

ওরে এক পাই মুড়ি দেন গো! ছোট আচার্যানী ঘর থেকে ডেকে বললেন। মুড়ি নিয়ে খুশি হয়ে চলে যা বাবা, আমার ছেলেটার দিকে তাকাস না। চিনিবাসের চোখ দুটো যেন সর্বদা খাই-খাই। এত খিদে ওর কোত্থেকে আসে কে জানে!

নে, মুড়ি নিয়ে চলে যা।

চিনিবাসের যে কি ভুত চাপল মাথায় কে জানে! ও হঠাৎ বড় আচার্যানীকে জিগ্যেস করে বসল, হ্যাঁ গো বামুন-মা, সোনার গৌরাঙ্গ এলে আমরা না কি সকলের সঙ্গে এক দাওয়ায় বসে পেসাদ পাব?

কি বললি?

বড় আচার্যানী এখন গলা তুলে চেঁচাতে শুরু করলেন। চেঁচামেচির মধ্যে অনেকখানিই হল স্বামীর বিরুদ্ধে আক্ষেপ।

আ গো, তিনি চাঁড়াল-বাগদী নিয়ে নাচতেছে, নাচুক গা! মনিষ্যি না দেবতা না তিনি কি বস্তু তা কি আমরা জানি? তিনি বান আনতেছে, বানের সঙ্গে ভেসে চলে যাবে গো! আমাদের এই গাঁয়ে জন্ম কাটাতে হবে। আমরা কেন নাচতে যাই?

রূপসী বাগদীর বিরুদ্ধেও অনেক বিষোদ্গার ছিল। মেয়েটা মন্দ। ওর ছেলেটা মন্দ, গ্রামের কলঙ্ক একটা।

ছোট আচার্যানী তাড়াতাড়ী এক ঘটি জল আর একখণ্ড মিশ্রী এনে

দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণে অকারণে বড় আচার্যানী এইভাবেই চেঁচান। চেঁচাতে চেঁচাতে ওঁর মুখে থুথু উঠে যায়। তখন একখণ্ড মিশ্রী আর একঘটি জল খেলে উনি শান্ত হয়।

চিনিবাস তো কোঁচড়ে মুড়ি কটা নিয়ে দৌড় দিল। ছুটতে ছুটতে শেষ অব্দি খালের ধারে পৌঁছে গেল। খালে জল টুবুটুবু। এত জলে মাছ ধরা যায় না। কিন্তু গেঁড়ি-গুগলি বিস্তর। চিনিবাসের দিদিমার বুঝি নালকেল পাতা চাঁছা হয়ে গিয়েছে তাই গুগলি তুলতে এসেছে। বুড়ি বসে থাকতে জানে না।

গুগলি তুলে কি হবে আয়ী?

চিনিবাস আশায়-আশায় জিগ্যেস করল। কবিরাজ মশায়ের শ্বশুরের চোখে ছানি পড়ছে। গুগলির ঝোল খেলে চোখ ভাল থাকে বলে কবিরাজ-গিন্নী মাঝে মাঝে বাবার জন্যে গুগলি রাখেন। কখনো চারটি চাল দেন, অথবা একটা কুমড়ো। দিদিমা নাতির কথা শুনে বললে, এমনি রে এমনি! কেউ নিলে তো নিলে। নইলে গুগলির শাঁস আর কচুশাক দিয়ে ঘণ্ট রাঁধব। তোকে মুড়ি কে দিলে? আচাজ্জি বউ?

হ্যাঁ। চিনিবাস তাড়াতাড়ি মুড়ি গালে ফেলতে ব্যস্ত।

রূপসীর মা, চিনিবাসের দিদিমা এখন কার উদ্দেশ্যে যেন মুখ বাঁকা করে গাল দিল। বলল, তখন তো কত কথা, হ্যানো দেব, ত্যানো দেব, ধান দেব, কাপড় দেব, সব্বস্ব ভার নেব, এখন কি সব ভুলে গেল?

কে, আয়ী?

তোর শত্তুর, তোর মায়ের শত্তুর?

চিনিবাস দিদিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গুগলি তুলল, যতক্ষণ না হাত-পা, জলে ভিজে ভিজে অসাড় হয়। তারপর, বাড়ি ফিরতে ফিরতে চিনিবাস বলল, এ বন্যে নয়, সেই বানের কথা বল আয়ী!

পেলয় বান! বুড়ি তখনি মাথা নাড়লে।

কি রকম?

তোর মা তখন সোমত্ত মেয়ে। রূপে রঙ্গ ভেসে যায়। সকালবেলা থেকেই গুঁড়ো-গুঁড়ো বিষ্টি, যেন বাতাসে তুঁষ উড়তেছে। আর

বাতাসের কি ডাক মা!

তা বাদে?

বান আসতে আমরা সব যেয়ে বড় আচাজ্জির দালানে উঠলাম। কতজন গাছে চেপে রইল, কতজনা ভেসে গেল। মানুষ পোকা-মাকড়ের মত মরে দেখে বামুনরা সকলকে দালানে-উঠোনে ঠাঁই দিলে।

তা বাদে?

গল্পের এই জায়গাটি চিনিবাসের বড় প্রিয়। বারবার ও এই গল্পটা শুনতে পারে শুধু এই কথাগুলো শুনবে বলে। রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য সব কথা। বানের সময়ে মানুষরা সব দেবতা হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, নইলে এমন কাণ্ড করবে কেন?

অন্ন বিনা প্রাণী মরে যায় দেখে, বামুনরা ধামা ধামা চিড়ে-মুড়ি বাতাসা দিয়ে সব প্রাণ বাঁচালে মা! যারা রাঁধতে জায়গা পেলে তাদের চাল-ডাল দিলে।

আমার মা-কে?

আঙাকাপড় দিলে বামুনরা। পরনের কাপড় ত্যানা হয়ে যেয়েছিল।

তা বাদে?

নতুন গোলঘরে (গোয়ালঘরে) মোদের ঠাঁই দিলে।

তা বাদে?

মাচা থেকে শুকনো কাঠ, চাল-ডাল-তেল-নুনের সিধে, আনাজপাতি। জল নেমে গেলে, যে-যার ঘরে গেল কিন্তু রূপসী আর তার মা-র জন্যে বড় আচার্যের কি ভাবনা, কি ভাবনা! ওদের মত দুঃখী কে আছে? কে এমন গাঁয়ের একটেরেয় থাকে? কতদিন ওদের আগলে রাখলেন, তারপর নিজের মাহিন্দারের সঙ্গে রূপসীর বিয়ে দিলেন, বিয়ের পর বছর না পুরতে চিনিবাস হল। কিন্তু রূপসীর বরটা জ্বরে ভুগে মরে গেল।

ও আয়ী, তা বাদে?

তুই হতেও দয়া ছিল, মন ছিল। এখন য্যামন মুড়ি দিয়ে বিদেয় করে দেয় ত্যামন নিমায়া ছিল না।

চিনিবাসের দিদিমা মাথা নেড়ে আরো কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। আর তখনি ওরা ঢাকের বোল শুনতে গেল। ঢোলমোহর দিয়ে বড় আচার্য সকলকে যেতে বলছেন ওঁর বাড়িতে। কীর্তন, ঠাকুর সেবা, প্রসাদ বিতরণ, আর গৌরাঙ্গ দর্শন হবে। সবাই যাবে। দিবাকর চক্রবর্তীর মত বামুন, চিনিবাসের মত বাগ্দী, সবাই।

বাবা গো! সত্যিই বামুনরা সবাইকে ডাকছে, সবাইকে খেতে দেবে? চিনিবাসের দিদিমা কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। এ বান-ও যে সেই গঙ্গার বানের মত মনে হচ্ছে? সবাই এক জায়গায় দাঁড়াবে বসবে, একসঙ্গে চিড়েমুড়ি ভাগ করে খাবে?

চিড়েমুড়ি না রে আয়ী! ভাত হবে, পরমান্ন, ঘি সম্বরা ডাল, আর নারকেল ছাঁচিকুমড়োর বেন্নুন! গয়লাবউ খাসা দই পেতেছে, জানলি?

যা মা-কে যেয়ে বল্ গা, কাপড়-চোপড় যেন ক্ষারে সেদ্ধ করে এট্টু তেল আনতে পারিস? মাথাটা যেন সন্ন্যেসীর জট মা! এমন মাথা নিয়ে যাব কেমন করে?

চিনিবাস যেন হাওয়ার আগে উড়ে মা-কে খবর দিতে চলে গেল। রূপসী বার বার হাত যোড় করে কপালে ঠেকাল। এ কি একটা সোজা কথা? ওঃ, তিনি যদি তার চিনিবাসকে মাথায় হাত দেন, আশীর্বাদ করেন। তা হলে তো সবাই জানবে চিনিবাসও মানুষ;

রূপসী ও মানুষ আরেকজন আছেন এ গাঁয়ে, অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে বেড়ান। রূপসীর খুব ইচ্ছে করে গৌরাঙ্গকে জিগ্যেস করে, কাউকে দিয়ে জিগ্যেস করায়, একটি অহঙ্কারী পুরুষের এক সন্তান বাগ্দী বলে চিরদিন গরীব হয়ে থাকবে, ঘরের ছেলেটির শত ভাগের এক ভাগও পাবে না, এ কেমন বিচার?

রূপসীর মনে হতে লাগল যেন গৌরাঙ্গ এসে গেছেন, যেন চিনিবাসকে বুকে টেনে নিয়েছেন। যেন যত দুঃখ, যত কষ্ট, সব ঘুচে গেছে রূপসীর।

কিন্তু গৌরাঙ্গ এলেন না।

শান্তিপুর-কাটোয়া হয়েই কুমারহট্টের পথ ধরতে হল। সন্ন্যাস নেবার ক'বছরের মধ্যে মানুষ যেন তাঁকে ঘিরে মৌমাছির মত জমতে থাকে। মানুষের মাথায়-মাথায় থই-থই। সবাই দেখতে চায়, সবাই একবার পা ছুঁতে চায়। কানা বলে আমায় ছুঁয়ে দাও, দিষ্টি হোক। খোঁড়া বলে পা-খানা ফিরে দাও ঠাকুর। কোলমরুনী ছেলে নিয়ে এসে পায়ে রাখতে চায়, ছেলে হয়ে বাঁচে না কেন তাই বলে দাও।

এমনি হাজার মানুষের হাজার বায়না। মানুষ শুধু আসতেই থাকল, আসতেই থাকল। অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ যাত্রায় উনি চিনিবাসের গ্রামের কাছাকাছিও আসতে পারলেন না।

মানুষরা আচার্যিবাড়ির সামনে কতক্ষণ বসে রইল। শুধু তো গৌরাঙ্গদর্শন নয়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পেট ভরে খাবে বলে মা-ছেলে, বুড়োবুড়ি, কানা-খোঁড়া, অনাথ-আতুর সবাই এসে বসে রইল। আর তেমনি কি গুঁড়ি-গুঁড়ি বিষ্টি! আকাশকে কে যেন মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে জল ঢালো বাপু, তুমি মোটেই থেম না।

ওই বিষ্টিতেই বান হয়, একটানা প্রহরের পর প্রহর ভিজতে ভিজতে কে যেন কাকে বললে। সবাই আশায় আশায় বসে রইল কোন-না কোন সময়ে পেসাদ নিতে ডাক আসবে।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে মুড়ি-বাতাসার ধামা নিয়ে মাহিন্দাররা মানুষের ভিড়ে নেমে এল। চিনিবাসরা কেউ উঠোনে ওঠেনি বটে, কিন্তু মাহিন্দাররা মিষ্টি গলায় বললে, তিনি যদি আসত, তবে তোমরা উঠোনে উঠতে বাপ সকল, আমরা ডেকে এনে বসাতাম। তা, তিনি তো আসেনি, এখন আর উঠোনে উঠে জলকাদা করে কি হবে বল?

তা....মুড়ি বাতাসা দিচ্ছ কেন গো? পেসাদ পাব বলেছিলে না?

তিনি যদি আসত, তবে পেসাদ নিশ্চয় রান্না হত। ইদিকে কীত্তন হত, হতে হতে পেসাদ রান্না হত। তোমরা সবাই পেসাদ পেতে। যোগাড় ছিল, সরঞ্জাম ছিল, সবই ছিল গো! তা তিনি যখন এল না, তখন আর পেসাদ কেমন করে হয় বল?

কিন্তুক, আমরা খাব বলে আশা করে এসেছি গো!

এই দেখ! এয়েছিলে তো সন্ন্যেসী দেখতে, খেতে এয়েছিলে?

হ্যাঁ গো।

নাও, তোমাদের সঙ্গে আমি বকতে পারিনি বাবু। ঠাকুর দর্শনের চেয়ে খাওয়াটা বড় হল? ঐ জন্মে তোমাদের দুস্কু ঘোচে না, জানলে বাছা? নাও, মুড়ি-বাতাসা নাও দিকি।

কি রাঙা রাঙা মুড়ি, বড় বড় বাতাসা, কিন্তু চিনিবাসের চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। ও তো জানে, সকাল থেকে থোড়, মোচা, লাউ, শাক, দুধ, দই কত কি ভারে ভারে এসেছে। ভগবান জানেন কার জন্মে। এখন হঠাৎ চিনিবাসের ওর মা রূপসীর উপর রাগ হল।

কেন এবার রান্নাপূজা করলি না রাক্কুসী? কেন, আমার পেট ভরে ভাত খেতে সাধ যায় না?

মা-কে মেরে ধরে শেষ করে মুড়ি-বাতাসা ফেলে দিয়ে চিনিবাস পালিয়ে গেল।

অনেক, অনেকক্ষণ সময় গেল। সন্ধ্যের সময় চারিদিকে জোনাকি ফুটছে, ঘন অন্ধকার নেমে আসছে, চিনিবাসের দিদিমা চিনিবাসকে খুঁজে পেল মাঠের ধারে। জলে-ডোবা তালগাছটার ডগায় ও চুপ করে বসেছিল। কেঁদেকেটে অবসন্ন, ঘুম পাচ্ছে, ভূতের ভয়ও করছে।

আয়ী আমার হাত ধর।

দুজনে জল ছপছপ করতে করতে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। যেতে যেতে চিনিবাস বলল, গৌরাঙের বাগের চে' সে বান ভাল রে আয়ী! তেমন বান আর আসে না? সেই যে, যেমন বানে চিড়ে-মুড়ি-চাল দেয় এত? দুস্কু ঘুচে যায়?

কানাই বৈরাগীর মা

কান্নায় যখন বুক ফেটে যায় তখন সনাতনী ধানক্ষেতে এসে বসে। জলে জলে ধান ক্ষেতে ঢেউ খেলে। ধান গাছগুলো ঢেউয়ে দোলে। কোথাও কোথাও ধানগাছ সনাতনীর বুক সমান উঁচু।

অন্ধকার হোক, রাত বিরেক হোক, সনাতনী ঠিক খুঁজে খুঁজে সেই বাবলা গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর গাছের নীচে বসে সনাতনী কানাইয়ের জন্যে কাঁদতে থাকে। সনাতনীর কান্নায় একরকম কাব্যিক বিন্যাস থাকে। সে কান্নার কথাগুলো কে যেন ওকে বলে দেয়।

ছোটবেলা খেতে দিতে পারিনি তখন গেলি না কেন বাপ! আকালে শহরে এসে তোর বোনকে থুয়ে গেনু, তখন অ গেলে না বাপ, আমি তোমায় দুধ দিতে পারিনি।

দুধ দিতে পারিনি বাপ, বাল্লিক কিনতে পয়সা থাকত না। তোমার বাপ বলত ওরে ফেলে রেখে যাও।

সেবার টাইফয়েডে কি যমান্ত কালান্ত হলে বাপ, তখন ত মাকে ছেড়ে যাওনি? এখন কেন এমন নিষ্ঠুর হলে ও বাবা আমার, মা মুখ শুকনো করলে যে তুমি ছুটে এসে আছড়ে পড়, এখন কেন এত নিষ্ঠুরতা হলে?

ভয় পেলে বাপ! পেলিয়ে রইলে, ত মাকে দেখতে কেন এসেছিলে বাবা? মা কি অদর্শনে মরে যেত তোমার? তোমার মা হয়ে পাষাণ প্রাণ আমার। তাই এখনো বেঁচে আছি বাপ।

অনেকক্ষণ ধরে যদি কাঁদতে পারে তবে বুঝি বুকের পাথরটা নামে। কিন্তু আর কাঁদতে পারে না সনাতনী। বুকের কান্না বুকে চেপে নেয়। ওকে কাঁদতে শুনলে কানাইয়ের দাদা গর্জে ওঠে।

সকলকে মারা করাতে চাও? সবাই বলে নি কেঁদ না। কারেও জানতে দিও না?

তাই সনাতনী কাঁদতে কাঁদতে চুপ করে যায়। মুখে আঁচল গুঁজে দেয়।

বাবলা গাছের ঝিরিছিরি পাতার আড়ালে চাঁদ দেখা যায়। এখানে, এই বাবলা গাছটার নিচে কারা কানাইকে মেরে রেখে গিয়েছিল।

কানাইয়ের না কি দোষ ছিল না কোন, হ্যাঁ বাবা যতীন তবে ওরা কানাইকে মারলে?

সনাতনীর কথা শুনে ওর বড় ছেলে যতীন বলে, রতনদের সঙ্গে বন্ধু ছিল না? রতনদের ওপর ওদের রাগ, তা তাদের ত হাতে পেল না তাই কানাইকে মারলে। যতীনের বউ বলে।

হ্যাঁ, দোষ ছিল না! দোষ না থাকলে কানাই পালিয়ে বেড়াতো কেন?

পালিয়ে বেড়াতো প্রাণের ভয়ে।

ভয় করবার কাজ করেছিল নিশ্চয়।

চুপ করে থাক। তুমি কি বোঝ?

বোঝে না, ওরা কেউই বোঝে না। যদি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে অন্যদের আড়াআড়ি থাকে তা হলে তোমাকে কেন পালিয়ে বেড়াতে হয়?

কেন তুমি দিনেমানে আসতে পার না বাড়ি। কেন তোমাকে লুকিয়ে আনতে হয় শেয়ালের মত?

কেন তুমি যখন ভাতের থালায় হাত দিয়েছ তখন বাইরে শব্দ শুনে তোমাকে পাঁচিল টপকে ধানক্ষেতের দিকে ছুটতে হয়? কেন তোমার মার মুখ চেপে ধরে তোমার দাদা মাকে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজার খিল তুলে দেয়?

কেন অন্ধকারে তোমার ওপর চেনা চেনা মানুষগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে?

কেন তুমি পরদিন বাবলা গাছের নিচে পড়ে থাক হাতটা ছড়িয়ে?

কেন পুলিশ তোমার দাদার একটা কথাও লিখে নেয় না। একটা কথাও শোনে না।

কত ধরাধরি করে, কত করেও কেন ওরা তোমার লাস দাদার

হাতে তুলে দেয় না ?

শুধু একটা কাগজ দেয়। বাদামী কাগজ। কাগজটা এখন তুমি। তুমি আর কানাই পাল নও, যতীন পাল. গঞ্জের মুদির হাবাগোবা ভাইটা। তুমি আর সে কানাই নও, যার গলায় মা বিপত্তারিণী কবচ ঝুলিয়ে দিয়েছিল দশ বছরে।

তুমি কানাই পাল, পুরুষ, উনিশ, হিন্দু।

তোমায় পাওয়া গেছে গোপীবাজার গ্রামের ধানক্ষেতে। তোমায় কয়লার গুঁড়োয় ঢেকে মহকুমায় নিয়ে গেছে পুলিশ। গরুর গাড়িতে চেপে তুমি গেছ। বলদ দুটো নাক দিয়ে অস্বস্তির শব্দ করেছে আর পেছনে ঘাড় ঘোরাতে চেষ্টা করেছে বারবার।

গাড়ি চালিয়েছে বংশীধর। পাশে বসে থেকেছে কনস্টেবল শিউশরণ। খেতে খেতে কনস্টেবল বিড়ি দিয়েছে আর বলেছে আকাশ দেখেছিস বংশী ?

হুঁ। ভাল নয়। বংশী বলেছে মেঘের চেয়রা ভাল নয়, বুঝি বান ডাকে বা। সবুজ ধানক্ষেত, পথে সাইকেল রিক্সা, স্কুলের ছেলেমেয়ে। ছোট বাজারটা, এইসব চেনা ছবির ভেতর দিয়েই তুমি মহকুমা গিয়েছ।

তারপর ডাক্তার তোমাকে বলেছেন, এ আর কি দেখব ? তুই চিড়ে ফেড়ে দেখ গা। বাদে লিখে নেব।

তুমি এখন একটা বাদামী, খসখসে কাগজ। সরকারী প্রেসে আন্থিযুগে ছাপা ফ্যাকাশে হরফে তোমার পরিচয় এখন ভাগে ভাগে সাজানো।

আঘাতের চিহ্ন তোমার বুকে, পাঁজরে, গলায়, হাতে। প্রতিটি আঘাতই মারাত্মক। এর যে কোন একটায় তুমি মরতে পারতে। জখম তোমার কব্জিতে, তুমি কি আঘাত ঠেকাতে চেয়েছিলে ? তোমার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ভাঙা। তুমি কি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলে ?

তোমার প্রতিটি অর্গ্যান হেলথি।

তোমার পাকস্থলীতে ভাতের দানা, মুগের ডাল।

কেন তুমি আর কানাই পাল রইলে না, কেন একটা বাদামী কাগজ হয়ে গেলে সে কথা যতীন বোঝে না। সনাতনী বোঝে না, মোটে বোঝে না।

কেঁদনা মা, কাঁদলে আমাদের ওপর আক্রোশ হবে।

কেঁদনা মা, একজনের জন্যে কি সকলের সর্বনাশ করবে তুমি? সে কি আর ফিরবে?

ভয়। সবাই ভয় পায়। সবাই ভয়ে বোবা হয়ে থাকে। সনাতনী ভেবে পায়না কেন ওর কান্নাকে এত ভয় পায় সবাই।

ভয়। বড় ভয়। যতীন তাই এখানে কিছু করতে সাহস পায়নি। মহকুমায় গিয়ে কানাইয়ের দেহটা চিতায় তুলে দিয়ে শ্মশানের পুরুতকেই বলেছিল:

তিনদিনে যা হয় বিধান মত একটা প্রেতকাজ করিয়ে দিন আমায়। দেশে ঘরে কিছু করতে পারব না।

পুরুত যতীনকে শহরের বাজার দোকান ঘরে তিনদিন থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তিনদিন বাদে পুরুতের বাড়িতে বসে কাজ সেরে যতীন ফিরে আসে।

সনাতনী যত ভাবে তত বুক ফেটে যায়।

তাই সনাতনী নিঝুম, ভূতে পাওয়া মানুষের মত বসে থাকে সারা দিন।

রাত হলে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসে এই ধানক্ষেতে। চীৎকার করে কাঁদতে সাহস পায় না, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে আর কাঁদে। কেন কানাইকে ওরা মেরে ফেলল? কানাই ত ভয়ে পালিয়েছিল দিদির শ্বশুরবাড়ি।

কারা এমন করে ওঁৎ পেতে বসেছিল কানাইয়ের জন্যে? যেই গ্রামে এল কানাই অমনি খবর চলে গেল?

কেঁদে কেঁদে চোখ মুছে সনাতনী উঠে পড়ল। শেষ নেই, এ দুঃখের শেষ নেই।

সনাতনী ধুলো মাখা আঁচল গোছাল। রাত পোহালে বউ আর যতীন বউয়ের বাপের কাছে যাবে। খাগড়াঘাট পেরিয়ে ছোট

লাইনের রেলে চেপে তবে নামুর যেতে হয়। বউয়ের বাবার অসুখ চলছে, তায় সময়টাও ভালো নয়।

ক' দিন ঘুরে আসি গা।

যতীন মাকে সেদিনই বলেছে। সনাতনী আজকাল অনেক দূর থেকে, চেনাচেনা মানুষকে তৃতীয় জনের চোখ দিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে দেখতে পায়।

যতীনকে দেখেই ও বুঝল যতীন ভয় পেয়েছে। কানাই গেছে আজ একমাসও হয়নি। যতীন আর গ্রামে থাকতে সাহস পাচ্ছে না।

যতীনের মুখটা দেখতে লাগল সনাতনী। রোগা ছেলেটা, তিনটে ছেলেমেয়ের বাপ হল তা ঘাড় ফেরালে মনে হয় কিশোর ছেলে। গালভাঙা, গলার হাড় বের করা। কানাই বেশ ডাকাবুকো ছিল। এক পাট দরজার মত বুকখানা, কানাইয়ের ইচ্ছে ছিল শহরের মেয়ে বিয়ে করে।

যতীনের বউ খাটে খুব। তবে দেখতে কালো ঝিঁকুটি আর পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো যেন ঝিঙের বিচি।

যতীনটা ভীতু, নিরীহ। কানাইও তাই ছিল। নাতনীর স্বামীর মত। ভীতু, নিরীহ, কেউ ধমক দিয়ে কথা কইলে ভয় পেত। অথচ এখন পাড়াপড়শীর ছেলেরা আম পাড়ুক, ছাগল টেনে নিয়ে যাক, কিছু বলতে এলে চোখ রাঙিয়ে ধমক দেয়।

যতীন চেয়ে চেয়ে অস্বস্তি পাচ্ছে। মা অমন করে চেয়ে আছে কেন? মা বলে না কেন কিছু?

হ্যাঁ যতীন, ঘুরে আসবি ত?

যতীন চমকে উঠল।

এ কথা বলছ কেন মা?

না, দিনকাল ত ভাল নয়।

না মা, দিনকাল ভাল নয়। আমায় অন্যরা বলছিল একটু সরে থাক গা। সরে থাকি মাসখানিক, তা বাদে এসে পড়ব। হয়ত দিন একটু নরম পড়বে।

সনাতনী হঠাৎ শীর্ণ মুখে মধুর হাসল। অ বাবা যতীন, মায়ের

কোলে আয়। তায় তোকে বুঝিয়ে দি সব। আর নরম পড়বে না রে কিছু, দিন আর ভাল হবে না। কানাই যেদিন থেকে বাদামী কাগজখানা হয়ে ফিরে এসেছে সেদিন থেকেই সব জেনে গিয়েছে সনাতনী।

দিন আর ভাল হয়? এই হানাহানি, মারামারি আর কমে? রাজসাপ ছোটসাপ ধরে খায় সবাই জানত। সেদিন সনাতনী পুকুরঘাটে দেখেছে একটা জলঢোঁড়া আরেকটা ছোট সাপকে গিলছে।

মাঠ-ঘাট-মেঘ-আকাশের স্বভাব পাল্টে গেছে দেখিস না যতীন? ফাল্গুন থেকে বিষ্টি নেমেছিল, শ্রাবণ-ভাদ্র পেরিয়ে গেল, কুমোরেরা ঠাকুর গড়বার মাটি ছানে, এখনো বানে ভাসাভাসি সব?

দিন আর ভাল হবে না কিন্তু সনাতনী যতীনকে সে কথা বলল না।

নরম না পড়ে ত তুই কি সেখানে রইবি?

না, ওদের রেখে আসব, তোমায় নে যাব।

আর এই সোমসার··· !

সনাতনী নিজের ভেতরে, ঐ সোমসার কথাটা বলতে যে রকম আঁকু পাঁকু করল তাতে ভারি অবাক হল। তার ত কতদিন সংসারে মন নেই। তবু এ সংসার তছনছ হয়ে যায় বলে এখন এত কষ্ট হল কেন?

কত কষ্টের সংসার তোর যতীন?

সনাতনী কেঁদে ফেলল। একটা ছোট মুদির দোকান চালিয়ে সংসার চালাতে যতীনের বড় কষ্ট। কতদিন ধরে বেচারা বাজারে আজ আম বেচতে যেত, কাল পাকা কলা।

পুঁজি নইলে চলে না মা!

যতীন কতবার বলেছে। শেষে ঐ বংশীধরের কাকা প্রাণনাথের বুদ্ধিতে দোকানটুকু করেছিল। ডাল-গুড়-লবণ-মশলাপাতি-চিড়ে-দেশলাই-লজেন্স এইসব টুকিটাকি। এখন দিন পনেরো-ষোল টাকা বিক্রী হয়। এই পুঁজি, এই সর্বস্ব। এর থেকেই মালপত্র কেনাকাটা

করতে হয়। তবু চলে যায়। পিতৃপুরুষের ভিটে আর ভাগের জমি থেকে ছ' মাসের খোরাকি ধান পায়।

সনাতনী চোখ মুছল। যতীন ত তাকে যেতে বলল না? বলবে কি করে, শ্বশুরবাড়ি কি কেউ মাকে নিয়ে যায়?

দোকানের জিনিসপত্র ঘরে রেখে যাব। সামলে থেক। নিধি এসে রাতে শোবে খ'ন।

বউ এতক্ষণ নেপথ্যে ছিল। এখন সামনে এসে বিরস মুখে বলল, হা দেখ! কানাই, কানাই বলে কেঁদ না চেঁচিয়ে জান? এখন কত ঘরে এমন হচ্ছে। কতজনার দুঃখ, তা চেঁচিয়ে কেউ কাঁদে না তোমার মত। চেঁচামেচি করলে আর পাঁচজনার বিপদ।

ওরা চলে যাবার পর সনাতনী ভেবেছিল খুব আশ মিটিয়ে কেঁদে নেবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঘরদোর দেখতে দেখতে, কাজ সারতে সারতে ওর কাঁদবার কথাটাই মনে রইল না। বাড়ি পাঁচিল ঘেরা, তবে মাটির পাঁচিল। গোপীবাজারের জলহাওয়া অনেকটা রাঢ় দেশেরই মত। তাই মাটির রঙ ইটের মত লাল। মাটি ঝামার মত শক্তও বটে।

পাঁচিলের ভেতরে এতটুকু উঠোন, একটা ঘর। আগে যেটা গোয়াল ছিল এখন সে ঘরটাতেই নিচু দাওয়া আর মেঝে করে নেওয়া হয়েছে। ইদানিং তাতেই থাকত কানাই। মাচার ওপর শুত। ঐ মাচাই ওদের খাট-চৌকি। আরেকটা মাচা ছোটমত, কানাই নিজেই তৈরি করে নিয়েছিল। সেটা ওর টেবিল। তার উপর কানাই চা খেত।

যতীনদের ঘরের কোলে বারান্দা। সে বারান্দার একদিকে রান্না হয়। অন্যদিকে বাঁশের ঝাঁপ টানা, সনাতনী থাকে।

যতীন থাকে বলে সনাতনী ছেলে বউয়ের ঘরে ঢোকে না। এখন ঘরে ঢুকে ঘর পরিষ্কার করে দোকানের জিনিস তৈজস সাজিয়ে রাখতে বেলা গেল। খুব রোদ। ইদানীং রোদ তেমন আর ওঠে না। রোদ উঠলে দিনটা যখন ঝাঁ ঝাঁ করে, মাটি তেতে সোঁদা সোঁদা

গন্ধ ওঠে, আকাশটা নীল ঝকঝক করে, তখনি সনাতনীর সব ভুল হয়ে যায়।

সময়ের হিসেব। দুপুর হল না সকাল, সকাল কাটল না দুপুর এল, কিছু হিসেব থাকে না সনাতনীর।

বর্ষাকালে এমন রোদ উঠলে সনাতনীর শাশুড়ি ডাকত অ বউ! তুলোর পাঁজ দে, টেকো দে!

রোদের দিনে দাওয়ায় বসে টেকোয় সুতো কাটতে বড় ভালবাসত বুড়ি। মাথার চুল কাঁচা পাকা, থোলো থোলো ছিল। মাথা নেড়ে নেড়ে বুড়ি সুতো কাটত আর চেটাইয়ে বিছিয়ে তুলো রোদে দিত।

সনাতনী তখন সময়ের হিসাব হারিয়ে হাঁ করে আকাশ দেখত। রোদ দেখত। তখন ছেলেরা ছোট। শাশুড়ি বলত, কাঁথা বালিশ রোদে দিতে পারছ না বাছা?

তখন কত কাজ থাকত সংসারে। কাজ যেন ফুরোত না কিছুতে। তখনকার কথা ভাবতে ভাবতে সনাতনী চালের খুদ বাটিতে ভেজাল। কে এখন একা মানুষের জন্যে রাঁধে বল? একজনের জন্যে উনোন ধরালে ঘুঁটে কয়লা কম দরকার হয়? তার চেয়ে খুদ ভিজিয়ে গুড় দিয়ে চটকে খেলেও খাওয়া হয়।

বারান্দায় নিধি শোবে খ'ন। নিধি যতীনদা যতীনদা বলে, যতীন ওকে কাজকর্ম দেয়, ওকে ভালবাসে। সনাতনী মাথায় তেল দিল, গামছা নিল, পুকুর ঘাটে গেল।

দুপুর বেলার পাখপাখালির ডাকে, গাছের পাতার ঝিরিঝিরি শুনে কত কথা মনে আসে।

কানাই যখন ছোট ছিল সনাতনীর তখন কত কাজ থাকত সংসারে। ঘুঁটে গোবর এনে জ্বালানির জোগাড় কর, রাঁধ, বাড়, ধান সেদ্ধ কর।

ক' বছর কানাইয়ের বাবা তিনবিঘা জমি ভাগে চাষ করেছিল। এতে উন্নতি হবে, সোমসারটা সাজাবে বলে সনাতনীকে বুঝিয়েছিল। সনাতনী আর কানাইয়ের বাবা সংসারের উন্নতির স্বপ্ন দেখতে বড় ভালবাসত।

তখন যে কত কাজ ছিল! ঐ নিধির জ্যাঠা আর কানাইয়ের বাপ লাঙল দিত, বেছন ছড়াত।

ক্ষেতের কাজ রক্তশোষা কাজ। মুনিষ মাহিল্যার রাখবার ক্ষমতা ছিল না ওদের। জলে রোদে ভিজেপুড়ে কাজ করত কানাইয়ের বাপ।

সনাতনী ভাত রাঁধত, গরম ভাত ওরা সন্ধেবেলা খেত। দুপুরে আমানি ভাত, পেঁয়াজ আর লঙ্কা বয়ে নিয়ে খেতে দিয়ে আসতে হত।

ছেলেরা সকালে আমানি খেয়ে থাকত।

রান্নার জোগাড় হত দুপুরে। দুপুরে ঘরদোর মুছে, নিকিয়ে, গোয়াল কেড়ে, ক্ষার কেচে, স্নান সেরে সনাতনী রান্নায় হাত দিত।

কানাই যখন এতটুকুনি, রক্তের একটা ডেলা, এই রান্নাঘরের কোনে ওকে শুইয়ে সনাতনী রাঁধত।

যতীন তখন বালক মাত্র। যতীন শাকটা-কচুটা-গুগলি-মাছ জোগাড় করে আনত। একটু বড় হয়ে কানাই দাদার সঙ্গে সঙ্গে যেত।

পাখপাখালির ডাকে, পাতার মর্মরে কানাইয়ের কথা মনে পড়ে। সনাতনীর কানাই যেন এই সব কিছুর মধ্যে হারিয়ে আছে। সনাতনী যেন তাকে হঠাৎ পেয়ে যাবে হাতের মুঠোয়।

সনাতনী পুকুরঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। পুকুর ঘাটে নিধির বউ বাসন মাজতে এসেছে। সনাতনী একটু অবাক হল। নিধির বউ ঘাটে এলে তার কাছেও আসে।

দু দণ্ড বসে, দুটো কথা বলে। মেয়েটা ভাল। বেশ আত্যিস্যুয়ো স্বভাব।

হ্যাঁ বউ, খবর সব ভাল?

নিধির বউ চমকে উঠল। ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি যাওনি নান্নুর?

না ত! কেন, নিধি তোকে বলে নি?

কি বলবে?

ওকে ত এসে শুতে বলে গেল যতীন। সবাই সোমসার ছেড়ে গেলে চলে?

সে আসবে না।

কেন ?

তার কাজ আছে।

রাতে শোবে, রাতে আবার কাজ কি ?

কেন, সে আসবে কেন ?

তুই বলিস কি বউ, অমন রেগেই বা উঠলি কেন ?

তোমার ছেলে ভয় পেল, পরিবার নে পালাল। আর আমার বর যাবে তোমায় পাহারা দিতে ?

ভয় পেয়ে···

বলতে গিয়ে সনাতনীর গলার মধ্যে কথাটা হারিয়ে গেল। সত্যি কথাই ত বলেছে বউ। ভয় পেয়েছে যতীন, তাই ত পালিয়ে গেল।

যতীন গেছে, যতীনের ভাই···তা নিধির ভয় কি ?

তা জানি না আমি। তবে তোমার ছেলে যখন অমন ভাবে··· তখন তার বা সাহস কি বল ? ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করো না ?

তবে আমি কি করব বউ ?

দোরে আগড় দিয়ে থাকগা। তারপর তুমিও চলে যাও। একবার যারা তাকে খেয়েছে তারা যদি জানে তোমার এখানে বেটা ছেলে যাচ্ছে আসছে তাকেও ধরবে।

কানাই কারো শত্তুর ছিল না বউ। ওর কে বন্ধু ছিল বলে···

আমি শুনতে চাইনা বাপু, আমার কাজ আছে।

নিধির বউ বাসনগুলো তুলল। কাঁখে বাসনের গোছা নিয়ে হন হন করে ও চলে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে সনাতনী স্নান করল। স্নান করে বাড়ি এসে পাঁচিলের দোর আটকাল, খিল দিল। চালের খুদ উঠোনে ছড়িয়ে দিয়ে সনাতনী আজ কাঁদতে বসল কানাইয়ের জন্যে।

এ কি শত্রুতা করে গেল কানাই ? সবাই এখানে আসতে ভয় পাবে, কেউ আসবে না ?

এখন ভাসা-ভাসা মনে পড়তে লাগল কিছু কিছু কথাবার্তা। তখন সনাতনী শোকে দুঃখে পাগল হয়ে যাচ্ছিল, কারো কথা শোনে

নি। এখন মনে পড়ল যতীন কানাইয়ের দাহ আর শ্রাদ্ধ সবই সেরে এসেছিল শহরে।

এখানে আনলে না কি কেউ কাঁধ অব্দি দিত না।

সনাতনীর ভাইপোরা মহকুমা শহরে থাকে। তারা আসেনি, দেখা করে নি। যতীনকে কোন সাহায্যও করে নি।

তাহলে সবাই ভয় পেয়েছিল? সনাতনী তখন বোঝে নি, এখন মনে হল ভয়ের তাড়নে ওরা সবাই একজোট হয়ে সনাতনীকে একঘরে করে দিয়েছে।

কি করবে ভেবে না পেয়ে সনাতনী আঁচল বিছিয়ে দাওয়াতেই শুয়ে পড়ল। এ-পাশ ও-পাশ গড়িয়ে গড়িয়ে আবার উঠল। লণ্ঠন দুটোয় তেল ভরল। একটা নিভলে আরেকটা জ্বেলে রাখবে। আজ রাতটা কাটাবে সনাতনী।

তারপর কাল গিয়ে নান্নুরের ট্রেনে চড়বে। চাবি ফেলে দেবে যতীনের হাতে। সনাতনী যেখানে খুশি চলে যাবে তারপর। সনাতনীর বোন থাকে বর্ধমানে। না হয় সেখানেই যাবে। বোন কি আর বোনকে ফেলবে?

সন্ধ্যে হতে না হতে সনাতনী একমুঠো চিড়ে আর একঘটি জল খেল। খেয়ে লণ্ঠন নিয়ে ভেতরে ঢুকে দোর দিল। এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যে চোখে ঘুম এল তা সনাতনী জানে না।

ঘুম ভাঙল অনেক, অনেক রাতে। দরজার টুকটুক শব্দে। দরজায় টোকা দিচ্ছে কে?

কে? সনাতনীর গলা কেঁপে গেল।

দরজাটা খুলুন, আপনার পায়ে পড়ি দরজাটা খুলুন। এত অবাক হয়ে গেল সনাতনী, যে কিছুক্ষণ ওর হাত পা নড়ল না। সব যেন পাথর পাথর গো, নাড়ির ভেতরে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠছে।

পায়ে পড়ি দরজাটা খুলুন, আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আপনি যদি না খোলেন···

সনাতনী এত হকচকিয়ে গেল যে দরজা খোলা যে উচিত নয় এ

কথা তার মনেই হল না।

খুলছি।

সনাতনী উঠে দরজা খুলে দিল। একদিকের পাল্লা ধড়াস করে দেওয়ালে আছড়াল। ছেলেটা নিজের শরীরের ভার ঢেলে দিয়েছিল দরজার ওপর না কি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল? ছেলেটা মেঝেতে আছড়ে পড়তে পড়তে চৌকি ধরে সামলে নিল।

ঘরে আর কে আছে?

আর কেউ নেই।

বাড়িতে?

কেউ নেই।

সনাতনীর গলা শুকিয়ে কাঠ। হে ভগবান, এ কি বিপদে আমায় ফেললে! কাকে ঘরে ঢোকালাম? যতীন পই পই করে বলেছিল দোর খুল না। আর যতীন বা বলবে কেন? কোন বুড়োমানুষ রাত বিরেতে এমন হঠাৎ দরজা খুলে অচেনা মানুষকে ঢুকতে দেয়?

বাবা, তুমি কি আমায় মারবে? মেরনি বাবা।

কানাই যাওয়ার পর থেকে সনাতনীর নাকি জীবনের মায়া ছিল না। এখন কিন্তু ওর মরতে ভয় হল। ভয়ানক মমতা হল নিজের উপর।

ছেলেটা ওর দিকে তাকাল। সনাতনীর চোখ লণ্ঠনের আলোয় বিস্ফারিত ভয়ার্ত, ভয় সেখানে ক্যামেরায় ধরা ছবির মত অনড় হয়ে আছে। মরা মানুষের চোখ। ছেলেটা মৃতদেহের চোখই দেখে আসছে কিছুদিন ধরে। মরা মানুষের চোখে ভয়-বিস্ময়-মিনতি অমনি ধারা থমকে থাকে। অতর্কিত আঘাতে মানুষ চোখ খুলে মরে কেন?

সনাতনীর চোখ দেখে যেন ছেলেটা বুঝল ওর ধুলোমাখা পাজামা, কাঁটার আঁচড়ে গা-হাত-পায়ে রক্তের ছড়, সব শুদ্ধ ওকে কি ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

একটু জল!

মের না বাবা।

সনাতনী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মারব কেন? আমার হাতে কিছু নেই, দেখুন। আমায় একটু জল দিন। দরজাটা বন্ধ করুন।

সনাতনী দরজাটা বন্ধ করল। তারপর জল ঢালল ঘটিতে। ছেলেটা ঘটি কেড়ে নিয়ে জল খেল ঢক ঢক করে। গলার হাড়টা উঠছে নামছে, উঠছে নামছে। সনাতনী দেখল ওর চোখের মণিতেও ভয়, ভীষণ ভয়। দেখে সনাতনীর ভেতর যেন একটা ভরসা এল।

কোত্থেকে এসেছ?

কথা বলবেন না।

ছেলেটা লণ্ঠন নিয়ে খাটের নিচে দেখল, জানলার বাইরে। ছোট ঘর। মশলা-কেরোসিন-আখীগুড়-সাবানের গুমোট গন্ধ। লণ্ঠনের লালচে আলোয় ঘরটা দেখলে দম আটকে আসে।

পালা উল্টে যায়, পালা এমন করে উল্টোয়। সেদিন অব্দি বুক ফুলিয়ে তুমি যা খুশি তাই করতে পারতে। দিনের আলোয়, হাজার লোকের চোখের সামনে। ছেলেটা তখন কেন রেক্রুট হয়নি? তখন যা তা কর কর, কেউ টুঁ শব্দটি করত না।

আর এখন? তাড়া খাও, ধরা পড়। কাদের জন্যে এত কষ্ট করা? তারা দেখ গে, ধীরাপদদার মত ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে ঘুমোচ্ছে। আজকাল একটা প্রোটেকশ্যন অব্দি মেলে না।

তাই ত এই, কুকুর-তাড়া অবস্থা। কুকুর তাড়া অবস্থা না হলেও দলের ক্যাপ্টেনের বাড়িতে হামলা করার জন্যে মানুষ রে রে রে রে করে ছোটে?

কুকুর তাড়া অবস্থা না হলে গোপীবাজার গ্রামেই আবার ঢোকে ছেলেটা? রাম কহ, রাম কহ।

কি দেখছ? কেউ নেই।

সত্যি কথা?

কারো সাড়াশব্দ পেলে এ্যাতক্ষণে?

বাড়ির লোকেরা কোথায়?

সনাতনীর মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে হল না। ছেলেটা ভয়ে সাদা হয়ে আছে, চোখ ঘোরাচ্ছে দেখ। আ রে আমার বীরপুরুষ!

কোথেকে কি কুকীর্তি করে এসে এখন তেড়িমেড়ি করছে দেখ!

নান্নুর গেছে।

নান্নুর গেছে? কবে আসবে?

তা কে জানছে বাবু।

বুড়ো মেয়েছেলেটা বুঝি তেমন ভদ্রক্লাসের নয়। একে আপনি আজ্ঞে করেছে বলে ছেলেটার লজ্জা হল।

তুমি একা রয়েছ?

সনাতনীর মুখ লাল হয়ে গেল। আস্পর্দা দেখ। এখন একটা রিকসাঅলাকে তুমি-তুই করলে সে মুখে মুড়োঝাঁটার ঘা দেয়। স্কুলের ছোঁড়াদের ধমক দিলে বলে, আপনি বলুন, তুমি কি?

তুমি তুমি করছ কেন বাছা? ভদ্রভাবে কথা কইতে পার না? না কি ঘরে মা বোন নেই?

এ্যাই…

ধমক দিতে গিয়ে এখন ছেলেটা হঠাৎ থেমে গেল। মুখটা একটু হাঁ। ঘাড় বাঁ দিকে ফেরানো। রাস্তায় শব্দ হচ্ছে ঠক-ঠক-ঠক-ঠক।

কিসের শব্দ? কে আসছে?

থানার কনোস্টেবল। পাহারা দিচ্ছে।

কনস্টেবল!

ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠল যেন। তারপর সনাতনীর মুখ চেপে ধরে চৌকিতে উপুড় হয়ে পড়ল। চৌকির নিচে ইট পেতে পেতে উঁচু করা। চৌকিতে ধাক্কা লেগে মচ মচ করে। ছেলেটা উপুড় হয়ে সনাতনীর মুখ চেপে আছে। সনাতনী চিত হয়ে পড়ে পড়ে হাপসাতে লাগল।

কনস্টেবল লাঠি ঠক ঠক করতে করতে দূরে চলে গেল। গোপীবাজারে এত রাত-পাহারার বালাই ছিল না। কানাই যাবার পর থেকে থানা থেকে এই ব্যবস্থা করেছে। তাও একা বেরোতে চায় না কেউ। দু'জন করে একসঙ্গে হাঁটে।

ছেলেটা ওর মুখ ছেড়ে দিল। উঠে দাঁড়াল।

সনাতনীর ভেতরটা রাগে রি রি করছিল। কদ্দিন হল ছেলে-

পুলের মা হয়েছে, শাশুড়ি হয়েছে, পাঁচটা নাতি পুতির ঠাকুমা দিদিমা হয়েছে, তার গায়ে হাত দিয়ে এমন করে ধাক্কা কেউ দেয় না।

তুমি বেরোও বাছা।

না!

জল খেয়েছ, পুলিশ সরে গেছে, এখন মানে মানে বেরোও দেখি।

না না না।

ছেলেটা এখন সনাতনীকে অবাক করে কেঁদে ফেলল। গালে ব্রণ, চোয়াড়ে মুখ, ঠোঁট কুচকুচে কালো। হাড় পাকানো ম্যালা ক্যালা চেহারা। এই ত চেহারা স্বাস্থ্য, তা নিয়ে অমন লাফাঝাঁপা দরকার কি বাছা?

আমায় একটু থাকতে দিন। বাইরে গেলে আমি মার খাব। আমায় আজকের রাতটা···আমি আপনাকে টাকা দেব। এই ধরুনগে কাল রাতে চলে যাব।

টাকার কথা শুনে সনাতনীর মুখে কথা জোগাল না। টাকা দেব! টাকার যদি অত ক্ষমতা, তাহলে তুমি এখন ফাঁদে বন্দী শেয়ালের মত হাঁচড় পাঁচড় করছ কেন বাছা? তোমার টাকার মুখে নাথি। থাকতে হয় পড়ে থাক ঘরের এক কোনায়।

সনাতনী ওকে মাদুরটা ছুঁড়ে দিল, একটা তেলচিটে বালিশ। কাপড়ের পাড় জুড়ে ওয়াড় তৈরি করে পরানো হয়েছে বটে কিন্তু বালিশটায় যতীনের বউয়ের মাথার তেল, ছেলেপিলের মুখের নালের গন্ধ।

পড়ে থাক চুপ করে।

সনাতনী দরজা খুলতে গেল।

দরজা কেন খুলছেন?

উঠোনে যাব। ঢুকেছ ত পাঁচিল টপকে, শ্যাওড়া গাছের ডাল ধরে। পাঁচিলটা কত উঁচু, খিড়কির দোরে তালা দেখলে? ভয়ে পাটকাঠির মত মট মট করবে যদি তাহলে এত ফুটুনি কেন?

বিড়বিড় করতে করতে সনাতনী বাইরে থেকে ঘুরে এল। তারপর জল খেল, একটা পান থেঁতো করে গালে দিল। সনাতনী শুয়ে পড়ল

মশারি ঠিক করে আবার টাঙিয়ে।

ছেলেটা চটাস চটাস করে মশা মারছে। সনাতনী একটা কাঁথা ছুঁড়ে দিল।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগল সনাতনী। এটা হয়েছে এখন, ছেলে নয়, পিলে সব। এ সব ছেলেদের চেয়ে যতীনের মত ছেলে ভাল কত! যতীনের দোকানের সামান্য পুঁজি থেকে শশী পয়সা ভাঙত।

হাতেনাতে ধরা পড়তে শশীর সে কি কান্না! মের না যতীনদা, মের না গো! আর করব না।

যতীন বলেছিল, মারব তোকে নিজ্জস। কান ছিঁড়ে দেব। বৈরেগী বংশে কেউ থানাপুলিশ করে না, যা!

কানটা মলে যতীন শশীকে তাড়িয়ে দেয়। যতীন বল, কানাই বল. কত মা বলে, সোমসারটা বলে টান! ভাগের পুকুর থেকে তিন পো মাছ পেলেও যতীন মাছটা বেচে টাকাটা এনে সোমসারে ঢালে।

আর এসব ছেলে কি? মা-বাপ-সোমসার কিছু ভাবে না? সনাতনী ঠিক করল কাল রাত হলেই ওকে তাড়াতে হবে। দিনে-মানে সনাতনী পারে, যেতে পারে। পুকুরে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে ছুটতে পারে। থানায় খবর দিলেই হল।

কিন্তু আরেকটা মুখ মনে পড়ে। আরেকটা গেঁয়ো গেঁয়ো ভীতু ভীতু মুখ। তাড়া খেয়ে ভয় পেয়ে সেও পালাচ্ছিল। যদি কানাই এমনি করে কারো ঘরে গিয়ে আশ্রয় চাইত?

দূর দূর! কিসে আর কিসে! কানাই কি এই রকম চোয়াড়ে চেহারায় বুড়োমানুষকে তুই-তুমি করবার ছেলে ছিল? সব তাতে শান্ত হয়ে থাকতে জানত। দেবে দ্বিজে ভক্তি কত! বিপত্তারিণীর কবচটা হাতে বাঁধা ছিল, খুলে রেখে তবে বাপ মরতে শ্মশান গিয়েছিল।

শ্মশানে কবচ নিলে না কি দোষ হয়! কে জানে, ঐ খুলে রেখেছিল বলেই বোধ হয় দোষ হয়ে গেল।

কানাইয়ের মত কেন হতে যাবে? তবে হ্যাঁ, একটা ছেলে ত

বটে। পুলিশেও মারে বাবু; বেজায় মারে সনাতনী শুনেছে। কে জানে কিসের ভয় পেয়েছে ছেলেটা। সনাতনী ওকে ধরাতে যাবে না। নিজের মত সরে যাক, তাই ভাল। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সনাতনী হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। সনাতনীর ঘুম ভাঙল অস্বস্তিতে। কেন ঘুম ভাঙল তা ও বলতে পারবে না। তারপর কানে এল চাপা গোঙানি। ওঃ, ওঃ, ওঃ, ছেলেটা মেঝেতে কাতরাচ্ছে।

কি হল?

সনাতনী ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামল। ছেলেটা এমন করে কেন? নেমে ওর কপালে হাত রাখল সনাতনী। না! ছেলেটা চোখ কুঁচকে তাকাল।

কি হয়েছে?

পায়ে··· ছেলেটা মুখ বেঁকাল।

এখন সনাতনী দেখতে পেল ওর পায়ের কাছে গোড়ালির একটু ওপরে পাজামায় কালচে রক্ত, চাপ-চাপ। রক্ত দেখলে, সাদা জামায় রক্ত দেখলে এখনো সনাতনীর বুকের ভেতরে নিদারুণ কষ্ট হয়। যেন বোবা কান্না চেপে ধরে ওর হৃৎপিণ্ড। বড় যন্ত্রণা। রক্ত পড়লে বড় যন্ত্রণা হয় গো। মেয়েমানুষ যে যন্ত্রণার কথা এত জানে, তবু সে যন্ত্রণার খবর মেয়েমানুষ জানে না। শুধু ছেলেরা জানে অতর্কিতে মানুষ থেকে বাদামী কাগজ হয়ে যাবার আগে কত যন্ত্রণা পেতে হয়।

কি হয়েছিল?

জানি না, আমি জানি না কিছু। আমরা পালাচ্ছিলাম। শ্লা একটা কাটারি ছুঁড়ে মারল কে, একবার···।

নাও বাবু, আর মুখ খারাপ কর না। তাকে গাল দিয়ে ঠ্যাঙের ব্যথা নরম হবে তোমার? একটু অষুদ পেলে···

না।

এন ভয় পাচ্ছ কেন বল দিকি? কি করেছটা কি যে চোট খেলে অষুদ দিতে পারবে না। মুখ দেখলে মানুষ তোমায় মারবে?

না।

ছেলেটা রূঢ় রুক্ষ গলায় বলল। ওদের কি হয়েছে কে জানে।

ওরা কোথায় গেছে তাই বা জানে কে? মনে হয় জীবন ধরা পড়েছে। ঠ্যাঙানি খেয়ে জীবন পড়ে গিয়েছিল ত! কি দিনকালই হল। তখন সবাই বুক ফুলিয়ে মেরেছে-ধরেছে-মানুষ ধরিয়েছে, কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। আর এখন?

কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল। আশ্চর্য ভাল। এই ঘন বসতি গ্রামকে গ্রাম, গঞ্জকে গঞ্জ জায়গাটার মধ্যে বাড়িটা একটেরে। একটা বুড়ি, একা আছে। পাঁচিল উঁচু, বাড়ির ভেতরটা চোখে পড়ে না। একটু দূরে গিয়েই ধান ক্ষেত শুরু হল। এখন রাত অব্দি বুড়িটাকে সামলে রাখতে পারলে হয়।

রাত হলে? নদীর ওপারে পথ। বাস চলছে, রিক্সা চলছে। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ে বসতেই বা বাধা কি? গুলি মার ওদের কাজের মুখে। ট্রেনে চড়ে ও কলকাতা যাবে। বেশ কিছু টাকা নেবে তারপর চলে যাবে।

বোম্বাই যাবে না কি, বোম্বাই? সেখানে জামাইবাবু থাকে। বোম্বাই হল গে কলকারখানার জায়গা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে যদি একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দেয় জামাইবাবু?

সকালে কেউ আসবে এখানে?

না।

সনাতনীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

কেউ না?

না বাবু। আমরা এখন একঘরে বলতে পার সেই জন্যেই ত যতীন আবার নান্নুর গেল। নইলে নদী পেরোলে ট্রেনে চাপলে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া যায়। আট বছরের মধ্যে ক'বার গেছে যতীন?

একঘরে।

ছেলেটা কথাটা তলিয়ে বুঝবে বলে উঠে বসল। কাণ্ড দেখ! ছেলেটাকে কি নিয়তি আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে? এরা একঘরে? সেবার যখন রাতে এসেছিল গোপীবাজার, তখন ত কই বাড়িটা ঠাওর করে দেখে নি? পলটু, চন্দ্রনাথ ওরাও বলে নি যে গাঁয়ে এমন একটা বাড়ি আছে। গাঁয়ের গল্প ত কতই করেছিল।

ছেলেটার হাসি পেল। ও বলল : চা করতে পারেন ?

এখন নয়। বাইরে যাব, জল আনব, তবে ত!

বাইরে কেন ?

মাঠে যাব না ? গাঁয়ে কি বাড়ির মধ্যে ব্যবস্থা থাকে না কি ? না গাঁ কখনো দেখনি ? কাপড় ছাড়ব, তা বাদে উনোন ধরাব।

ছেলেটা দেওয়ালে হেলান দিল। মাটির নয়, বেড়ার দেওয়াল, বেড়ার জানালা। দরকার হয় ভেঙে বেরুনো যাবে। যদি দরজা দিয়ে বেরুনো না যায় ?

দরজায় শেকল দিয়ে যান।

সনাতনীর ঐ হুকুম-হুকুম ভাবটা ভাল লাগছিল না। বিছানাটা তুলল সনাতনী ; মশারি খুলল।

ওপরে শোবে ?

না, উঠোন থেকে দেখা যাবে।

দেখতে কে আসছে বল! সে তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমি গেলাম।

বেরিয়ে সনাতনী দোরে শেকল দিল। সদরে তালা ঝুলছে ঝুলুক। ঐ শ্যাওড়া গাছ ধরে ছোঁড়া এসেছে রাতে। কুকুর খেদা করলে মানুষ বুঝি অমনি মরিয়া হয়। শ্যাওড়া গাছটা নিমুলি করে কাটতে মানা করছিল শাশুড়ি। বলেছিল, কারণ জানিনি বাছা, পিত্তিপুরুষের কাল থেকে গাছটা রয়েছে ; কেটনি। ওটা আসশ্যাওড়া নয়, অর্জ্জুন শ্যাওড়া।

তাই গাছটা কাটা হয়নি। তবে চোর ঢুকবে বলে যতীন বেঁটে করে ছেঁটে রাখে। এবার বর্ষা চলেছে। কানাই যাবার পর থেকে খেয়াল হয়নি, তাই গাছটা এমন ঝোঁপে উঠেছে। এবারই যতীনের বউ বলেছে ঃ

গেরস্ত বাড়িতে শ্যাওড়া গাছ! অলক্ষণ! সেই জন্যেই ত অপঘাতটা হল।

সনাতনী খিড়কি দিয়ে বেরুল। খিড়কিতে শেকল দিল। পুকুর ঘাট থেকে দরজাটা বেশ দেখা যায়।

ঘাটে নিধির মা, রিকসাঅলাদের বউ ছুটোর সঙ্গে কথা বলছে। সনাতনী মুখ ঘুরিয়ে নিল। ভেবনা বাছা সেধে সেধে কথা কইতে যাব। আমার যতীনের কাছে তোমার ছেলে দেনদার। তা ভুলে বুড়োমানুষকে দেখলে না, বিপদে ফেলে রাখলে যখন, তখন সনাতনী ভারি পরোয়া করে—তুমি কথা কইলে, না কইলে না?

অ যতীনের মা, শুনছেন না আশ্চয্যি কথা?

নিধির মা'র কথা একরকম, ওর বউয়ের কথা একরকম। শুনছেন না? সনাতনীর রাগ হল, আবার কৌতূহলও। কিন্তু কৌতূহলের জন্যে সনাতনী মান খোয়াতে পারে না।

আমার সঙ্গে কথা কেন বাছা? আমার পর্শে বিষ, ছোঁয়ায় অলক্ষণ, জান না?

কে বলে এ কথা?

নিধির মা স্পষ্ট বিব্রত হয়েছে। মানুষটার শরীরে শক্তি খুব। এখনো খাটে খুব। নারকেল পাতা চেঁছে কাঠি বের করে বাজারে বেচে। খায় খুব। গলায় জোরও তেমনি।

তোমার বউ বলে গেল কাল!

সনাতনী জলের মধ্যে ছপ ছপ করে কাপড় ধুতে লাগল।

অঃ, নিধার শয়নের বিত্তান্ত! তা দিদি! আপনার ঘরে যা অইল তা আরেকজনের হওয়া কি ভাল?

আমি কি তাই বলেছি। তবে হ্যাঁ, নিধি যখন যতীনের কাছে গুনে গুনে টাকাগুলো নিলে তখন ত এত দোষ দেখে নি কিছু! ফিরে উবগার করতেই গলায় উল্টো কাঁটা হল। যা হক বাছা, আমার কথা কইতে সময় নেই।

চেতেন না দিদি! ছেলে বউয়ের বিত্তান্ত আমি জানি না। আমি কই, কাল যে শা-খালিতে হুলসস্থুলস কাণ্ড।

কেন?

দলের ব্যাপার, দলের ব্যাপার। কারা নাকি গেছিল ত এট্টারে ধরছে, মহকুমায় নেছে। আর না কি ইদিক সিদিক পলায়ে বাঁচছে।

জানি না ত?

সাবধানে ছিলেন ত ?

দোর আটকে ছিলাম। আমি কি আর মানুষ আছি যে সাবধান হব, খেয়াল রাখব !

নিধির মা কি বলতে গিয়ে চুপ করল। রিকসাঅলাদের বউ দু'টো চলে যাচ্ছে। ওরা আবার না বলে বেড়ায় নিধির মা গিয়ে ঐ যতীনের মাকে ডেকে ডেকে গল্প করেছে।

সনাতনী কাপড় নিংড়ে কাঁধে রাখল, গামছা চারপাটে মাথায় রাখল। একঘড়া জলের চেয়ে আর কত লাগবে ? বালতিতে ত জল আছে। আর দরকার হলে দুপুরে নেওয়া যাবে।

খিড়কির দোর খুলে ভেতরে ঘড়া রাখল সনাতনী, উঠোনে কাপড় মেলল। তারপর আবার পুকুর পাড়ে গিয়ে চারটি দূর্বোঘাস তুলল।

ভেতরে এসে সনাতনী দাওয়ার উনোনে ঘুঁটে গুঁজে চায়ের জল গরম করল। যতীনের দোকানের বিস্কুট দু'খানা ছেলেটাকে দিলে যতীন কি জানতে পারবে। না কবে ফিরবে ঠিক নেই বলে বউ সব বিস্কুট লজেন্স বেঁধে নিয়ে গেছে ? বিস্কুট পড়ে আছে কটা মিয়োনো।

চা খাও ! আর গরম জল করে দিচ্ছি, পাটা ধোও। তা বাদে দূর্বোর রস দাও খানিকটা। আর কোন অষুদ ত ঘরে নেই।

বউটা ডোমডোকলার মত। খেয়াল রাখে না। নইলে যতীন মহকুমা থেকে তুলো রে, আইডিন রে, এ্যানাচিনি রে, কম আনে ? সর্বস্ব ছেলেপিলেকে খেলতে দেয় বউটা। সনাতনী ওর পূজোর সলতে করবার ন্যাকড়া চাল থেকে পেড়ে দিল। বলল, বেঁধে রাখ। এঃ, এ যে দগদগিয়ে উঠেছে গো !

ছেলেটা ভুরু কুঁচকে ঘা-টা দেখতে লাগল। খুব যে গর্ত হয়ে কেটেছে তা নয়। তবে কাদায় জলে বিশ্রী হয়ে উঠেছে। এবারকার বর্ষা যেমন, পথঘাটের কাদায় তেমনি শামুক-গুগলি পচা আঁশটে দুর্গন্ধ। মহকুমার বাজারের রাস্তার কাদায় গুড় আর তামাকের গন্ধ থাকে। কাদা না লাগলে পা-টা এমন বিষিয়ে উঠত না, কিন্তু বুড়িটা শকুনের মত চোখে দেখছে।

ঘা পরিষ্কার করল ছেলেটা, দুর্বার রস দিয়ে পটি বাঁধল। বেলা কত হল? হাতে ঘড়ি নেই।

কত বেলা হবে?

জানি না।

সনাতনী উনোনে কয়লা দিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল।

ধোঁয়া!

যেয়ে চৌকিতে শোও না? উঠোনে আসছে বা কে, আর দেখছে কে? হোতা বাতাস পাবে।

ছেলেটা চৌকিতে গিয়ে বসল। একটা সিগারেট পেলে ভাল হত। যাক গে, সে পরে দেখা যাবে।

তোমাদের দলের এক জনাকে ধরেছে মহকুমায়।

কে বললে?

ঘাটে শুনলাম। আমি কোন কথা বলিনি। বলল তাই শুনলাম।

একটা কথা বললে কিন্তু সর্বনাশ হবে। ছেলেটা সাপের মত হিস হিস করল।

সনাতনী আশ্চর্য হয়ে মাথা নাড়ল। এরা কি কারুকে বিশ্বাস করতে শেখেনি? কেমন সব দিনকাল হল? পেটের ছেলের বয়সী সব, কি অচেনা অচেনা ব্যবহার।

ছাইকপালে শকুনি সব!

সনাতনীর এখন হঠাৎ হঠাৎ রাগ হয়। রাগ হলেই ও যা মুখে আসে তাই বলে।

এই!

কি করবে? গলা টিপবে? টিপে দেখ না। খিড়কির ওপাশে ঘাটে লোক গিশগিশ করে সকালে। একবার চেঁচালে সব ঢুকে পড়বে এখানে তা জান। তোমরা বাছা শকুনির জাত। এ পর্যন্ত কি তোমার সঙ্গে বেইমানি করতে দেখেছ কিছু যে সাপের মত হিসহিস করছ?

জোঁকের মুখে চুন পড়ল।

ছেলেটা বলল, তা নয়, তবে সাবধানের মার নেই। আজ রাত অব্দি থাকব, তারপর চলে যাব আর টাকা দিয়ে যাব বলেছি ত?

ঝ্যাটা মার, মুড়ো ঝ্যাটা। টাকা ত কোমরে গুঁজে ঘুরতেছ, তাতে প্রাণ বাঁচল না এখানে এসে পড়েছিলে বলে বাঁচলে?

বক বক করতে করতে সনাতনী উনোনে বাতাস করতে লাগল। রান্না হবে শুধু ভাত আর বিউলি ডাল। জোগাড় করতে করতে সনাতনীর কোথায় যেন ক্ষোভ জমতে লাগল।

টাকার কথা বলে! এই যে কাল রাত থেকে সনাতনীকে তুমি এক ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলেছ? সনাতনী কি তোমায় ধরাতে গেছে না পড়শিদের কাছে গাবাতে গেছে?

সনাতনী ত হাবা, শোকে দুঃখে পাগল। বুঝি বোঝা এখন একটা। তাই ওকে ফেলে রেখে পেটের ছেলে যতীন অব্দি পালাল।

কার ওপর ভার দিয়ে গেলি? নিধির ওপর। ভয়ে পালালি নিজে, আর মাকে দেখবে নিধি!

তা পাগল হোক, ছাগল হোক, সনাতনী ত এটা বোঝে যে ভয়ানক অন্যায় করেছ তুমি কি একটা? নইলে আর এমন করে এসে পড়ে থাক এখানে?

বিশ্বাস করতে শেখনি কাউকে, সবাইকে অবিশ্বাস! সে যা হোক তা হোক, এখন রাত হলে তুমি যাও দেখি। সনাতনী যতীনের ছাই সংসারে তালা দিয়ে চলে যাবে যেদিক পানে প্রাণ চায়।

রাত হতেই তুমি যেও বাবু! আমিও ফাঁকে বেরিয়ে বাঁচব।

সনাতনী ছেলেটার কাছে কোন জবাব পেল না। উঁকি মেরে দেখল ছেলেটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভাত আর বিউলির ডাল হতে ঘণ্টা দেড়েক লাগল। যতীনের দোকানের ডাল চট করে গলে না। তেমন পুঁজি থাকে না ওর, ভাল মাল তুলতে পারে না।

তিনটে থেকে বিষ্টি নামল। অঝোর ধারে বিষ্টি। এবার আকাশের দেবতা ঢেলে দিচ্ছে বটে। কত কত দেশে বাণ ডাকছে

কে জানে! সনাতনী এমন বিষ্টি অনেক দিন দেখে নি।

ছেলেটা খেতে বসে তেমন খেতে পারে নি।

রান্না পছন্দ হল না? না, তেমন সামিগ্রী নেই কিছু?

তা নয়! ব্যথার জন্যে যেন জ্বর-জ্বর হচ্ছে মনে হয়।

আজ রাতে যাবে ত?

যা বিষ্টি!

এমন বিষ্টিতে শ্যাল কুকুরটাও বেরোয় না তা কি আমি জানি না? তবে কি জান? তোমার জ্বর হলে, পা পচলে কোন ত ব্যবস্থা হবে না বাবু। আর ধর যদি আমার ছেলে এসে পড়ে একবার দেখে আসি বলে, তা'লে?

ছেলেটা কি ভাবতে ভাবতে বলল. একপক্ষে ভাল, জল হলে মানুষ পথে বেরুবে না। আপনি একটা কাজ করবেন?

ও বাবা, এ যে নরম সুরে কথা কয়? কি কাজ?

একবার সন্ধেবেলা দেখবেন, ঘাটে কোন ডিঙি আছে না কি?

তুমি এই বর্ষার গঙ্গা পেরুবে? তোমার আস্বা ত কম নয় বাছা। আর ঘাটে ডিঙি থাকে এ খবর তোমার কে দিলে?

তবে?

ধান পথে আল পথে বড় রাস্তা দিয়ে যেয়ে ব্রিজে উঠবে। ব্রিজটা পেরুলে কত বড় বাজার রে, দোকান পাট, কে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছে? সেথায় যেয়ে অষুদ কিনে পায়ে দিও।

আপনি একবার বেরিয়ে পথটা দেখবেন?

সন্ধেবেলা দেখব।

ছেলেটা স্বস্তি পেল খুব। যতীনের ছাতা নিয়ে ও একবার উঠোন থেকে ঘুরে এল। তারপর শুয়ে পড়ল।

পেটে ভাত পড়েছে, আর কোথায় যেন একটা নিশ্চিন্ত ভাব। নিশ্চিন্ত মানে কি ছেলেটা তা জানে না। জানলে পরে লেখাপড়া করত, চাকরি করত। ধীরাপদদার সাইকেল মেরামতের কারখানায় বসে ধীরাপদদাদের লম্বা লম্বা কথায় মেতে এইসব হুজ্জতিতে ভেসে বেড়াত না।

শালারা টেরিলিন বিনে পারে না। ঘরে ছুটো পাখা ঝোলায়, নিত্যি ইলিশ মাছ কেনে। কি মিহি কথা, কি মিষ্টি মিষ্টি ইংরেজি।

একবার পালাতে পারলে ছেলেটা বোম্বাই যাবে। দূর, কে ভাল কে মন্দ তা ভেবে ছেলেটা কি করবে? এখন ধীরাপদদাকে দেখে ওর হিংসে হয়। তখন একটা ভাল চাকরি করলে ওকে ধীরাপদদা হিংসে করবে।

একেকটা ওর বয়েসী ছেলে হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে আজকাল, আর কি সব মেয়েদের বিয়ে করে ফেলছে পটাপট, দেখলে হিংসেয় পেটের ভেতর বুকের ভেতর জ্বালা করে।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে মনে হল বুড়িটা মানুষ ভাল। বুড়িটাকে একঘরে করেছে কে?

ছেলেটার ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সন্ধে হল। বিষ্টি ঝিরঝির করে পড়ছে, বাতাসের ডাক। অদূরে নদীর কলকল শোনা যায়। আকাশ নীলচে কালো, যেন পশ্চাৎপট একখানা। তার গায়ে এই বাড়িটার ছবি আঁকা।

খুব দুর্যোগ!

সনাতনী চা এনে দিয়ে বসল। তারপর ছেঁড়া একটা ছাতা মাথায় দিয়ে সনাতনী খিড়কি খুলে বেরোল। খিড়কির দিকটা গাছে-ঝোপে আরো যেন ঝুপসি। বলল, ব্রিজের মুখটা দেখে আসি।

কেন?

ঐ যে তোমাদের কে ধরা পড়েছে, যদি পহরা থাকে?

বুড়িটা অনেকক্ষণ গেছে। ছেলেটার শরীর এখন ভাল লাগছে একটু। পায়ে টাটানি খুব। তবু ভাল। ধীরাপদদার বাড়ি চলে গেলে, দলের লোকজনের মধ্যে পড়লে যেন রাতের দুঃস্বপ্ন কাটে একটা।

শুয়ে শুয়ে ছেলেটা বালিশের ওয়াড়ের ভেতর আঙুল চালাচ্ছিল। চালাতে চালাতে কাগজটা পেল।

বাদামী, খসখসে, পুরু কাগজ। ছেলেটা উঠে বসল। কাগজটা খুলল।

ছেলেটার বিশ্বভুবনের ওপর কে যেন বোমা মারল। বিস্ফোরণ! সব অন্ধকার। অন্ধকারে ভয় আর বিপদের রাঙা চোখ। সর্বনাশ।

ড্রাম বাজছে কোথায়, রক্তের মধ্যে। সেই ছেলেটা। ভুল খবর ছিল। সেই ছেলেটা। সেই বাবলাগাছের নিচে। যখন ধীরাপদদারা চাঁদ সূর্য ছিল তখন ত ছেলেটা আসেনি, কাজে নামে নি। পরে এসেছে তাই এই গোমুখ্যুমি হয়ে গেল। গ্রামের ভূগোল কে এত মনে রাখে বাপু? আর সেও ত একটা অন্ধকার রাতই ছিল। যারা ধান-পথ, আল-পথ কানাই বৈরাগীকে চেনে তাদের সঙ্গেই এসেছিল ছেলেটা।

তাই এই ভুল, এই সর্বনাশা ভুল।

বুড়িটা লোক ডাকতে গেছে। খবর দিতে গেছে। কি করে ছেলেটা, কি করে? জানলা ভেঙে বেরোবে না কি? না অপেক্ষা করবে ওর জন্যে?

ড্রাম বাজছে বুকের মধ্যে। বাদামী কাগজটা। কি রকম দেখতে ছিল ছেলেটা? বুকের ভেতর শব্দ।

দরজার শেকল খুলল সনাতনী, উঠোনে ঢুকল। দরজা আটকাল। উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় এসে লণ্ঠন নিল, ছাতাটা টাঙাল পেরেকে। শেকল খুলল।

তুমি যাও বাছা, জলে জলে যাও! জল কমলেই মানুষ জন যাবে আসবে ব্রিজ দিয়ে···কি হল? তোমার, তোমার হাতে ও কাগজ কেন?

সরে যান।

একি, তোমায় দেখে আমার···আমার ভয় করছে কেন?

তুমি···তুমি কি···তুমি?

সনাতনী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

স্টপ!

তুমি পালাও, তুমি পালাও গো। আমি একবার বুক ছেড়ে কাঁদি। তুমি···আমার কানাই···! আমার চীৎকার শুনলে···

স্টপ!

ছেলেটা ভয় পেল, ভীষণ ভয় পেল। ভয় পেলে মানুষ জন্তু হয়ে যায়, মরিয়া হয়। ছেলেটা ভয়ে অন্ধ হয়ে সনাতনীর মুখ চেপে ধরল, নাক চেপে ধরল।

বু...বু...বু...

সনাতনী যেন জলে ডুবে যাচ্ছে। ছেড়ে দে ড্যাকরা, আমি কি বলছি ত শোন্। আমার মুখ ছাড়।

ছেলেটা কিন্তু ওর কথা শুনল না। ওর হাতের মধ্যে সনাতনী যখন নিংড়ানো কাপড়ের মত নেতিয়ে পড়ল, তখন ও সনাতনীকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দরজা ঠেলে ছেলেটি বেরিয়ে গেল। বর্ষার নদীর শব্দ বিষ্টির শব্দ, বাতাসে গাছের পাতার শব্দ।

সনাতনী দু' চোখে বিস্ময় নিয়ে পড়ে রইল। সনাতনী যদি কথা বলতে পারত তা হলে বলত—

তুমি যাও, তুমি যাও, আমি একটু কাঁদি কানাইয়ের জন্যে। আমার চীৎকার শুনলে কেউ আসবে না। সবাই জানে আমি শোকে দুঃখে আমি পাগল হয়ে আছি। আমি কাঁদতেই থাকব, তুমি পালাতে থেক্। যার যাতে শান্তি হয়, তাই করব আমরা।

ছেলেটা সনাতনীকে একটা কথাও বলতে দিল না। সনাতনী জেনে গেল না তার কথাটার মধ্যে অন্যায়টা কি ছিল। সম্ভবত ছেলেটাও এ প্রশ্নের উত্তর জানে না।